জননী সারদা দেবী : উদ্ভাসিত জ্যোতি

পূর্বা সেনগুপ্ত

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিরাময়ানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৩

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ—১৩৬০

মুদ্রাকর
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদা
আভা প্রেস
৬বি গুড়িপাড়া রো৾
কলিকাতা-১৫

এক

দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি থেকে পঞ্চতপা ব্রত পালন পর্যন্ত—সারদাদেবীর জীবন কাহিনীর এই অংশটিকে আমরা যেন তাঁর নীরব সাধন পর্যায় বলে চিহ্নিত করতে পারি। বিরাট রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্ঘজননীরূপে আত্মপ্রকাশের পিছনে এ যেন সলতে পাকানোর ইতিহাস—এ কেবল সাধারণ সাধক জীবন নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গতিময় সাধন জীবনের শেষ হয়েছিল সারদাদেবীকে ষোড়শী পূজার মাধ্যমে। সেই দিনই শ্রীমা অভিষিক্তা হয়েছিলেন জগৎউদ্ধার ব্রতের মহানকার্যে। সারদামণিকে চিন্ময়ী বিগ্রহ করে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের মাতৃশক্তিকে উদ্‌বোধিত করেছিলেন। ভারতের তন্ত্রসাধনার ইতিহাসে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সারদাদেবীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারায় এ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই পর্যায়ে মৃন্ময়ী ভবতারিণী আর চিন্ময়ী সারদা মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। মানবের দেবতায়নের এ এক বিচিত্র রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃসাধক, কিন্তু সারদার কাছে তিনি স্বয়ং জগজ্জননী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের ক্ষণে সারদা ফুৎকার দিয়ে ওঠেন, 'ও আমার মা কালী গো, আমাকে ফেলে কোথায় গেলে।' অর্থাৎ জগদম্বার বালক স্বয়ং জগদম্বায় রূপান্তরিত। অপরদিকে, সেবক লাটু যখন জগদম্বার ধ্যানে নিমগ্ন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সচেতন করে দিয়ে বলেন, 'তুই কার ধ্যান করছিস রে লেটো! যার ধ্যান করছিস সে যে নহবতে রুটি বেলার লোক পাচ্ছে না।' সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনায় সারদা স্বয়ং জগদম্বা। বারংবার উপাসক ও উপাস্য একাকার হয়ে যাচ্ছেন সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাও স্বরূপত একত্বে লীন হচ্ছেন। এ আধ্যাত্মিক মিলন অভিনব। এই হল শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন ভাবনার মৌলিকত্ব।

এ প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরকে তন্ত্রসাধনার পীঠরূপে আলোচনা করলে মন্দ হয় না। বরঞ্চ সারদার আরেকটি রূপ উন্মোচিত হয়ে ওঠে আমাদের সম্মুখে। পীঠ কথাটির সাধারণ অর্থ হল আসন। দেবী যেখানে বিশেষভাবে বিরাজিত সেখানেই তাঁর পীঠ। ভারতবর্ষে সাধারণত একান্নটি পীঠের কথা বলা হয়। দক্ষরাজের কন্যা শিবপত্নী সতীর দেহাংশ-ছিন্ন থেকে সৃষ্টি হয় এই পীঠগুলি। তাই সাধারণের ভাষায় তা সতীপীঠ। পৌরাণিক এই কাহিনীর সঙ্গেই সংযোজিত হয়েছে ভারতীয় তন্ত্র বা শক্তিসাধনার ধারা। স্বয়ং দেবী ও সতী এখানে সম্মিলিত হয়েছেন। যদিও ভারতে তন্ত্রসাধনার ধারা সুদূর চীন থেকে আগত—এ-ধারণা এখন অনেকেই মেনে নেন না, বুদ্ধ-পরবর্তীকালে তন্ত্রের উৎপত্তি এই তথ্যেরও বিরোধিতা করেন কেউ কেউ। তাঁদের মতে বৈদিক সাহিত্যেই তন্ত্রসাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং এই সাধনপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভারতীয়।

সতীপীঠ এবং শাক্তপীঠ কথাটি সমর্থক। শক্তি আরাধনায় আমরা দুটি শব্দ বিশ্লেষণ করতে পারি একটি সিদ্ধপীঠ অন্যটি শাক্তপীঠ। শাক্তপীঠ হল সেই পীঠ যেখানে শক্তি আরাধনা হয় এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য দেবী অঙ্গ এই স্থানে পতিত হয়েছিল। আর সিদ্ধপীঠ

গড়ে উঠেছে কোনো শক্তি-সাধকের সিদ্ধিলাভের উপর। উদাহরণ রূপে আমরা দক্ষিণেশ্বরের নাম করতে পারি। দক্ষিণেশ্বর কোনো শাক্তপীঠ নয় এখানে দেবীর দেহাংশ পতিত হয়নি কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস রূপ বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষ এই কালীক্ষেত্রকে সিদ্ধপীঠে পরিণত করেছিলেন।

শাক্তপীঠ ও শক্তিতীর্থের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ভারতবর্ষব্যাপী সকল শক্তিতীর্থ সাধনার স্থান বলিয়া গুরু-পরম্পরায় সিদ্ধিলাভের প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত, অর্চিত এবং পূজ্য। এক এক স্থানে এক একটা শাক্ত মন্ত্র সিদ্ধপীঠ বলিয়া রক্ষিত আছে। পরে ভক্ত ভাবুকগণ সেই পীঠ বা মন্ত্রের উপর এক একটা শক্তিমূর্তির পরিকল্পনা করিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক একখানা কষ্টিপাথরের খণ্ডের উপর মন্ত্র অঙ্কিত আছে। সেই মন্ত্রের উপর সোনার বা রুপার মুখ ও হাত পা বসাইয়া প্রতিমা খাড়া করা হইয়াছে। মূর্তি বা প্রতিমা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, মন্ত্র বা আসন স্মরণাতীত কাল হইতে বিরাজিত।' সুতরাং আমরা বলতে পারি গুপ্ত অঙ্গের মধ্যে এমনভাবে মন্ত্র অঙ্কিত রয়েছে যা সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা যায় না বা প্রকাশ করা হয় না। অর্থাৎ শক্তিপীঠের বা সতীপীঠের মূল উৎস হল সিদ্ধমন্ত্র। এদিক দিয়ে সিদ্ধপীঠ ও সতীপীঠের পার্থক্য খুব বেশি নয়। দক্ষিণেশ্বরে দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দৈবাদেশে। রানি রাসমণিকে স্বপ্নের মাধ্যমে আদেশ দিয়েছিলেন দেবী, 'প্রতিষ্ঠা কর আমার বিগ্রহ, স্থাপন কর এক অক্ষয় কীর্তির।' রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সেই অপূর্ব দেবালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব সাধন-কাহিনী কেবল স্থান 'মাহাত্ম্যের সৃষ্টি করেন, দক্ষিণেশ্বর বহুকাল আগে থেকেই দৈব নির্দিষ্ট তীর্থ। পুরাকালে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে দেউলিপোতা নামে এক স্থানের উপর বাণরাজার বাড়ি ছিল। বাণরাজা সেই গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দেবাদিদেবের নাম রেখেছিলেন 'দক্ষিণেশ্বর'। সেই অবধি গ্রামের নাম দক্ষিণেশ্বর বলে চিহ্নিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ থাকাকালীন বাণরাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এই গ্রামের মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত। বাণরাজার কাছারি বাড়ি ছিল শিবতলার গঙ্গাধারে। অনেকের মতে বাণরাজার প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর শিবই হলেন বর্তমানের শিবতলা ঘাটের 'বুড়োশিব'।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, দক্ষিণেশ্বর যদি বাণ রাজার প্রতিষ্ঠিত শিববিগ্রহের নামানুসারে অনুষ্ঠিত হয় তবে এ তীর্থ শৈবতীর্থ, এখানে শক্তিসাধনার কোনো ইতিহাস নেই। কিন্তু তা নয়, পীঠমালা গ্রন্থে বলা হয়েছে দক্ষিণেশ্বর থেকে বহুলা অর্থাৎ বেহালা পর্যন্ত ধনুকাকার বিশাল অঞ্চলই কালীক্ষেত্রের অন্তর্গত। দেবী ভাগবত অনুযায়ী এই বৃহৎ অঞ্চল কাশীর মতো পুণ্যভূমি, পুণ্য পীঠস্থান। সুতরাং শক্তিগ্রন্থে এই স্থানের শক্তিসাধনার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ রানি রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যে সব প্রসঙ্গের উত্থাপন করতেন তার কিছু কিছু স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেন, 'রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময় কথা বলিতেন। বলিতেন রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় একশত খানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন. যাত্রা করিবার অব্যবহিত

পূর্বরাত্রে স্বপ্নে দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই—ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

'বলিতেন—রাণী প্রথমে "গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল"—এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন। কারণ 'জনাআনি' 'দুয়আনি' খ্যাত ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ, রাণী প্রভূত অর্থদানে স্বীকৃত হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না। রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্বকূলে এই স্থানটি ক্রয় করেন।

'বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটি মনোনীত করিলেন, উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙা ও গাজি সাহেবের পীরের স্থান ছিল, স্থানটির কূর্মপৃষ্ঠের মতো আকার ছিল, ঐরূপ কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তি প্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দিষ্ট, অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন ঐ স্থানটি মনোনীত করেন।' সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন শক্তিসাধনার সমস্ত লক্ষণই দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে উপস্থিত ছিল। রানির মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল দৈবের ইচ্ছা, কোনো এক অদৃশ্য শক্তির পরিকল্পনা। এই কি দৈব পরিকল্পনা!

মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দেবীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখছেন, 'দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালী প্রতিমা। মার নাম ভবতারিণী।' মাস্টারমশাই একথা লিখলেও মন্দির সূত্রে জানতে পারা যায়, রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দেবীর নাম "শ্রীশ্রী জগদীশ্বরী কালী মাতা ঠাকুরাণী'—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আদর করে বলতেন 'ভবতারিণী'।

ভবতারিণীর চিন্ময়ী মূর্তিতে জগৎপ্রসবিনী মহাশক্তির খেলা দেখিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্নানযাত্রার দিন প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তির মৃণ্ময়ী আবরণকে খণ্ডবিখণ্ড করে তুলেছিলেন সাধনার প্রবল স্রোতে। নিজে হয়েছিলেন জগদম্বার বালক।' মহাশক্তির এই বিচিত্র লীলাকে সকলের কাছেই তুলে ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মতো অধিকারী গুরুর কাছে তন্ত্রসাধনার দুরূহ পদ্ধতি শিক্ষালাভ করেছিলেন। বাংলা তন্ত্রসাধনার জন্য প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রতিটি পালন করেছিলেন। প্রশ্ন হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন তন্ত্রসাধনা করতে গেলেন। মাতৃসাধকরূপে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তন্ত্রসাধনার কঠিন পদ্ধতি তিনি অবলম্বন নাই করতে পারতেন। তবু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তিনি এই সাধনমার্গ লাভ করেছিলেন। তন্ত্রসাধনায় তিনটি ভাবধারার কথা বলা হয়, বীরাচার, পাশ্বাচার ও দিব্যাচার। যদিও দিব্যাচারের সাধন শ্রেষ্ঠ সাধন, তবু দিব্যাচারী সাধক বিরল। প্রতিটি স্ত্রীর মধ্যে মাতৃরূপকে গ্রহণের মাধ্যমে সাধকের দেবত্বে উত্তরণ যে সম্ভব তা তৎকালের তন্ত্রসাধকগণ বিস্মৃত হয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, 'রূপরসাদি যে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযম সহায়ে বারংবার উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে

ঈশ্বরের মূর্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করাইলেই তান্ত্রিক ক্রিয়াসকলের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম ও সর্বভূতে ঈশ্বরধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা করিয়াছেন। এবং তাঁহাকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বনপূর্বক তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে, নতুবা নহে একথা লোক কালধর্মে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়া সকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রই দায়ী স্থির করিয়া সাধারণে তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্র মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুল কোন লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাঁহার নির্দেশ লাভপূর্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।' অর্থাৎ দিব্যাচার ও মাতৃভাবের প্রচারের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্র সাধনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সতীপীঠ বা শাক্তপীঠগুলিতে আমরা দেবীকে কেবল পূজা করি। কিন্তু মানবীর মধ্যে দেবত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করার কোনো অঙ্গীকার সেই পূজায় থাকে না। সর্বশক্তিময়ী মহাশক্তির কাছে আনত হওয়ার প্রত্যাশাই কেবল থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরকে কেবল সাধনমার্গ দিয়ে সিদ্ধপীঠে পরিণত করলেন না। তিনি জগতের প্রতিটি নারীর মাতৃভাবকে জাগ্রত করলেন। এদিক দিয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্র সাধনা অভিনব ও মৌলিক।

যুবক নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। নিরাকার স্বগুণ ব্রহ্মে বিশ্বাসী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভবতারিণীদেবীর প্রতি ভক্তিকে ভাবালুতা বলে মনে করতেন। কিছুতেই তিনি শক্তিকে মানতে চাইতেন না। অবশেষে তাঁর জীবনে নেমে এল দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার সেই দিনগুলি। শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন বললেন, 'আপনি তো মাকে সব কথা বলেন, আমার কথা বলুন। যাতে সাংসারিক চিন্তা দূর হয়ে যায়।' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'তুই তো মাকে মানিস না। মা তোর কথা শুনবে কেন? যা আজ মঙ্গলবার, তুই মায়েব কাছে গিয়ে সংসার-স্বাচ্ছন্দ্য চেয়ে নে।' শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে গিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু সংসার-সুখের পরিবর্তে প্রাণ ভরে চেয়েছিলেন জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস। বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিছুতেই সংসারের কথা বলা হল না নরেন্দ্রনাথের। তিনবার প্রচেষ্টার পর বুঝলেন এ নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা। ফিরে এসে তাঁকেই ধরলেন। সে রাত্রে শক্তিকে মেনেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। সমস্ত রাত্রি নাটমন্দিরে বসে মাতৃসংগীতে ভরিয়ে তুলেছিলেন। পরদিন ঘুমন্ত নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বহু ভক্তকেই উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'নরেন মাকে মেনেছে, বেশ হয়েছে, নয়?' নরেন্দ্র মাকে মানা'র রহস্যটি কেউই উন্মোচিত করেননি। অর্থাৎ সে রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন উপলব্ধিতে নরেন্দ্রনাথকে ঐশ্বর্যবান করে তুলেছিলেন তা আমাদের অজানা। পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে এই রাত্রির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে, বিবেকানন্দ জানিয়েছিলেন. 'সেইদিনের অভিজ্ঞতা, আমার সঙ্গেই চলে যাবে। কেউ কোনওদিন জানবে না।' কোনো কোনো গবেষকের মতে সেইদিন হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দীক্ষাদান করেছিলেন। আবার অন্যমতে হয়তো সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে দেব দেউলে দুই দেবীর অস্তিত্ব।

একজন মৃণ্ময়ী অপরজন রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত জাগ্রত প্রতিমা। তিনি হয়তো বা নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন, নহবতে যিনি আছেন আর মন্দিরে যিনি আছেন—দু'জনই এক। অভিন্ন। কখনো মাতারূপে কখনো স্ত্রীরূপে বিরাজিতা, মধ্যিখানে শ্রীরামকৃষ্ণই যেন এক সেতু, এক সংযোগ সূত্র। সারদার স্বরূপকে উন্মোচিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই চিরদিন নরেন্দ্রনাথ নতমস্তকে শ্রীমায়ের কথা মেনেছেন। বারংবার শ্রীমায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে ভক্তদের সচেতন করেছেন। 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?'—এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এইদিন হয়তো তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ভক্তিভাবে আপ্লুত হয়ে তিনি সমস্ত রাত্রি গান গেয়েছিলেন।

আমার মা ত্বং তারা
আমি জানি গো
দীন দয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুখহরা—
সত্যই সারদা আমাদের
দুর্গম দিনে দুখহরা!

দুই

শ্রীমার পঞ্চতপা অনুষ্ঠান ১৮৯৩ (১৩০০) সালের ঘটনা। এই পর্যায়ে শ্রীমা যেন সাধনার খোলস ছেড়ে কল্যাণময়ী ব্রতে নিজেকে স্থাপন করেছিলেন। সেই নবীন অথচ মৌলিক সুধা ভাণ্ডারটির অমৃত পান করেছিলেন নাগমশাই। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত শ্রীদুর্গাচরণ নাগ। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীমার মনেও দেহত্যাগের সংকল্প জাগে। পৃথিবী ত্যাগ করে যাওয়ার বাসনা তীব্র হয়। বাসনাহীন শুষ্ক জীবন—সোনার ঠাকুরই চলে গেলেন তাঁর আর থাকার সার্থকতা কোথায়? পঞ্চতপা অনুষ্ঠানে তাঁর এই অন্তর্দাহের পরিসমাপ্তি ঘটল, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর পরিপুষ্টির জন্য যে তাঁর একটি ভূমিকা রয়েছে তা ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন।

এইসময় একদিন নীলাম্বর মুখুজ্জের বাগান বাড়িতে উপস্থিত হলেন নাগমশাই। সেদিন ছিল একাদশী। শ্রীমা তখন আহারে বসেছেন হঠাৎ পরিচারিকা এসে খবর দিলেন 'মা নাগমশাই কে? তিনি প্রণাম করছেন কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন মনে হয় রক্ত বেরুবে। মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) পেছন থেকে কত বলছেন থামার জন্য কিন্তু কোনো বাক্যই নেই—যেন হুঁশ নেই। পাগল নাকি মা?' পরিচারিকার মুখে এই কথা শুনে শ্রীমা চমকিত হয়ে বললেন, 'ওগো যোগেনকে (স্বামী যোগানন্দ)-কে বল এখানে পাঠিয়ে দিতে।'—তখন কিন্তু শ্রীমায়ের দেখা পুরুষ ভক্তরা পেতেন না। সিঁড়িতে প্রণাম করলে পরিচারিকা চিৎকার করে বলে দিতেন, 'অমুক বাবু প্রণাম করছেন'।—এই ছিল নিয়ম। কিন্তু সেদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল, শ্রীমা নাগমশাইকে দর্শনদানের জন্য নিয়ে আসতে বললেন। শ্রীমায়ের আদেশ শুনে স্বামী যোগানন্দ নিজেই নাগমশাইকে ধরে আনলেন। মা দেখলেন মাথা ঠুকতে ঠুকতে নাগমশাইয়ের কপাল ফুলে উঠেছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, পা টলছে—এ জগতে মন নেই ভক্তের তিনি ভাবে বিহ্বল ও আপ্লুত। মুখে কেবল মা-মা রব। শ্রীমা ধীরে ধীরে তাঁকে বসালেন। চোখ মুছিয়ে দিলেন, একাদশীর লুচি মিষ্টি ফল নিজের হাতে তাঁর মুখে তুলে দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে একটু প্রকৃতিস্থ হলে তাঁকে ধরে নামানো হল। নাগমশাই তখন বলছেন, নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। 'আমি নই, আমি নই, কেবল তুমি তুমি।'—আর তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন এক মহাবাক্য। 'বাপের চেয়ে মা দয়াল'—অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণরূপ পিতৃসত্তার চেয়ে মাতৃরূপ সারদার দয়া সমুদ্র বেশি আপ্লুত করবে, কারণ তিনি মা।

বাস্তবিকই নাগমশাই-এর এই বাক্য শ্রীমার পঞ্চতপা পরবর্তী অধ্যায়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন সঙ্ঘগঠনে তৎপরা, অপরদিকে করুণার সমুদ্র। পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের পরে ১৩০০ সালের মাঘ মাসে শ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়ি থেকে বলরাম বসুর পরিবারের সঙ্গে বিহারেব কৈলোরে গেলেন। এইসময় বলরাম বসুর কন্যা ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে কৃষ্ণভাবিনী শোকে জর্জরিত হয়েছিলেন। শোকগ্রস্ত মনে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেল। বলরাম বসুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর রোগগ্রস্ত দেহকে সুস্থ করার জন্যেই কৈলোরে যাওয়া ঠিক হল। সঙ্গে গেলেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, গোলাপ-মা।

এখানে আমরা দেখি মায়ের প্রথম সন্ন্যাসী সেবক লাটু মহারাজ অর্থাৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ অনুপস্থিত। অর্থাৎ এইসময় থেকেই স্বামী যোগানন্দ মায়ের সেবার ভার পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। এখানে মনে রাখতে হবে, মায়ের অপর দুই সেবক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ—উভয়েই এ সময় মায়ের সঙ্গে ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তের মধ্যে যাঁরা অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুটি বিভাজন করা হয় একটি গৃহীভক্ত, অপরটি সন্ন্যাসী—যাঁদের হাতে সঙ্ঘ গঠনের ও ভাবআন্দোলন পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ষোলোজন সন্ন্যাসী যুবকের মধ্যে চারজন ছিলেন শ্রীমায়ের ভারবহনকারী সেবক। অপর সন্ন্যাসীগণ শ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা ও শ্রীরামকৃষ্ণেরই পৃথক বিগ্রহরূপে চিহ্নিত করলেও তাঁরা সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। চারজন সেবকের মধ্যে স্বামী সারদানন্দের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি শ্রীমার জীবনের এমন একটি অধ্যায়ে বিরাজিত ছিলেন যে অধ্যায়ে শ্রীমা নিজের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ রূপটি তাঁর অবগুণ্ঠন থেকে উন্মোচিত করেছেন, একাধারে তিনি তখন ভক্তজননী অন্যধারে তিনি শৈশব বেলুড় মঠের নীরব কর্ত্রী।

বিহারের কৈলোর থেকে ফিরে এসে শ্রীমা দেশে অর্থাৎ জয়রামবাটিতে চলে যান। পরে ১৮৯৪ (১৩০১)-এর দুর্গাপূজার আগে পর্যন্ত তিনি বেলুড়ে বাস করেন। দুর্গাপূজার সময় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের মা মাতঙ্গিনী দেবীর নিমন্ত্রণে তিনি আঁটপুর যান। এই বছর মাতঙ্গিনীদেবী নতুন করে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। এই পূজায় যোগদান করে শ্রীমা জয়রামবাটি চলে যান। ১৮৯৪-এর শেষদিকে শ্রীমা আবার কাশী, বৃন্দাবন গমন করেন। এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী, গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতি। বৃন্দাবন থেকে কলকাতায় ফিরে শ্রীমা শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় অর্থাৎ শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কলুটোলার ৫১ নং ভবানী দত্ত লেনের বাড়িতে এক মাস বাস করেন। এরপর ১৮৯৫-এর ১৩ই মে তিনি কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি চলে যান। এরপর শ্রীমা ১৩০৩ সালের প্রথমদিকে বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর বিবাহ উপলক্ষে কলকাতায় আসেন এবং বিবাহ উপলক্ষে বসু গৃহ পরিপূর্ণ থাকায় তিনি ৫৯/২ রামকান্ত বসু স্ট্রিট-এ এক মাস বাস করেন।

১৮৯৩-এ শ্রীমা পঞ্চতপা অনুষ্ঠান করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে এই বছরে রামকৃষ্ণ আন্দোলনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়—যে ঘটনাটি সর্বজনবিদিত—স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান। এই ধর্মমহাসম্মেলনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা সমগ্র জগতে পরিচিতি লাভ করে। এ ঘটনা নিশ্চয়ই আশ্চর্যের, যে সময়ে পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের পর শ্রীমায়ের জীবনে পৃথক একটি অধ্যায়ের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক সেইসময়ই আন্দোলনের পরিচিতি ও সংগঠনের সূচনা হচ্ছে। শ্রীমা যখন বেলুড়ে ঘুষুড়ির বাড়িতে ছিলেন তখন নরেন্দ্রনাথ ভারত পরিভ্রমণে নির্গত হন। ১৮৯০-এর জুলাই মাসে নরেন্দ্রনাথ এই ঘুষুড়ির বাড়িতে এসে মাকে প্রণাম করেন এবং তাঁকে গান শোনান। এরপর জোড়হস্তে বলেন, 'মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।' শ্রীমা বলে ওঠেন 'সে কী!' তখন স্বামীজি বলেন, 'না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।' মা তখন শ্রীরামকৃষ্ণের চোখের মণি নরেন্দ্রনাথকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন ; নরেন্দ্রনাথও মাতৃ-আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে ভারত পরিভ্রমণে নির্গত হন। এর মধ্যে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যাওয়ার আগে নরেন্দ্রনাথ শ্রীমায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। মা তাঁর

শিকাগো যাত্রা অনুমোদন করলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। শ্রীমা যখন রামকান্ত বসু স্ট্রিটে বাস করছেন তখন মঠে সকলের উদ্দেশে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের একখানি উদ্দীপনাময় চিঠি শ্রীমাকে পড়ে শোনানো হয়। এই চিঠিতে স্বামীজি শিব জ্ঞানে জীব সেবার কথা বর্ণনা করেছিলেন এবং নরনারায়ণের সেবার জন্যে সকলকে উজ্জীবিত হতে আহ্বান করেছিলেন। বিবেকানন্দের এই চিঠিখানি পাঠ করে শ্রীমা বলেন, 'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে, নরেনকে দিয়ে এসব লিখাচ্ছেন।'

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীমায়ের কথাটি সামান্য হলেও তৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে তার একটি বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনে শিবজ্ঞানে জীবসেবার ধারণা অনেকের কাছেই পরিস্ফুট হয়নি। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে কেবল মাকালীর পূজারি ও সিদ্ধ সাধক রূপেই বন্দনা করে এসেছেন, যুগ প্রয়োজনেও তাঁর ভাবধারার একটি বিরাট ভূমিকার কথা স্মরণে রাখেননি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীব সেবা'র কথা প্রচার করেন এবং একটি সন্ন্যাসী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন তখন তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি অনেকের কাছেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। এবং কেউ কেউ নরেন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের বিরোধী রূপে চিহ্নিত করতে তৎপর হয়েছিলেন। এই বিরোধিতার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের আদর্শগত কর্মপদ্ধতি যে সঠিক দিকে প্রবাহিত তা নির্দেশ করবার, তাকে সমর্থন করবার অধিকার একমাত্র শ্রীমায়েরই ছিল। কারণ তিনি ছিলেন স্ত্রী ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণেরই অপর রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন সাধন ভাবনায় বুঁদ ছিলেন। সকল ধর্মমত ও ধর্মপথকে নিজ জীবনছবিতে চিত্রায়িত করতেই তাঁর বহুদিন ব্যয় হয়েছিল। এই ভাবসমুদ্রকে বিশ্বের জনসমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে প্রয়োজন ছিল নরেন্দ্রনাথের। নরেনকে তিনি সেইভাবেই গঠন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের ধর্মপ্রচারের বাহ্যিক প্রকাশে ভিন্নতা দেখেছেন কেউ কেউ। সমালোচনা করেছেন, নরেন বুঝি ঠাকুরের ভাব ছেড়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করছে। রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সূচনায় এই ভাবগত দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল এবং তার নিষ্পত্তি করেছিলেন শ্রীমা। নরেন্দ্রনাথ যে শ্রীরামকৃষ্ণানুসারী হয়েই কাজ করছেন তা আর বলার প্রয়োজন থাকে না যখন শ্রীমা বলেন, 'নরেন ঠাকুরের হাতের যন্ত্র'।—যা হোক, রামকান্ত বসু স্ট্রিটের বাড়িতে একমাস বাস করার পর শ্রীমা বাগবাজারের গঙ্গার ধারের সরকার বাড়ি লেনের ভাড়া বাড়িতে চলে যান। এই বাড়ির একতলায় হলুদের গুদাম ছিল বলে অনেকে একে 'গুদামবাড়ি' বলত। এই বাড়িতে পাঁচ-ছয় মাস থেকে শ্রীমা কালীপূজার পর দেশে যান। ১৩০৪ সালে শেষে তিনি আবার কলকাতায় আসেন এবং ১০/২ বোসপাড়া লেনের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। বেলুড় মঠের দিনলিপি থেকে জানা যায় ওই বছর ১৪ই মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ বহু ভক্ত সঙ্গে এই বাড়িতেই শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বিবেকানন্দ তখন সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত। রামকৃষ্ণ আন্দোলনও নতুন এক অধ্যায়ের সূচনায়।

তিন

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীশিষ্যকুলের মধ্যে যে কয়েকজন সারদা সন্নিধানে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'নাগমহাশয়' বা দুর্গাচরণ নাগ অন্যতম। শ্রীমায়ের প্রসঙ্গে আমরা বিক্ষিপ্তভাবে নাগমহাশয়ের নাম উল্লেখ করলেও তাঁর অসাধারণ জীবন ও শ্রীমায়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

অধুনা বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিমে দেওভোগ গ্রামে দীনদয়াল নাগের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন দুর্গাচরণ নাগ। বাল্যকালে মাতৃহারা হয়েছিলেন দুর্গাচরণ, পিসিমা ভগবতী দেবীকেই মা বলে জানতেন তিনি। ধর্মপ্রাণ দীনদয়াল ছিলেন অত্যন্ত নির্লোভ প্রকৃতির। পিসিমা ও পিতার কাছেই দুর্গাচরণের ধর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। মিষ্টভাষী, দীর্ঘ কেশযুক্ত বালক দুর্গাচরণ সকলের প্রিয় ছিলেন। স্বভাব ভাবুক মনের পরিচয় ছোটবেলা থেকেই পাওয়া যেত। সন্ধ্যার সময় তারকাখচিত আকাশ দেখতে দেখতে বালক পিসিমাকে বলতেন, 'চলো মা, আমরাও দেশে চলে যাই—এখানে থাকতে আর ভালো লাগে না।' গাছের পাতাগুলি বাতাসে দুললে নাগমহাশয় আনন্দে বলে উঠতেন, 'আমি ওদের সঙ্গে খেলব।' পিসিমা পুরাণের গল্প বলতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। গল্প শুনে বালক রাত্রে দেব-দেবীর স্বপ্ন দেখতেন।

ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাচর্চায় মনোযোগী দুর্গাচরণ। বিশেষ করে বাংলা রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। যুবক দুর্গাচরণ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ওই বিদ্যালয় ত্যাগ করে হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে শিক্ষা করলেন এবং ডাক্তাররূপে সুনাম অর্জন করলেন। দুর্গাচরণ কলকাতায় পড়াশুনা করার আগেই পিতার অনুরোধে প্রসন্নকুমারী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করলেন। স্বভাব বৈরাগী নাগমহাশয় বিবাহ করলেন বটে কিন্তু তাঁর ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত হয়ে উঠল। পাছে নববধূর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করতে হয়, এই ভয়ে নাগমহাশয় সন্ধ্যা হলেই গাছের ডালে উঠে বসতেন এবং যতক্ষণ না পিসিমা তাঁকে নিজের ঘরে শোওয়ার অনুমতি দিতেন, ততক্ষণ তিনি নামতেন না। নাগমহাশয়ের প্রথমা পত্নী বেশিদিন বাঁচলেন না।

ছোট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গরিবদের সেবা করা দুর্গাচরণের নেশা হয়ে উঠল। তার সঙ্গে চলল আধ্যাত্মিক জীবনে নিষ্ঠা ভরে সাধনভজন। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক গৃহীভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে নাগমশাই-এর পরিচয় হল। সুরেশচন্দ্র দত্ত সাকার ভগবান সম্বন্ধে সন্দীহান ছিলেন। নাগমশাই তাঁকে বলতেন, যে বস্তু আছে তাকে নিয়ে আবার বিচার করা কেন? সুরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা তাঁর ভালো লাগলেও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য আচার তাঁর মনঃপুত ছিল না। এইসময় বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে শ্মশানে বসে মহানিশায়

জপধ্যান আরম্ভ করেন। এর ফলে তাঁর শুভ্রজ্যোতি দর্শন হতে থাকে। সংসার ভুলে দুর্গাচরণ ধর্মসাম্রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পিতা দীনদয়ালের চোখে পুত্রের এই পরিবর্তন চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিল। তিনি পুত্রকে সংসারী করার জন্য আবার বিবাহের আয়োজন করলে এবারেও দুর্গাচরণের কোনো আপত্তি টিকল না। পিতৃভক্ত নাগমহাশয় শরৎকামিনীর পাণিগ্রহণ করলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী সর্বতোভাবে এই চূড়ান্ত ত্যাগের জীবনে যোগ্য অংশীদার হয়েছিলেন। নাগমহাশয় গৃহী হলেন বটে কিন্তু অচিরেই তাঁর জীবনে এমন ঘটনা ঘটল যা তাঁর বৈরাগ্যের শিখাকে শত গুণে বর্ধিত করে তুলল। মাতৃসমা পিসিমা হঠাৎ পরলোকগমন করলেন। রামমন্ত্রে দীক্ষিতা পিসিমা শেষ সময়ে নাগমহাশয়কে আশীর্বাদ করলেন, 'তোর যেন রামে মতি থাকে।' পিসিমার মৃত্যু তাঁকে উন্মত্ত প্রায় করে তুলল। তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় চিতাভুমির পাশে কাটাতে লাগলেন। পুত্রের অবস্থা দেখে দীনদয়াল দুঃখিত হয়ে বললেন, 'তোর কাছ থেকে আমার বহু আশা ছিল; এখন বুঝেছি, আমি আত্মবঞ্চিত হয়েছি। তুই যে দরবেশ হতে চলেছিস।' পিতার হতাশ উক্তিতে নাগমহাশয়ের স্বভাবের কোনো তারতম্য হল না। সহধর্মিণীকে বললেন, 'আমাকে ভুলে মহামায়ার শরণাপন্ন হও, তোমার ইহকাল পরকালের ভালো হবে।'

এরকমভাবে কিছুদিন যাতায়াতের পর সুরেশচন্দ্র দত্তের কাছ থেকে দক্ষিণেশ্বরের সাধুর কথা জানতে পারলেন। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে একদিন দুপুরের আহারের পর দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে চললেন। দক্ষিণেশ্বর কোথায় জানেন না—কিছুদূর গিয়ে পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে চলে গিয়েছেন। আবার পিছনে হেঁটে বেলা দুটোর সময় পৌঁছালেন মন্দিরে। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে খুঁজে পাবেন কোথায়? এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটি ঘরের বারান্দায় এক শ্মশ্রুধারী পুরুষকে বসে থাকতে দেখলেন। তাঁকে পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'পরমহংসদেব চন্দননগরে গিয়েছেন—আজ আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।' ইনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত প্রতিবেশী আত্মীয় শ্রীপ্রতাপচন্দ্র হাজরা। পণ্ডিতমন্য এই ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদেরকে অসত্য কথা বলে নিজের বিদ্যা জাহির করতেন। নাগমহাশয়দের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হল না। পরমহংসদেব নেই শুনে তাঁরা যখন ফিরে আসছেন তখন হঠাৎ দেখলেন ঘরের ভিতরে ছোট একটি তক্তাপোশের উপর পা ছড়িয়ে এক ব্যক্তি বসে আছেন এবং ইশারায় তাঁদের ডাকছেন। দেখলেই মনে হয় এই ব্যক্তি পবিত্রতার ঘনীভূত মূর্তি। ধীরে ধীরে তাঁরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল ইনিই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারে পাঁকাল মাছের মতো কী করে থাকতে হবে, কী করে নির্লিপ্ত থাকা যাবে—এ বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ফিরবার সময় বলে দিলেন, 'আবার এসো; এলে গেলে তবে তো পরিচয় হবে।'

ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়ে চলল, দ্বিতীয় দিন নাগমহাশয়কে কাছে বসিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভয় কী? তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা।' শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে বসলেন নাগমহাশয়। সুরেশচন্দ্র দত্তকে উৎফুল্ল হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখছ, এই লোকটা যেন আগুন—জ্বলন্ত আগুন!' নাগমহাশয় ছিলেন দীনতার

প্রতিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নরেন্দ্রনাথকে বললেন, 'এরই (নাগমহাশয়ের) ঠিক ঠিক দীনতা—একটুও ভান নাই। নরেন্দ্র ও নাগমহাশয়ের প্রথম আলাপের এক টুকরো স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন জীবনীকার। তিনি লিখছেন, 'উভয়ের আলাপ আরম্ভ হইল। ভক্ত বলেন, তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাও নড়ে না।' জ্ঞানী বলেন, 'আমি তিনি-টিনি বুঝি না আমিই প্রত্যক্ষ আত্মা—আমার ইচ্ছায় এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড—যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছে। বিচারের আর শেষ নাই। অবশেষে যবনিকাপাতচ্ছলে ঠাকুর সহাস্যে নাগমহাশয়কে বলিলেন, 'কি জান, ও খাপ-খোলা তলোয়ার, ওর ও কথা শোভা পায়; নরেন ও কথা বলতে পারে।' অমনি নাগ মহাশয়ের ধারণা হইল, ঠাকুরের লীলাসহায়করূপে জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেব নরেন্দ্ররূপে অবতীর্ণ—নরেন্দ্র মানুষ নহেন। অতএব শিবাবতার নরেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।'

নরেন্দ্রনাথ ও নাগমহাশয় দুই বিপরীত মেরুর চরমপন্থী সাধক। এঁদের সম্পর্কে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, 'নরেনকে ও নাগমহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন, সে তত বড় হয়ে যায় মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হল যে, মায়া হতাশ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। নাগ মহাশয়কে মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যত বাঁধেন, নাগমহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।'

যথার্থ সাধুত্বকে জীবনে বরণ করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গৃহত্যাগ করতে বারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থাকবে; তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে গৃহে থাকলেন নাগমহাশয় কিন্তু দীনতার বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। গায়ে একটি মাত্র ভাগলপুরী খেশ। পায়ে কোনো চটি নেই, দিনান্তে দুই গ্রাস অন্ন, 'তাতে জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে বলে' লবণ বা মিষ্ট বর্জিত। সামনে কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে ঋণ করেও তাঁকে সাহায্য করা—এ ছিল তাঁর চরিত্রের অঙ্গ। জীবনীকার লিখছেন, 'বিষয় প্রসঙ্গ তাঁহাকে পীড়া দিত। কেহ ঐরূপ কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, 'জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুরের নাম করুন, মায়ের নাম করুন।' তাঁহার মুখে কাহারও নিন্দা শোনা যাইত না। ভুলক্রমে তাঁহার মুখ দিয়া একবার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা নির্গত হওয়ায় শাস্তিস্বরূপে তিনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া স্বীয় মস্তকে এরূপ আঘাত করেন যে, মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে এবং ঘা শুকাইতে দীর্ঘকাল লাগে। মনেও ঐরূপ চিন্তা আসিলে তিনি অনুরূপ প্রতিকার করিতেন। একবার রিপুজয়ের জন্য কয়েকদিন নিরম্বু উপবাসান্তে রন্ধন করিতেছেন, এমন সময়ে সুরেশবাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সম্ভবত তখন সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে মনে কোনো বিপরীত চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাই নাগমহাশয় ভাতের হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং সুরেশবাবুকে বারংবার প্রণাম করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেদিন আর অন্নাহার হইল না। এইরূপ গৃহে থাকিয়াও নাগমহাশয় অরণ্যবাসী যোগীর ন্যায় সর্ব বিষয়ে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। বস্তুত যম—নিয়মাদিতে তিনি তখন সিদ্ধ হইয়াছেন এবং ধ্যানাদিতেও অতি উচ্চভূমিতে আরূঢ় হইয়াছেন। গিরিশবাবু তাই বলিয়াছিলেন, 'অহং শালাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে নাগমহাশয় তার মাথা ভেঙে ফেলে

দিয়েছিলেন—তার আর মাথা তোলবার যো ছিল না।' শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত 'নাহং-নাহং তুঁহু-তুঁহু' সাধনার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় নাগমহাশয় এক অসাধারণ জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন সত্য। তবু শ্রীমায়ের জীবনীর প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখযোগ্য হয়ে দেখা দেয় কারণ তিনিই শ্রীমায়ের জয় ঘোষণা করে বলেছিলেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল।' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যে প্রবেশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় সারদা বেশি কৃপাময়ী। তৎকালের কৃতবিদ্য এক ডাক্তার ও অসাধারণ সাধক মানুষ এক ব্রাহ্মণের বিধবার মধ্যে কী ঐশ্বর্যের দেখা পেয়েছিলেন তা আমাদের জানবার কৌতূহল হয়। জনৈক ভক্তকে শ্রীমা নাগমহাশয় সম্বন্ধে বলেছিলেন, বাঙাল দেশীয় দুর্গাচরণ আসত। তার কী গুরুভক্তিই ছিল! ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁর জন্য তিনদিন খুঁজে খুঁজে আমলকী এনে দিলে। তিনদিন আহার-নিদ্রা নেই। একবার শালপাতে প্রসাদ দিলুম।

[বাগবাজারের গঙ্গার ধারের গুদামওয়ালা বাড়িতে]। পাতাসুদ্ধ খেয়ে ফেললে! কাল, শুকনো চেহারা—কেবল চোখ দুটি বড় আর উজ্জ্বল ছিল। প্রেমের চক্ষু, সর্বক্ষণ প্রেমাশ্রুতে ভেজা থাকত। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২২৫২)।

"তখনকার কত সব কেমন ভক্ত ছিল। এখন যারা আসছে, কেবল বলছে, 'ঠাকুর দেখিয়ে দাও।' সাধন নেই, ভজন নেই, জপ-তপ নেই, কত জন্মে কত কী করেছে—কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, প্রাণহত্যা করেছে! সে সব ক্রমে ক্রমে কাটবে, তবে তো? আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস করে কী যায়? এও তো তেমনি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা আমরা জানি। যিনি শ্রীমায়ের সম্মুখে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারতেন না। আর গৃহী ভক্তদের মধ্যে নাগমহাশয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি সারদা সন্নিধানে এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক বিহ্বলতা।

জীবনীকার তাঁর এই বিহ্বলতার এক খণ্ডচিত্র উপহার দিয়েছেন, 'একবার একখানি ময়লা জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া এবং নিজেদের গাছের এক ঝুড়ি আম মাথায় লইয়া তিনি শ্রীমায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আমগুলি খুবই ভালো ছিল; কতকগুলিতে চুনের ফোঁটা দেওয়া ছিল। মায়ের বাটীতে আসিয়া তিনি ঝুড়ি মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—কাহারও হাতে উহা দেন না। শ্রীমা শুনিয়া বলিলেন, 'এখানে পাঠিয়ে দাও।' নাগমহাশয় ঝুড়ি মাথায় করিয়াই আসিলেন এবং একজন ব্রহ্মচারী উহা নামাইয়া লইলে মাতাঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিলেন। মা দেখিলেন, তিনি বেহুঁশ—মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম ও 'মা, মা' রব, আর বক্ষ নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছে। তখনো ঠাকুরপূজা হয় নাই।

আমগুলি কাটিয়া ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইল। পূজান্তে যোগীন মা আসিয়া একখানি শালপাতায় শ্রীমাকে প্রসাদ দিয়ে গেলে তিনি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং গোলাপ মাকে বলিলেন, 'আর একখানা শালপাতা দাও।' পাতা দেওয়া হইলে উহাতে কিছু প্রসাদ তুলিয়া দিয়া তিনি নাগমহাশয়কে বলিলেন, 'খাও।' কিন্তু কে খাইবে? তাঁহার দেহজ্ঞানই নাই—হাত যেন অবশ। শ্রীমা তাঁহার হাত ধরিয়া অনেক করিয়া খাইতে বলিলে তিনি খাইলেন না, শুধু

এক টুকরা আম লইয়া মাথায় ঘষিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমা নিরুপায় হইয়া নীচে সংবাদ পাঠাইলেন এবং একজন আসিয়া নাগ মহাশয়কে লইয়া গেলেন। নীচে গিয়া প্রণাম করিতে করিতে তিনি মাথা ফুলাইয়া ফেলিলেন এবং বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

"......তাঁহার প্রতি শ্রীমায়ের অপার স্নেহ তাঁর দেহত্যাগের পরেও শতধা প্রকাশিত হইত। জনৈক ভক্ত একদিন দেখিয়াছিলেন, মাতাঠাকুরাণী তাঁহার শয়নঘরের দেওয়ালে ঝুলানো স্বামীজি, গিরিশবাবু ও নাগমহাশয়ের ছবিগুলি একে একে মুছিয়া, উহাতে চন্দনের ফোঁটা দিয়া হাত দিয়া চুমা খাইলেন এবং সর্বশেষ নাগমহাশয়ের ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'কত ভক্তই আসছে, কিন্তু এমনটি আর দেখছি না।'

শ্রীমা নাগমহাশয়কে একবার একখানি কাপড় দিয়েছিলেন। দীনতার প্রতিমূর্তি এই ভক্ত প্রবর সেই বস্ত্রখানি মাথায় বেঁধে রাখতেন। তাঁর কাছে শ্রীমা ছিলেন স্বয়ং জগজ্জননী মহামায়া।

চার

সঙ্ঘগঠনের প্রথম পর্যায় ঃ শ্রীমা

১৮৯৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সন্ন্যাসী মঠ তখন আলমবাজারে। বিবেকানন্দের আগমনে রামকৃষ্ণ আন্দোলনে এক বিরাট উদ্দীপনা এল। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসে বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কত উচ্ছ্বাস বাক্যই না প্রকাশ করেছেন। মহামান্য কেশব সেনের সঙ্গেও তুলনা করেছেন নরেনের। সংকুচিত হয়েছে সপ্রতিভ নরেন্দ্র নামে ছেলেটি। মুখে বলেছেন, 'এসব বলবেন না। লোকে আপনাকে পাগল বলবে।' খলখল করে হেসে উঠেছেন সাধক ব্রাহ্মণ। 'আমি কী বলি রে মা যে আমাকে বলায়।' আজ তাঁর সহস্রদল নরেন্দ্রনাথ পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়েছেন। সেই সহস্রদলের সুগন্ধে বিশ্ব আমোদিত। 'সাইক্লোনিক মঙ্ক' রূপে বিবেকের কশাঘাতে সচকিত করেছেন মানুষের আন্তরসত্তাকে। জাগিয়ে দিয়েছেন নতুন প্রেরণায়।

কিন্তু বিদেশে প্রচার-কার্যের সময় যে নারী-মঠ ও নারী-আন্দোলনের কথা স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন তা কিন্তু বাস্তবায়িত করার কোনো বাহ্যিক প্রচেষ্টা দেখা গেল না। বরঞ্চ ১৮৯৮ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারি বেলুড় গ্রামে গঙ্গার ধারে এক খণ্ড জমির বায়না নেওয়া হল এবং আলমবাজার মঠকে স্থানান্তরিত করে এক নতুন জমির পাশেই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে নতুন মঠের সূচনা হল। এপ্রিল মাস থেকে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে নতুন জমিতে মঠ নির্মাণের কার্য শুরু হল। ওই মাসেরই শেষ সপ্তাহে শ্রীমাকে নতুন জমি দেখাবার জন্য নিয়ে আসা হল সঙ্গে এলেন স্বামী যোগানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল, এবং গোলাপ মা। শ্রীমা প্রথমে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়িতে উপস্থিত হলেন। তখন গ্রীষ্মের প্রখর তাপ। মঙ্গলশঙ্খে তাঁকে বরণ করা হল, সন্ন্যাসীরা শ্রীমায়ের চরণ ধুইয়ে দিলেন। বিকেল চারটের সময় ফিরবার পথে স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনা করলেন, 'মা যাবার আগে যেন মঠের নূতন জমিতে একবার পদধূলি দিয়ে যান।' শ্রীমা তখন নৌকো করে মঠের জমির উদ্দেশে রওনা হলেন। জমি দেখে শ্রীমায়ের কী আনন্দ! বললেন, 'এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।' এই প্রসঙ্গে শ্রীমা পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপারে ঐ জায়গাটিতে—যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন (তখন মঠ হয়নি) মঠের নতুন জমি কেনা হলে পরে নরেন একদিন আমাকে নিয়ে জমির চতুঃসীমা ঘুরে ঘুরে দেখালে, বললে, 'মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

"বোধগয়ার মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত!' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হলো।

'একদিন নরেন এসে বললে, 'মা, এই ১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন।'

বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধমঠ দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে সন্ন্যাসীসঙ্ঘ গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত করার কথা চিন্তা করেছিলেন শ্রীমা। যদিও আমাদের মনে হয় এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সূচনা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরেই। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং একটি সন্ন্যাসীসঙ্ঘের কথা নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। কারণ সকলের অলক্ষ্যে, দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি নরেন্দ্রনাথকে উপদেশ দিতেন। তাঁদের এই গোপন আলোচনা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ একসময় যুবক রাখাল বা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'রাখালের রাজবুদ্ধি আছে'। শ্রীরামকৃষ্ণের সেইদিনের কথা মনে রেখে স্বামীজি বেলুড় মঠের প্রথম প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি করলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে।

১৮৯৮-এর অক্টোবরে স্বামী বিবেকানন্দ অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করে কলকাতায় ফেরার পর অষ্টম দিন শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাগবাজারে উপস্থিত হলেন। স্বামীজি শ্রীমাকে প্রণাম করলেন, শ্রীমা তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর শ্রীমাকে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'মা, এই তো তোমার ঠাকুর। কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত যেত বলে সে শাপ দিলে, তিন দিনের ভেতর ওকে উদরাময়ে এখান ছেড়ে যেতে হবে। আর কিনা তাই হল—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না। তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।' শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বই কী বাবা! তাঁরা তো আর ভাঙতে আসেন না। আমাদের ঠাকুর হাঁচি, টিকটিকি পর্যন্ত মেনেছেন। শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই নিজের শরীরে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জানো, খুড়তুতো দাদার (হলধারী) অভিসম্পাতে ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তোমার শরীরে অসুখ আসা ঠাকুরের শরীরে আসা একই কথা।' শ্রীমায়ের কথা শুনেও বিবেকানন্দ অভিমানভরে বলতে লাগলেন যে, শ্রীমা যতই বলুন না কেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে মানতে রাজি নন। শ্রীমা তাঁর কথা শুনে এবার সকৌতুকে জবাব দিলেন, 'না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।' শ্রীমায়ের এই কথা শুনে, তাঁর কথার সত্যতা উপলব্ধি করে সজল নয়নে বিদায় নিলেন বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতি তাঁর নিত্য উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ নয়, এ হল শ্রীরামকৃষ্ণের মহাশক্তির খেলা। নরেন আর ঠাকুর এক। প্রথমে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়িতে এক ভাবদৃশ্য দেখেছিলেন শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশে যাচ্ছেন গঙ্গাজলে, নরেন্দ্রনাথ সেই পূত-পবিত্র গঙ্গাবারি অজস্র মানুষের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আর সেই শান্তিবারির স্পর্শমাত্র তারা মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবগঙ্গা, নরেন্দ্র তাঁকে প্রচার ও প্রসারের ধারক। আবার নরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাময় পত্র শুনে শ্রীমা বলছেন, 'নরেন ঠাকুরের হাতের যন্ত্র।' এখানেও মূল শক্তিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে চিহ্নিত করছেন। তৃতীয় উপরিউক্ত ঘটনার মধ্য দিয়েও শ্রীমা বুঝিয়ে দিলেন নরেন্দ্রনাথ হলেন কার্য, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, নবীন মঠ ও তার নতুন কার্যধারা নির্ণয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে নানা বিতর্কের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এখানে নরেন্দ্রনাথের কর্মধারা যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব পথেরই অনুগামী তা বারংবার শ্রীমা সকলকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রস্তুতি হলে, বিবেকানন্দ 'শিবজ্ঞানে জীব সেবার' জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। ১৮৯৭-এর ১মে বলরাম বসুর ভবনে একটি সভা ডাকা হল। শ্রীরামকৃষ্ণের, গৃহী ও সন্ন্যাসী সন্তান সহ বহু সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় স্বামীজি একটি সমিতি গঠন করতে চান এবং সকলের সামনে তাঁর নিজ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোনো বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মতো দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরি করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। ওসব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মতো দ্বেষপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদর যত্ন করেছে! এদেশে শিক্ষা বিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণ -তন্ত্রমতে সঙ্ঘের কাজ চালাতে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘে একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ বিবেকানন্দের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন এবং সঙ্ঘের নাম রাখা হল, 'রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন'। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হল এইরকম, 'মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যেসকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং কার্যে তাঁর জীবনে প্রতিপাদিত হয়েছে, তাদের প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতির জন্য যাতে সেইসকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে, সেই বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।' আর এই মিশনের কর্মপ্রণালী ঠিক হল এইরকম, 'মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবীকার উৎসাহ বৃদ্ধিকরণ এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছিল, তা জনসমাজে প্রবর্তন।' এই উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষ ও বিদেশের মধ্যে আশ্রম স্থাপনের কথা বলা হয়। সভাভঙ্গের পর সকলে চলে গেলে, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান ও শ্রীমায়ের সেবক স্বামী যোগানন্দ সরাসরি স্বামীজিকে বললেন, "তোমার এসব বিদেশি ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরকম ছিল?' তাঁর এ কথায় স্বামীজি বলেন, "তুই কী করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।

.... অনন্ত মত, অনন্ত পথ! সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরি করে যেতে আমার জন্ম হয়নি।"

স্বামী যোগানন্দ। "তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এসব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে

পাচ্ছি। তবু কী জানো, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ যে দেখেছি কিনা; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না তো?"

স্বামীজি। "কী জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরি হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন, তা আমি কী করব—বল?"

অর্থাৎ উপরিউক্ত কথোপকথন থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় বিবেকানন্দের কর্মপদ্ধতি, কর্মপরিচালনা মানুষের মনে 'খটকা' বা সন্দেহের সৃষ্টি করছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য এবং স্বয়ং শ্রীমায়ের সেবক স্বামী যোগানন্দের মনেই যদি 'খটকা' লাগে তবে সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে কা কথা! এই পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দের এমন এক শক্তভূমির প্রয়োজন ছিল যে ভূমি থেকে উচ্চারিত ধ্বনি সব সমালোচনার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবে। শ্রীমাই ছিলেন সেই ভিত্তি ভূমি।

বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত নতুন মঠের প্রসঙ্গে এক বিদগ্ধ সন্ন্যাসী বলেছেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অসাধারণ কাহিনী কারণ পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত এবং পুরুষদের জন্য একটি সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠানের মাথার উপরে রয়েছেন এক নারী। রামকৃষ্ণ আন্দোলন তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণ সক্রিয়তা সত্ত্বেও শ্রীমা ছিলেন মাথার উপরে। এই অধিকার, এই মর্যাদার কোনো সচেষ্ট প্রয়াসে লাভ করেনি। এই প্রতিষ্ঠা ছিল স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর সর্বময়ী কর্তৃত্ব নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনি। প্রতিদিনের সূর্য ওঠা যেমন অনিবার্য, শ্রীমায়ের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াও তেমনই অনিবার্য।"

শ্রীমায়ের এই কর্তৃত্বের রূপটি মধুব ও বিচক্ষণ ছিল এখানে তিনি যেন একজন সুদক্ষ প্রশাসক। শিশু মঠের ক্ষেত্রে নানা আদর্শগত ধর্মাদর্শ ও কর্মাদর্শগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। এই সিদ্ধান্ত শ্রীমা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মঠের শৈশব অবস্থাকে সুদৃঢ় করেছেন।

পাঁচ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গোড়াপত্তন করলেন বিবেকানন্দ। তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত নারী মঠ প্রস্তুত হল না। তবে গৌরী মায়ের মঠ সমান্তরালভাবে তখন গড়ে উঠছে। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন করে বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার মতো এবং ভাবপ্রচারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে দেওয়ার মতো দায়িত্বশীল নারী পেলেন না বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অনুপ্রেরণা, বিবেকানন্দ তাঁর কর্মে পরিণত রূপ। শ্রীমা হলেন অনুপ্রেরণা কিন্তু তাঁর আদর্শকে কর্মে পরিণত করবে কে? মেয়েরা তখন বহু বছরের গৃহবন্দী জীবন ত্যাগ করে সবেমাত্র বাইরে পা রাখছে। ব্রাহ্ম আন্দোলন মেয়েদের মধ্যে স্বাধীনতা এনেছে। শিক্ষা চেতনা প্রসারের চেষ্টাও করেছেন তাঁরা। কিন্তু তবু যেন ভারতীয়দের মূল ধারা থেকে এই আন্দোলন কিছুটা বিচ্ছিন্ন। কিছুটা খ্রিস্টীয় ও বিদেশি আদবকায়দা এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়েছে, বড় বেশি কেতাদুরস্ত এবং এর ভিত্তিভূমি দৃঢ় নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের নারীকে তার সনাতন ধর্মের ও ঐতিহাসিক চেতনা প্রদানের সঙ্গে আবার আধুনিক মনস্ক করে গড়ে তোলার সঙ্ঘবদ্ধ দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করতে সক্ষম নন।

পরিষ্কার করে বলতে গেলে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ যেন নারী জাগরণেরই সমার্থক। রাজা রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণ। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি সংস্কার আন্দোলন তৎকালের সমাজে একটি সংশোধন ও সংস্কারের ভিত্তিভূমি স্থাপন করেছিল। তবু মানুষ বুঝতে পারছিল কেবল সংস্কার নয়, নেতিবাচক সমালোচনা নয়। প্রয়োজন শিক্ষা ও সচেতনতার। নারীকে নারীর মতো করে বেঁচে উঠতে হবে, পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে নয়। তাই প্রয়োজন শিক্ষার। এই শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু কোথায় সেই ভারতীয় নারী? যে সকলকে সঠিকভাবে পথ দেখাতে পারবে? এইসময় ব্রাহ্ম আন্দোলন ও বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বহু আধুনিক চিন্তা ও উন্নত রচনার পরিচয় দিচ্ছেন, বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করতে চাইলেন, কিন্তু ঠাকুরবাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববন্দিত হলেও এক সামান্য পূজকের শিষ্য তো বটে! এ তাঁদের ব্রাহ্ম সংস্কারের সঙ্গে খাপ খায় না। এই প্রেক্ষাপটেই আইরিশ দুহিতা নিবেদিতা ভারতে এলেন। এলেন ভারতবর্ষের নারী জাগরণের কার্যে ব্রতী হয়ে, মূল মাধ্যম হল শিক্ষা।

ভারতীয় মেয়েদের অবস্থা বিবেকানন্দের কালে কেমন ছিল? বিবেকানন্দের কথায় আমরা পাই, 'বর্তমানকালে ইউরোপীয় ধরনে উচ্চ শিক্ষার উপর অধিকতর ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মেয়েরাও এই উচ্চ শিক্ষালাভ করুক—এই দিকেই জনমত প্রবল হইতেছে, অবশ্য ভারতবর্ষে এমন লোকও আছে, যাহারা মেয়েদের উচ্চশিক্ষা চায় না, কিন্তু যাহারা চায় তাহারই জয়লাভ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় আজও ইংলন্ডে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং

আমেরিকার হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মেয়েদের জন্য রুদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ বৎসরেরও অধিক হইল, নারীদের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আমার মনে আছে, যে বৎসর আমি বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সেই বৎসর কয়েকটি ছাত্রী ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য একই মান, একই পাঠ্যসূচি ছিল এবং পরীক্ষায় ছাত্রীরা বেশ ভালোই করিয়াছিল। মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে আমাদের ধর্ম বাধা দেয় না। এইরূপে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, এইভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।'

বিবেকানন্দের সমসাময়িককালে পাশ্চাত্যের কাছে ভারতীয় নারী সমাজের যে নেতিবাচক রূপটি তুলে ধরা হত তাতে তৎকালের ভারতীয় সংস্কারকগণ সকলেই যোগদান করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ তৎকালের নেতিবাচক দিকটিকে দেখেও সমাজের অন্তঃস্থলে বয়ে যাওয়া একটি ভিন্ন চরিত্রকেও দেখিয়েছেন। বিবেকানন্দ বলছেন, 'মার্কিন পর্যটক মার্কটোয়েন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'হিন্দু আচার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যাই বলুক না কেন, আমি ভারতবর্ষের কোথাও দেখিনি যে, লাঙল টানবার বলদের সঙ্গে বা গাড়ি টানবার কুকুরের সঙ্গে স্ত্রীলোক জুতিয়া দেওয়া হয়েছে, ইউরোপের কোনো কোনো দেশে যেমন করা হয়। ভারতবর্ষে কোনো স্ত্রীলোক বা বালিকাকে জমি চাষ করিতে দেখিনি। রেলগাড়ি ধরে দুই পাশে দেখেছি যে রোদে পোড়া পুরুষ ও বালকেরা খালি গায়ে জমি চষিতেছে। কিন্তু একটি স্ত্রীলোকও চোখে পড়েনি। দুই ঘণ্টা রেল ভ্রমণের মধ্যে মাঠে কোনো স্ত্রীলোক বা বালিকাকে কাজ করতে দেখিনি। ভারতবর্ষে নিম্নতম বর্ণের মেয়েরাও কোনো কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ করে না, অন্যান্য জাতির সমপর্যায়ের মেয়েদের তুলনায় তাঁদের জীবন অপেক্ষাকৃত আরামের, হলকর্ষণ তারা কখনোই করে না।' এইভাবে ভারতীয় নারীর সামাজিক সম্মান বোধকে তুলে ধরেছেন বিবেকানন্দ।

ভারতীয় নারীর এই ইতিবাচক দিকটির ছবি বিবেকানন্দ বেশিরভাগই পাশ্চাত্যের বক্তৃতার সময় তুলে ধরেছিলেন। তারজন্য তিনি অনেক সময় সমালোচিত হয়েছিলেন। আদর্শ এবং বাস্তবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বিবেকানন্দ খুব ভালোই জানতেন কারণ তাঁর পারিবারিক জীবনের মধ্যেই নারী অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল। তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁর প্রিয় ভগ্নীর আত্মহত্যার সংবাদে বিচলিত হয়েছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারে মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রতি পারিবারিক অবহেলা সম্বন্ধেও বিবেকানন্দ অবহিত ছিলেন। একটি আলোচনায় বিবেকানন্দ বললেন, "প্রাচীনকালে ভারতীয় ধর্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় নারীরা আধ্যাত্মিক প্রতিভা এবং মানসিক শক্তির জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন।'....আধুনিককালে তাঁদের অবনতি ঘটেছে। খাওয়া-পরা গল্পগুজব এবং অপরের কুৎসা প্রচার ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা তাঁদের নেই।"—বিবেকানন্দ বর্ণিত এই সমাজই ছিল মা সারদার সমকালীন সামাজিক অবস্থা। এই সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিবেকানন্দ আনলেন ভগিনী নিবেদিতাকে।

ভারতের নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে মার্গারেটকে আনলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু তখন ছুৎমার্গের যুগ। নিবেদিতাকে মাছের কাঁটা বেছে দেওয়ার অপরাধে অবেলায় স্নান করতে হয়েছিল এক মহিলাকে সুতরাং এই সামাজিক অবস্থায় কোনো বিদেশি নারী সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাইলেও তাঁকে গ্রহণ করবে কেন? এর উপরে রয়েছে একঘরে

হয়ে যাওয়ার ভয়। এই পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীমায়ের দেখা করিয়ে দিতে চাইলেন। উদ্দেশ্য, শ্রীমা যদি গ্রহণ করেন তবে রক্ষণশীল হিন্দু মহল নিবেদিতাকে গ্রহণ করবে এবং তার ফলে নিবেদিতার পরবর্তী পদক্ষেপ অনেক মসৃণ হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নারী জাগরণে নিবেদিতার সাফল্য তখনই আসবে যখন তিনি ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করবেন। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত দেখলেই হবে না, তাঁর সম্মুখে চাই নারীর আদর্শ রূপটি। তাই নিবেদিতার কাছে শ্রীমায়ের রূপটিকে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অবশেষে ১৮৯৮-এর ১৭ মার্চ এই বিরল ঘটনাটি ঘটল। নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হল শ্রীমায়ের। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই বলেছিলেন নিবেদিতার মধ্যে ছিল 'জগৎ আলোড়নকারী শক্তি'। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য স্বামীজি যথেষ্ট ছিলেন কিন্তু নারী জাগরণের জন্য নারীর ভূমিকাই প্রধান তাই শ্রীমাই পরোক্ষে এই দায়িত্ব তুলে নিলেন। সন্তান তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিটিকে মাতার সম্মুখে এনে উপস্থিত করে, বিবেকানন্দও তাঁর মানসকন্যাকে সমর্পিত করেছিলেন মাতৃক্রোড়ে। নিবেদিতার ধারণায় শ্রীমা হয়ে উঠেছিলেন 'বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।'

১৮৯৮-এর ১৭ মার্চ প্রথম দেখা হয়েছিল নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীমায়ের। নিবেদিতা এই দিনটি প্রসঙ্গে নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন 'Day of days' একটি বিশেষ দিন। নিবেদিতা সহ আরও দু'জন আমেরিকান শিষ্যাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বিবেকানন্দ। মা কি এঁদের গ্রহণ করবেন! এদিকে শ্রীমা প্রশ্ন করছেন নিবেদিতাকে, তোমার নাম কী? উত্তর এল, 'মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল'—মা হেসে বললেন, অত বড় নাম ধরে আমি ডাকতে পারব না; আমি তোমায় খুকি বলে ডাকব। প্রথমদিনই নিবেদিতা হলেন খুকি। মা তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেলেন। তৎকালের বিধবা ব্রাহ্মণী, সমস্ত সংস্কারকে দূরে ফেলে কী করে এই কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন আজকে তা ভাবতে অবাক লাগে।

নিবেদিতার বর্ণনায় শ্রীমা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। ২২ মে ১৮৯৮ তিনি মিসেস হ্যামন্ডকে একটি চিঠিতে লিখছেন, 'অনেকবার ভেবেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা-নাম্নী মহিলাটির বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখব। শুরুতে বলি, তিনি পঞ্চাশ পেরোয়নি এমন হিন্দু বিধবার মতো সাদা কাপড় পরেন। পরার ধরন—কাপড় প্রথমত; কোমরে স্কার্টের আকারে জড়ানো থাকে; তারপরে শরীরের উপর দিয়ে গিয়ে মাথা ঢেকে রাখে অনেকটা nun-এর অবগুণ্ঠনের মতো। পুরুষমানুষ কথা বলতে এলে তাঁকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; তিনি সাদা কাপড়ের ঘোমটা নামিয়ে দেন সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে; সরাসরি কথা বলেন না; বেশি বয়সি কোনো মহিলাকে মৃদুস্বরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কিছু বলে দেন; সেই মহিলাটি তাঁর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন জোরে। এইজন্য মনে হয়, আচার্যদেব কখনো এঁর মুখ দেখেননি। এই সঙ্গে কল্পনায় দেখে নাও, ইনি সব সময়ে মেঝেয় ছোট মাদুরে বসে আছেন।......অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কী স্নিগ্ধ ভালোবাসা এঁর। অথচ বালিকার মতোই হাসি-খুশি।....আমাকে বলেন, আমার খুকি।'

ছয়

'নিখিল বিশ্ব হৃদয়
সাগর মন্থনসুধা মুরতি'

শ্রীমায়ের সঙ্ঘজননী রূপটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এক বিদগ্ধ সন্ন্যাসী বলেছেন, 'জননীর স্নেহ দিয়েছেন বলেই শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘজননী নন। সঙ্ঘকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিয়েছেন বলেই তিনি 'সঙ্ঘজননী'। মা যেমন অবোধ শিশুর হাত ধরে চালান'—শ্রীমাও তেমনি সঙ্ঘকে পরিচালিত করেছেন। কেবল তাই নয় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তাঁরই প্রার্থনার কোলটি থেকে সৃষ্টি। 'মা' তো তিনিই যিনি সৃষ্টি করেন, গঠনই নারীর প্রধান ভূমিকা। বসুন্ধরা তাই আমাদের কাছে মাতৃরূপে বন্দিতা। সৃষ্টির উৎসভূমি তিনিই। ধারণ করেন তাই ধরিত্রী। ঘরে ঘরে রয়েছেন আমাদের গর্ভধারিণী। যাঁরা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বিশ্বজননী তিনিই যিনি বিশ্বের জন্য সন্তানকে উৎসর্গই করেছেন বা সমগ্র বিশ্বকে নিজের সন্তানরূপে জেনেছেন। এক্ষেত্রে সারদা দুই দিক দিয়েই বিশ্বজননী রূপে প্রতিষ্ঠিতা। তাই ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমায়ের সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের বিরোচিত সম্ভ্রম দেখবার মতো। তাঁকে সবসময় তাঁরা মা বলে ডাকেন। তাঁর বিষয়ে উল্লেখের সময়ে বলা হয় মাতা ঠাকুরানি। প্রতি ব্যাপারে তাঁকে স্মরণ করা হয়। সবসময়ে তাঁর দেখাশুনার জন্য দু-একজন নিযুক্ত থাকেন। তাঁর ইচ্ছাকেই চূড়ান্ত আদেশ বলে মনে করা হয়। এ এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক।' (Letters of Sister Nivedita, Vol-1, P-10)।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গোড়াপত্তনের জন্য যে সভা হয়েছিল তাতে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে স্বামীজি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে করো? তিনি শুধু তা নয় ভাই। আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তাঁর রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী। (উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃ. ২০১)।

সুসন্তানের জন্য মায়েরা যেমন ব্রত পালন করে দেবতার দুয়ারে দুয়ারে কৃপাভিক্ষা করেন, তেমনি ভাবেই মা দেবতার কাছে আনত হয়েছেন সঙ্ঘ গঠনের কামনায়। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, 'আহা, এরজন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রম করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট করে আসার কী দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো

অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসার তাপদগ্ধ লোকেরা (স্বামী ঈশানানন্দ মন্তব্য করেছেন, শ্রীশ্রীমা এইসময় সমগ্র জগৎ সংসারের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালেন,—মাতৃসান্নিধ্যে, স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন, ১৩৮০, পৃ ১২০) তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। "তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃ ২১৫-১৬) পরবর্তীকালে স্বামী সারদেশানন্দকে যোগেন মা বলেছিলেন, 'যা কিছু দেখছ (মঠ-আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়! যেখানে যা দেখেছেন—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা করো, দুটি খাবার সংস্থান করো।' মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।" (শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন, কলি, ১৩৮৯, পৃ.২০)।

এখানে শ্রীমায়ের একটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তিনি ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বলছেন, কাশী বৃন্দাবনে অনেক সাধু দেখেছি, যারা গাছতলায় থাকে আর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নেই তবে তোমার আসবার দরকার কী ছিল?—ভারতবর্ষ ঈশ্বরপ্রাণতার দেশ। বহু সাধকের সমাবেশ হয়েছে, বহু মানুষ গৈরিক পরিধান করেছেন। কাশী ও বৃন্দাবন কেবল হিন্দু তীর্থ নয়—এ যেন সন্ন্যাসীদের শহর। এ শহরের সর্বত্র সন্ন্যাসীর সমাবেশ। কিন্তু এঁদের মধ্যে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ প্রেরণা নেই, উদ্দেশ্য নেই। নেই সমাজের প্রতি কোনোরকম দায়বদ্ধতা। এঁরা ব্যষ্টিমুক্তির চিন্তায় বিভোর। জগতের বাইরের ঈশ্বরীয় সত্তার অন্বেষণ প্রয়াসী। যে সমাজ তাঁদের ভরণপোষণ করে সেই সমাজের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা রয়েছে—এ সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হন। কিন্তু শ্রীমা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন এরকম সন্ন্যাসী সৃষ্টি করতে নয়। তাঁর আগমনের পৃথক উদ্দেশ্য রয়েছে। সাধু সমাজের আধুনিকীকরণের জন্য তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে। তিনি ভারতীয় কাঠামোয় নতুনভাবে সাজাতে চেয়েছেন সাধু সমাজকে। যা শ্রীমায়ের ভাষায় স্পষ্ট হয়েছে 'সংসারতাপদগ্ধ' লোকেরা এসে শান্তি লাভ করবে। অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেবার কাজের কথা প্রচ্ছন্ন রয়েছে শ্রীমায়ের কথায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র শ্রীমায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখি তা হল—সন্ন্যাসীদের অন্ন বস্ত্রের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ানো ও অহেতুক কৃচ্ছ্রতা শ্রীমায়ের পছন্দের ছিল না। তিনি পেট বৈরাগী, উদ্দেশ্যহীন সন্ন্যাসী সমাজকে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী বলে মনে করেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সেবামূলক কাজের প্রবর্তন ও সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাস জীবনের কথা শ্রীমা বহু আগেই বলেছেন। এবং কেবল বলেননি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার জন্য প্রার্থনাও করেছেন।

১৮৯০-তে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজি বলেছিলেন, 'আমার উপর তাঁর নির্দেশ এই যে, তাঁর দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগী মণ্ডলীর দাসত্ব আমি করব, এতে যা হবার হবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যা আসুক, আমি তা নিতে রাজি আছি। তাঁর আদেশ এই যে, তাঁর ত্যাগী

সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তার জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, ১৩৮৩, পৃ. ৩২৮)। অর্থাৎ ত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্য সঙ্ঘ গঠন স্বামী বিবেকানন্দের দায়িত্ব ছিল। তিনি এরই সঙ্গে 'মায়ের মঠ' বা মেয়েদের জন্য মঠের কথাও বারংবার বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে মেয়েদের জন্য মঠ প্রথমে গঠিত হয়নি। কেন স্বামীজি 'প্রথমে মায়ের মঠ'—এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করলেন না, কোনো কোনো সন্ন্যাসীর মতে শ্রীমাই হয়তো তাঁকে এই কার্য থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। অনেকের মতে নারী মঠ গঠনে উৎসাহী বিবেকানন্দকে মায়ের শরীর থাকতে মায়ের নামে কিছু করতে নিষেধ করেছিলেন গুরুভাইরা । এতে মায়ের দ্রুত দেহত্যাগের সম্ভাবনা ছিল। আমাদের মনে হয়, বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন সংগঠিত নারী মঠ গঠনের যোগ্য তখনো নারীরা হয়নি। শ্রীমাকে কেন্দ্র করে যেসব নারীরা বাস করতেন তাঁদের সাধিকা জীবন প্রশ্নাতীত থাকতেও কোনো আন্দোলনকে পরিচালিত করার উপযুক্ত হয়তো ছিল না। তাই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল একমুখে। রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যুবক ভক্তদের সন্ন্যাস জীবন ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকাকে কেবল যুবকবৃন্দের পরিবারের লোকেরা অপছন্দের চোখে দেখেছিলেন তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তগণও এই ব্যবস্থার সপক্ষে ছিলেন না। অবশ্য সকলে নয়, শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যুবকদের নিয়ে ভাবী আন্দোলন সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন। তবু অধিকাংশেরই বক্তব্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অসাধারণ জীবন দেখিয়ে গিয়েছেন, তাঁর সাধন পদ্ধতি ও ভাবসমূহ নিজ জীবনে পালন ও সাধনভজন করাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য— দলবাঁধা নয়। কতগুলি 'কলেজবয়' একটি আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং সেই আন্দোলন বিশ্ব পরিচিতি লাভ করবে—এ ভাবনা অধিকাংশের কাছেই অসম্ভব ছিল। নরেন্দ্রনাথের পরীক্ষা ছিল দ্বিমুখী—একদিকে পরিবারের কষ্ট। পিতার মৃত্যুর পর অভাব অনটন বড়পুত্র নরেন্দ্রনাথের কাছে বেদনাদায়ক, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া বিরাট-দায়িত্ব। যে দায়িত্বের কাছে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ—সে দায়িত্ব পালনে পারিপার্শ্বিক বাধা। সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি যেন তখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করছিলাম।... অথচ এমন কেউ ছিল না, যে একটু সহানুভূতি জানাবে আমাকে। শুধু একজন ছাড়া। সেই একজনেরই আশীর্বাদ আমরা পেয়েছিলাম। আর তাঁর সহানুভূতিই আমাদের মনে আশা জাগিয়েছিল। তিনি একজন নারী।...একমাত্র তিনিই আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। যদিও তিনি নিজে ছিলেন অসহায়, আমাদের চেয়েও দরিদ্র।" (The Complete works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, Advaita Ashrama, Calcutta, 3rd ed. 1959. PP 81-2).

বিবেকানন্দের কথিত নারী হলেন শ্রীমা—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরই সেই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে শ্রীমাই তাঁর সন্তানদের পথ দেখিয়েছেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, যে বিরাট আন্দোলনের সূচনা হতে যাচ্ছে, সেই বিরাট আন্দোলন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের ধারায় এক নতুন পদক্ষেপ। এর মৌলিকতা যেমন রয়েছে তেমনই মূলটি রয়েছে সনাতন ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে। এই নব আন্দোলন সম্বন্ধে সারদা সচেতন। হয়তো তিনি তাঁর প্রিয় স্বামীর কাছে পেয়েছেন এই ধারণা কিন্তু ধারণ করেছেন

কীভাবে? পরিচালিত করার শক্তি পেলেন কোথায়? ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাবধারাকে জয়রামবাটীর বালিকা বধূটি আয়ত্তে আনলেন কীভাবে? বইপত্র নিয়ে তাঁকে স্কুল কলেজে যেতে হয়নি, দর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলি পড়ে নেওয়া হয়নি, এমনকী 'মা আমায় দেখা দে বলে' ব্যাকুলতার ঝংকারে মুখরিত করেননি তাঁর সাধনজীবন। নীরবে নিভৃতে স্বামী ও ভক্তসেবার মাধ্যমে এক অনন্য মূর্তি, অপরূপ মাধুর্য কোন স্বর্গ থেকে নিয়ে এলেন? নাকি তিনি নিজেই ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণা। ভাগীরথীর উৎসমুখ চিরকালই ছিল উৎসারিত, প্রতীক্ষা ছিল সঠিক সময়ের। শতদলে বিকশিতা বিচিত্র এই নারী। তিনি শুধু কি সাধিকা? —না। তিনি শুধু কি—জননী? —না। তিনি শুধু কি গৃহবধূ? —না। তিনি শুধু কি সন্ন্যাসিনী? —না— তিনি কোনো উপাধির সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নন— তিনি অসীমের স্পর্শলাভে অসীম মমতাময়ী, করুণাময়ী, দয়াময়ী— আবার বিচক্ষণতায়, বিচারকের ভূমিকায়, তত্ত্বজ্ঞের আসনে সমানভাবে নিপুণা। তিনি আমাদের মা—রক্ষয়িত্রী, পালয়িত্রী।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর ছেলেরা যখন কিছুটা বিভ্রান্ত তখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গৃহীসন্তান সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে স্বপ্নে বললেন, 'আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।' সুরেন্দ্রনাথ গিয়ে নরেন্দ্রনাথকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন এবং জানালেন, 'ভাই, তোমরা একটা বাড়ি দেখো যেখানে তোমরা ত্যাগীরা একত্র থাকতে পারবে, আর আমরা গৃহীরা মাঝে মাঝে যেয়ে তোমাদের সঙ্গলাভ করে তৃপ্ত হয়ে আসতে পারব।' এরপরই বরাহনগরে মঠের সূত্রপাত হল।

নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক ভক্ত ভবনাথের চেষ্টায় বরাহনগরের গঙ্গাতীরে ভুবন দত্তের 'পোড়ো বাড়ি' ভাড়া নেওয়া হল। লোকে বলত ভূতের বাড়ি। বাড়ি ভাড়া ও ট্যাক্সের জন্য মাসে এগারো টাকা দিতে হত। সমস্ত খরচ বহন করতেন সুরেন্দ্র মিত্র। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাই লিখেছেন, 'ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারই হাতের গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চন—ত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। ....ভাই, তোমার গুণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ি ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে, আসিয়া ভাইদের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।' চরম কৃচ্ছ্রতা আর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের। শৈশব অবস্থায় এই মঠের বহির্বাস ছিল একটি, সকলে কৌপীন পরে থাকতেন। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে একজন সেই বহির্বাস পরিধান করে বাইরে আসতেন। আহার ছিল তেলাকুচো পাতার ঝোল! বিছানার মধ্যে মাদুর ও একটা করে ছোট বালিশ। স্বামী বিরজানন্দ তাঁর অতীতের স্মৃতি গ্রন্থে বরাহনগর মঠ সম্বন্ধে বলেছেন, 'বাগানে শাক সবজি বড় বিশেষ কিছু হত না—ডেঙো ডাঁটা, দু-চারটা কুমড়ো, শশা, কলা ইত্যাদি। এক উড়ে মালী ছিল, তাকে কেলো বলে ডাকত। তরকারি কিছু না থাকলে শশী মহারাজ মাঝে মাঝে বাগানে ঢুকে ডেঙো, কুমড়ো শাক, সজনে ডাঁটা বা পাতা ফুল যা পেতেন নিমেষের মধ্যে ছিঁড়ে বা বঁটি দিয়ে কেটে আনতেন। আর কেলো মালী উড়ে ভাষায়, 'আরে, আবে কী করো, কী করো, ওসব খা দিল, নিয়ো না, নিয়ো না' বলে পিছু পিছু তাড়া করত।

...কিন্তু শশী মহারাজ কিছুই ভ্রূক্ষেপ করতেন না, গোঁ-ভরে আপনার মনে চলে আসতেন। এই নিয়ে সকলে মিলে খুব হাসি ফূর্তি হত। যা হোক, মঠের সকলের সঙ্গে কেলো মালীর বেশ প্রীতির ভাব ছিল; যখন সুবিধা হত তাকে প্রসাদ-মিষ্টান্নাদি দেওয়া হত।" ওই পোড়ো বাড়িতে ত্যাগ তপস্যার ঢেউ উঠত তার সঙ্গে চলত শাস্ত্র আলোচনা আর এইসব কার্যের মধ্যমণি ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থে বলা হয়েছে 'সুন্দর সুগঠিত তাঁহার সমুন্নত ও সবল শরীর, উজ্জ্বল তাঁহার দেহকান্তি, প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার চিহ্ন, প্রশান্ত বদনে বীরত্ব ও দৃঢ়সংকল্প অঙ্কিত, আয়ত নয়নদ্বয়ে অপূর্ব মোহিনী শক্তি, চলন-বলনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস পরিস্ফুট, অথচ বেশভূষায় বৈরাগ্যের সুস্পষ্ট ছাপ এবং আচার-ব্যবহারে অকপটতা, সৌহার্দ্য ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা চিরপ্রকটিত; চিন্তায় তাঁহার অদ্ভুত সাহস, গাম্ভীর্য ও ভূয়োদর্শনের সমাবেশ, কার্যে মহাবীরসদৃশ ক্লান্তিহীনতা ও গুরুভক্তি। সমস্ত মিলিয়া এই নবীন যুবককে স্বতই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নেতা বলিয়া মনে হইত এবং কেহ না বলিয়া দিলেও তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হইত না। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে, নরেন্দ্রের প্রতি অগাধ ভালোবাসার ফলে এবং নরেন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যুবক ভক্তগণ তাঁহাকে নির্বিচারে ও অবিসংবাদিতরূপে অগ্রাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।' শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, 'আমাদের সকলেরই মনে ছিল, মহাসমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই ছেলেদের একত্রে রাখিয়া দেখাশোনা করিস।" আমরা ঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিতভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা, সুখ-সান্ত্বনার স্থল।' (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, পৃ ১৭৫)। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সকলের আশ্রয়স্থল আর নরেন্দ্রনাথের আশ্রয়স্থল ছিলেন শ্রীমা সারদা। সঙ্ঘ গঠন ও পরিচালনায় সহায় ছিলেন আমাদের মা সারদা।

সাত

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভারবহনের জন্য ষোলোজন সন্ন্যাসী পার্ষদকে রেখে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ অন্যতম। এই ষোলোজন পার্ষদের মধ্যে যে চারজন (স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ) সন্ন্যাসী শ্রীমায়ের সেবকরূপে নিয়োজিত হয়েছিলেন এই অংশে যাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা করব তিনি হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। শ্রীমায়ের চারজন সেবকের একজন তিনি নন, কিন্তু শ্রীমায়ের জীবনে তাঁর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কারণ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে তখন সাধনার বেগ মন্দীভূত হয়ে শুরু হয়েছে ভাবপ্রচারের ক্ষণ। একে একে দক্ষিণেশ্বরের কুঠুরিতে যোগ দিয়েছেন যুবক ভক্তরা। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভবতারিণীর কাছে আবদার করলেন, 'মা একজনকে সঙ্গী করে দাও—আমার মতো। .....মা, আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও।' এর কিছুদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাবচক্ষে দেখলেন সুদর্শন এক বালক পঞ্চবটীর তলায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবেন শ্রীরামকৃষ্ণ, এই বালকটি কে? কী জন্য এখানে তার আগমন! কিন্তু সদুত্তর পান না। নানা জনকে প্রশ্ন করেও এ দর্শনের কোনো অর্থ খুঁজে পান না শ্রীরামকৃষ্ণ, এইরকম মানসিক অবস্থায় কয়েকদিন থাকার পর হঠাৎ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা মনোরম একটি শিশুকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, 'এইটি তোমার পুত্র।' ত্যাগীর আবার পুত্র? শিউরে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জগন্মাতা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন সংসার সম্বন্ধে পুত্র নয়, ত্যাগী শুদ্ধ মানসপুত্র।

ভাবচক্ষে দর্শনের পর মানসপুত্রের অপেক্ষায় রইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন দুপুরে অন্যমনস্কভাবে বসে আছেন গঙ্গার তীরে। হঠাৎ দেখলেন, গঙ্গাবক্ষে এক অপূর্ব পদ্ম শোভা পাচ্ছে। আর সেই প্রস্ফুটিত কমলের উপর দুটি অপূর্ব বালক খেলা করছে, একজন ব্রজের কৃষ্ণ অপর জন রাখাল। সেই দিব্যদৃশ্য দেখে বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মানসপুত্রের জন্য তাঁর অপেক্ষা শেষ হয়ে এসেছে। ব্রজে কৃষ্ণের সখারূপে যে রাখাল বৃন্দাবনে এসেছিলেন সেই রাখালই আবার তাঁর কাছে উপস্থিত হবেন নতুনভাবে যুগধর্ম প্রবর্তনের প্রেরণায়। সত্যিই অপেক্ষার অবসান হল, ভাবচক্ষে এই দর্শনের কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত কোন্নগর থেকে গঙ্গাপার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর এক আত্মীয় যুবক। আত্মীয় যুবকটিকে দেখে বিহ্বল হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। —নাম কী তোমার?—রাখাল। স্মিত হাসেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এ তো সেই মুখ। মুখে বলেন 'এ সুন্দর আধার', আর মনে বলেন, 'সেই নাম। রাখাল—ব্রজের রাখাল।'

বাড়িতে ফিরে গেলেন রাখাল। কিন্তু তাঁর মনে অঙ্কিত রইল দক্ষিণেশ্বরের সেই প্রেমঘন মানুষটির মূর্তি। বারেবারে মনে পড়ে, এক অজানা আকর্ষণ বোধ করেন তিনি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি না ফিরে সোজা উপস্থিত হন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে ওঠেন, 'তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন?' নিরুত্তর থাকেন রাখাল। এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন তিনি। এই অর্ধপরিচিত মানুষটি এত আপন হয়ে উঠলেন কী করে! শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে নিয়ে চললেন নহবতের উদ্দেশে। সেখানে থাকেন শ্রীমা সারদাদেবী। এখানে নিয়ে গিয়ে কী করেছিলেন তিনি? শ্রীমা পরবর্তীকালে তা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "নহবতে তিনি রাখালকে নিয়ে এলেন। বললেন, এই নাও তোমার ছেলে।' রাখাল আমায় প্রণাম করল। আমি রাখালের মাথায় হাত দিয়ে ও চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেয়ে বললাম,—'ওঁকে প্রণাম করো বাবা। রাখাল ওঁকেও প্রণাম করলে। ঘরে যা মিষ্টি ছিল রাখালকে খেতে দিলাম। আমরা যেন রাখালের চিরপরিচিত, এইভাবে সে প্রথমদিন হতেই আমায় মা বলে ডাকত। কী সরল মিষ্ট স্বভাব ছিল রাখালের।" কয়েক মাসের মধ্যেই রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, এই সময় নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীমান লাটুর একটি কথোপকথনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্ররূপে রাখালের পরিচিতি ধীরে ধীরে ভক্তমণ্ডলীতে পরিব্যপ্ত হচ্ছে। এই কথোপকথনটি হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির পরদিন সকালে, স্থান নরেন্দ্রনাথের সিমলার কক্ষ।

"নরেন—হ্যাঁরে! ওখানে (দক্ষিণেশ্বর) কী রাখাল যায়?

লাটু—যায়। এমনকী দু-এক রাত সেখানে থেকেও যায়। তাকে উনি বড় পেয়ার করেন। নিজের কাছে বসিয়ে কত খাওয়ান, তার সঙ্গে কত ফষ্টিনষ্টি করেন। সেদিন তিনি ওনাকে মা'র কাছে নিয়ে গেলেন—বললেন,—'এই নাও গো, তোমার ছেলে এসেছে।' মা'র কত আনন্দ হল! হামাদের উনি কত সন্দেশ খাওয়ালেন।

নরেন—রাখালকে তাঁর ছেলে বললেন?

লাটু—সার বলছি, তাই শুনেছি।"

ব্রজের রাখাল আবার কৃষ্ণপ্রেমে ধরা পড়লেন। এবার শুধু সখারূপে নয়, পুত্ররূপে। বড় আপনার সম্পর্ক। রাখালচন্দ্র যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে উপস্থিত হন তখন তিনি খুব ছোট বালক নন। সদ্য বিবাহিত যুবক, স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর ভ্রাতা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্র। পিতা আনন্দমোহন ঘোষ বসিরহাটের শিকরাকুলীন গ্রামের জমিদার। মাতৃহীন বালক রাখাল ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সংসার উদাসী মন দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পিতা—এ সময় পুত্রকে বিবাহ দেওয়া দরকার। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালচন্দ্রের বিবাহ হল। তখন তাঁর বয়স আঠারো, বালিকা বধূর বয়স এগারো। যে বাঁধনে পিতা উদাসীন পুত্রকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন সেই বন্ধনই তাঁর বন্ধন মুক্তির কারণ ঘটাল। বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভের জন্য ভক্ত মনোমোহন ভগিনীপতি রাখালচন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন। পিতা পুত্রের সংযোগ ঘটল। খুলে গেল আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের দরজা। পত্নী বিশ্বেশ্বরী শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুগত, অত্যন্ত শুদ্ধাত্মা। সুতরাং কোনো বাধা রইল না রাখালচন্দ্রের।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যখন রাখাল গিয়েছেন তখন তিনি উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক। তবু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে এক অদ্ভুত বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয় রাখালচন্দ্রের মন। তাঁর সেই সময়কার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিনি চারি বৎসরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসংকোচে স্তন্যপান করিত। বাড়ি তো দূরের কথা এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না।........

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কীরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ওইরূপ দেখিত, সেই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি।—তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সংকোচের ভাব আসিত না।

সমস্ত ভক্তদের থেকে রাখালচন্দ্রের একটি পৃথক অস্তিত্ব চোখে পড়ত। অন্যান্য ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে বা বারান্দায় শুতেন, রাখালচন্দ্র একটি ক্যাম্পখাটে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেই শয়ন করতেন। অন্যেরা মেঝেতে মাদুর পেতে বসতেন, রাখাল বসতেন ঠাকুরের কোল ঘেঁষে। রাখালের জন্য তাঁর পছন্দের মিছরি মাখন ও খিচুড়ির ব্যবস্থা হত। একদিন পিপাসার্ত শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালচন্দ্রকে কুঁজো থেকে জল ঢেলে একটি পাত্রে দিতে বললেন, ঘুমের আবেশে তন্দ্রাতুর রাখাল পাশ ফিরে শুয়ে জানালেন কাজটি তিনি করতে পারবেন না। বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত হয়ে বললেন, 'এখন বুঝেছি রাখাল আমাকে ঠিক ঠিক বাপ বলে জানে।' রাখালচন্দ্রের জন্য এই বিশেষ বন্দোবস্ত কেন?—জনৈক ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেন, 'রাখাল যে ছেলে।' অন্যত্র বলেছেন, 'রাখাল, শরৎ-টরৎ, এরা সব আপনার (আমার) শরীর থেকে বেরিয়েছে।'

রাখালচন্দ্রের জীবনের মধ্যে বালকভাব ছিল প্রধান তাই জীবনীকার বলেছেন, "সহজ স্বাভাবিক অবস্থাতেও রাখালের প্রত্যেক আচরণের মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক বালকত্বই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং তাঁহার সকল আচরণের মধ্যে 'চিরকিশোর' রাখালরাজের বালকভাবটি উঁকি ঝুঁকি দিত। পুঁথিকারের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথি লিখনে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, এখন রাখাল যিনি পূর্বেও রাখাল। ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে। রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মরে।" এই সহজ বালকভাবটি ব্রহ্মানন্দ-চরিত্রে লক্ষ করিয়া শ্রীমা পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন, 'দেখছ না, রাখালের কেমন বালকভাব এখনো যেন ছোট ছেলেটি।'

দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলিতে মাতাপিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক ক্রমেই ঘনীভূত হল। রাখালরাজের বালকভাবকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যেও মাঝে মাঝে বিস্ময়ের সৃষ্টি হত। অধর সেনের শোভাবাজারের বাড়িতে চণ্ডীর গানের আসর বসে, সেখানে সকলে নিমন্ত্রিত হলেও রামচন্দ্র দত্ত সংবাদই পেলেন না। তাঁকে জানাবার দায়িত্ব ছিল রাখালের উপর। তিনি এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'রাখালের দোষ ধরতে নেই, গলা টিপলে দুধ বেরোয়।'

রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যুবক ভক্ত লাটুর কাছে অনেক ব্যাপারই হেঁয়ালি মনে হত। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের 'রাখাল ও লেটো'কে নিয়ে গড়ে উঠত মজার ঘটনা।' ১৮৮২ সাল। লাটু ও রাখাল দুজনেই তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। একদিন দুপুরের খাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে পান সেজে আনতে বললেন। রাখাল উত্তর দিলেন 'পান সাজতে তো জানি না।' রাখালের কথা শুনে ঠাকুর বললেন 'সে কী রে! পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কী? পান সাজা আবার শিখতে হয় নাকি রে! যা, পান সেজে নিয়ে আয়।' শ্রীরামকৃষ্ণের কথার পরও রাখাল পান সাজতে অগ্রসর হচ্ছেন না দেখে লাটু মনে মনে ভারী বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বারংবার শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ অবহেলা করতে দেখে যুবক লাটুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি বললেন, 'ওকী কথা? রাখালবাবু? ওনার সামনে এমোনভাবে বলতে আছে কি? আপনি ওনার আদেশ শুনছেন না, আবার তাঁর উপর কথা বলছেন—এ আপনার কেমন ব্যাভার?' লাটুর কথাতে রাখাল উত্তর দিলেন, 'তোর গরজ থাকে তুই সেজে নিয়ে আয় না। আমি পারব না, জীবনে ওকাজ কোনো দিন করিনি, আজ ওনার আদেশে আমি পান সাজি আর কী!' এবার লাটু সত্যিই ভয়ানক চটলেন আধা হিন্দি আধা বাংলায় অনেক কথা বলতে লাগলেন। এই অবস্থা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব আমোদ পেলেন, তিনি রামলালকে ডেকে বললেন, 'ও রামনেলো! রাখাল-লেটোর যুদ্ধ দেখবি আয় রে।' তারপরেই ব্যঙ্গচ্ছলে বললেন, 'বল তো কে বেশি ভক্ত—রাখাল না লেটো?' রামলাল বললেন 'মনে হয় রাখালই বেশি ভক্ত।' রামলালের কথা শুনে লাটু সক্রোধে বলতে লাগলেন, 'হাঁ, উনার কথা শুনলেন না, উনি হলেন ভারী ভক্ত।' হাসতে হাসতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ঠিক বলেছিস রামনেলো! রাখালেরই ভক্তি বেশি। দেখ দিকিনি! রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর ঐ দেখ কেমন রেগে গেছে! যার ভক্তি বেশি সে কি এর সামনে রাগ দেখাতে পারে? ক্রোধ তো চণ্ডাল! ক্রোধে ভক্তি শ্রদ্ধা সব উবে যায়।' শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বুঝলেন লাটু, এ পিতা পুত্রের এক দিব্যখেলা। এর মধ্যে অনুপ্রবেশ ঠিক নয়, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনিই পান সেজে আনলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে রাখালচন্দ্রই সর্বপ্রথমে তাঁর কাছে আসেন। তিনি দিনরাত ঠাকুরের কাছেই ঘোরা ফেরা করতেন। কখনো পদসেবা করতেন, কখনো স্নানের সময় তেল মাখিয়ে দিতেন, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখতেন। কিন্তু তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সদাসর্বদা থাকা, বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবস্থায় তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। এইভাবে ধীরে ধীরে আনন্দ, হাসি গানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালচন্দ্রকে গড়ে তুলেছিলেন রাখালরাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—গুরুর পুত্র গুরু সমান। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেও নিজে তাঁর প্রেসিডেন্ট হননি। গুরু ভাববহনের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন গুরুপুত্রের হাতে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজির আদরের 'রাজা'। তাই তিনি সঙ্ঘমধ্যে রাজা মহারাজা নামে খ্যাত।

আট

নারী ও শ্রীশ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়েছিল তার বীজ নিহিত ছিল দক্ষিণেশ্বরের লীলাকাহিনীর মধ্যে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে চিঠি পত্রাদিতে বারংবার একটি নারীমঠ গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই নারীমঠের সূত্রপাত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদদের কথা আমরা বলছিলাম, এই ত্যাগী যুবকেরা যেসব পরিবার থেকে আসতেন সেই পরিবারের সঙ্গে ধর্মপ্রাণতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। যেমন শশীমহারাজ, পরবর্তীকালের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মা ছিলেন ভবসুন্দরী দেবী। ভবসুন্দরী দেবী ছিলেন অত্যন্ত সরল সাদাসিদে, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। লজ্জাশীলা এই মহিলা তাঁর পরম আত্মীয়ের সামনে, এমনকী বড় পুত্র রামকৃষ্ণানন্দের সামনেও কখনো ঘোমটা খুলতেন না। বাড়িতে শীতলা, মনসা, সিংহবাহিনীর পূজা হত। তা ছাড়া প্রতি বছর কালীপূজাও ঘটা করে পালিত হত। একবার তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একটি কন্যার দুরারোগ্য রক্ত আমাশা হয়। রোগের তীব্রতা ভীষণ আকার ধারণ করলে তিনি দেবীর কাছে নিজের ডান হাতটি বাঁধা রেখেছিলেন। এরপরে সন্তান সুস্থ হয়ে গেলে তিনি চিরজীবন বাঁ হাতে কাজ করতেন, ডান হাতটি ব্যবহার করতেন না।

আবার মনোমোহন মিত্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের মধ্যে একজন। মনোমোহন মিত্রের মা শ্যামাসুন্দরী দেবী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা। নিত্যপূজার জন্য তাঁর বহু সময় ব্যয় হত। একান্নবর্তী পরিবারে তাঁর এই দীর্ঘসময় পূজার ঘরে কাটানো—সকলে ভালোভাবে গ্রহণ করতেন না। মেয়েদের মধ্যে এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল। সকলের মধ্যে একটি ধারণার সৃষ্টি হল, মনোমোহনের মাতা সাংসারিক কাজকর্মে ফাঁকি দেওয়ার জন্যই ঠাকুর ঘরে সময় কাটিয়ে দেন। এ একটা অছিলা ভিন্ন কিছুই নয়। বহু আলোচনার পর সকলে মিলে ঠিক করলেন তাঁর আসল রূপটি প্রকাশ করে দিতে হবে। তাই একদিন ধ্যানমগ্ন শ্যামাসুন্দরীর গায়ে একটি অতি বিষাক্ত বিছে ছেড়ে দিলেন। ভাবলেন বিছের ভয়ে নিশ্চয়ই আসন ছেড়ে উঠে পড়বেন শ্যামাসুন্দরী। কিন্তু না, বিছেটি শ্যামাসুন্দরীর দেহের মধ্যে ছেড়ে দিলেও তাঁর মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তিনি যেমন ঈশ্বর ভাবনায় মগ্ন ছিলেন তেমনই স্থির অচঞ্চল রইলেন। বিছেটিও তাঁর দেহের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে না পেয়ে ধীরে ধীরে কোনো ক্ষতি না করেই নেমে এল। আত্মীয়রা বুঝলেন তাঁদের সন্দেহ মিথ্যা। তিনি সত্য সত্যই ঈশ্বর-সাধনায় মগ্ন থাকেন। চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শ্যামাসুন্দরী দেবী সংসারের মধ্যে ঈশ্বর-সাধনার সুযোগ পেলেন।

কেবল একটি ঘটনাতেই মানুষের ধর্মজীবনের প্রগাঢ়তা প্রমাণিত হয় না, জীবনের প্রতি পলে পলে তা পরীক্ষিত হতে থাকে। শ্যামাসুন্দবী দেবীর জীবনও তদনুরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের

একান্ত অনুরাগী এই নারীর জীবনে পরীক্ষার মুহূর্ত এসেছে শতবার। প্রতিবারই তিনি তা অতিক্রম করেছেন অতি সহজে, সাবলীল ভাবনায়। এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলে মন্দ হবে না।

মনোমোহনের বাড়ি ছিল কোন্নগরে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপর ভক্ত রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হতেন। একদিন জেষ্ঠা কন্যা মানিকপ্রভার প্রায় অন্তিম সময় উপস্থিত হল। কন্যার মৃত্যু আসন্ন জেনে মনোমোহন সেদিন আর দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না। শ্যামাসুন্দরী দেবী দেখলেন, পুত্র, কন্যার মৃত্যুর আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে রয়েছেন। তিনি পুত্রের কাছে গিয়ে বললেন, 'আজকে তুমি দক্ষিণেশ্বরে গেলে না কেন বাবা। আজই তো পরীক্ষা দেওয়ার সময়। ঈশ্বরের উপর কতখানি বিশ্বাস ভক্তি ও নির্ভরতা তুমি অর্জন করেছ আজ তারই পরীক্ষা। তুমি যাও বাবা। যতক্ষণ না তুমি ফিরে আসছ ততক্ষণ মানিকপ্রভার কিছু হবে না।' মায়ের ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাসভরা কথা শুনে অনুপ্রাণিত হলেন মনোমোহন। তিনি কন্যাকে ওই অবস্থাতে রেখেই চললেন দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে। এবার পথরোধ করে দাঁড়ালেন স্ত্রী, তিনি বললেন, 'মেয়েকে এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া কি সংগত!' কিন্তু স্ত্রীর কথায় টললেন না মনোমোহন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পথে নামলেন। শ্যামাসুন্দরী তখন পুত্রকে ডেকে বললেন, 'বাবা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে মানিকপ্রভার কথা বলবে আর তার আরোগ্যের জন্য দক্ষিণেশ্বরের কিছু মাটি নিয়ে আসবে।' মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে মনোমোহন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে সেদিন ভক্তদের হাট বসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বৈরাগ্য বিষয়ক আলোচনা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে জগতের অনিত্যতা ও বৈরাগ্যের কথা শুনে কন্যার অসুস্থতার কথা উচ্চারণও করতে পারলেন না মনোমোহন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ ঝাউতলায় যাওয়ার পথে মনোমোহনকে সঙ্গে নিলেন এবং যাওয়ার পথে নিজের সাধনার স্থানটি দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়ে শৌচে চলে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চবটীর সাধনস্থানটিতে দাঁড়িয়ে মনোমোহন। তবুও সেখানকার মাটি নিতে পারলেন না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের এ পরীক্ষা নয় তো! এত বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদানের পর কী করে তিনি সন্তানের মঙ্গলকামনায় পঞ্চবটীর মাটি সংগ্রহ করবেন। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকেন মনোমোহন। ঝাউতলার দিক থেকে ফিরবার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, দাঁড়িয়ে রয়েছেন মনোমোহন। মৃদু হেসে তাঁর হাতে পঞ্চবটীর ধুলো এবং একটি ফুল তুলে দিলেন বললেন, 'নিয়ে যাও এটা।' মনোমোহন বিস্মিত, তিনি তো শ্রীরামকৃষ্ণকে কোনো কথাই বলেননি। হঠাৎই তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদপূত ফুল ও মাটি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন মেয়ের শরীর তখন ভালো নয়। মায়ের হাতে সেই ফুল মাটি দিয়ে বললেন, 'মা আমায় আর কখনো এমন পরীক্ষায় ফেলো না।' শ্যামাসুন্দরীর কিন্তু কোনো দ্বিধা নেই। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদপূত ফুল ছুঁয়ে দিলেন মেয়ের মাথায়। ধীরে ধীরে মানিকপ্রভা সুস্থ হয়ে উঠলেন। প্রাণরক্ষা হলেও হাঁটতে পারে না মানিকপ্রভা। মনোমোহন কোনোদিনই একথা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাননি। বেশ কয়েকমাস পরে হঠাৎই শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহনকে বললেন, 'আচ্ছা তোমার সেই মেয়েটি কেমন আছে?' মনোমোহন উত্তর দিলেন প্রাণে রক্ষা পেলেও সে চলাফেরা করতে এখনো অক্ষম। 'তাই

নাকি' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িতে ফিরে এলেন মনোমোহন। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সেদিন থেকেই একটু একটু হাঁটতে পারছেন। কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন মানিকপ্রভা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপর গৃহীভক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কলকাতার আহিরীটোলায় মামার বাড়িতে থাকতেন। তৎকালীন কৌলীন্য প্রথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন উপেন মজুমদার। পিতৃগৃহ ছিল হুগলি জেলার বলাগড়ে। কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান হওয়ার ফলে মায়ের ঘরে মামার বাড়িতেই মানুষ হতে হত উপেন মুখোপাধ্যায়কে। মামিমা নিঃসন্তান হওয়ায় উপেনের মামার সংসারে ভালোবাসার অভাব ঘটেনি। উপেন্দ্রনাথ যদুপণ্ডিতের স্কুলে 'কথামালা' পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেন। পড়াশুনা ছেড়ে মামার বকুনি খেয়ে একটি ওষুধের দোকানে শিশি ধোয়ার কাজ পেলেন। কিন্তু সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর ডাক্তারের চরিত্র ভালো নয় বুঝতে পেরে তিনি সেই চাকরি ছেড়ে বটতলার বৃন্দাবন বসাকের বই-এর দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কাজ করতে লাগলেন। স্বভাব ভাবুক উপেন্দ্রনাথের বাড়ির কাছেই বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক ভক্ত অধরলাল সেন। এঁর মাধ্যমেই উপেনবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হন। পরিচিত হওয়ার পর ঘনঘন দক্ষিণেশ্বরে যেতে লাগলেন উপেনবাবু। মামার চক্ষে তা মোটেই ভালো ঠেকল না। ছেলেটি কেবল নিজে যায় না, পাড়ার ছেলেদেরও দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যায়। যে ছেলেদের দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যায় তাদের অভিভাবকগণ উপেনের মামা জগবন্ধুবাবুকে এসে নালিশ জানালেন। এই ঘটনায় জগবন্ধু রেগে উপেনকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে লাগলেন। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য মামার এই বিরোধিতা উপেন্দ্রনাথকে অসুবিধায় ফেলল। তিনি মনে মনে কাতরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'আচ্ছা তুমি তো ব্রাহ্মণ। তোমার বাড়িতে ঠাকুর-সেবা আছে কি? 'উপেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, নারায়ণের নিত্যপূজা হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তবে একদিন নারায়ণের প্রসাদ খাওয়াতে পারো?' শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নারায়ণের প্রসাদ নিয়ে যাওয়ার কথায় প্রতিশ্রুত হয়ে উপেন্দ্রনাথ দোলাচল মনে বাড়িতে ফিরলেন। মামিমা এতে সম্মত হবেন তো! শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনুরোধ তিনি কীভাবে গ্রহণ করবেন তা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না উপেন্দ্রনাথ। অবশেষে মামিমাকে জানাতেই তিনি সানন্দে সম্মতি প্রদান করলেন। তিনি রন্ধনে পটীয়সী ছিলেন। একদিন ভালোভাবে রান্না করে নারায়ণের ভোগ দিলেন এবং প্রসাদরূপে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। দক্ষিণেশ্বরে আনন্দ করে সেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এরপর থেকেই প্রায়ই নারায়ণের প্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে যেতে লাগল আর উপেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার বাধাটিও দূর হয়ে গেল। কেবল তাই নয় ধীরে ধীরে মাতুলানী হয়ে উঠলেন ভক্তমণ্ডলীর একজন, সমস্ত পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী।

সুপুরুষ উপেন্দ্র বড় দরিদ্র। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলেই বহু কিছু নিয়ে যায়। উপেন্দ্র পারেন না। মনে মনে ভাবেন, আমার যদি অর্থ হয়। একদিন ভক্তদের সামনে উপেনকে দেখিয়ে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ও তো কিছু চায় না, ও চায় ওর ছোট দুয়ারটি ভেঙে বড় দুয়ার হবে। তা ওর হবে।' বাস্তবিকই বটতলার পুস্তক-বিক্রেতা উপেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন

'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ধনী হওয়া এক বিরাট কাহিনী, কিন্তু তার আগে তাঁর বিবাহের কাহিনীটি উল্লেখ করতে হবে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু উপেন্দ্রনাথের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। বড় মজার সেই কাহিনী। সুপুরুষ দরিদ্র উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুরূপা ধনী ভবতারিণীর বিবাহ ঠিক হল। ভবতারিণী ছিলেন সারদার দূর সম্পর্কের বোন আবার শ্রীরামকৃষ্ণেরও আত্মীয়। রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে তিনি বসুমতী মা নামে সমধিক পরিচিতা। বসুমতী মায়ের সঙ্গে বিবাহের পরে এই পরিবারটি পরিচালিত হত শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। ঘরে যেমন গৃহদেবতা বিরাজ করেন, বংশ-পরম্পরায় সেই গৃহদেবতা সেই বংশের সুখদুঃখ ভালোমন্দের সঙ্গী হয়ে ওঠেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে জীবন্ত গৃহদেবতা। তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এই পরিবারগুলির জীবন-চক্র। ভারতবর্ষ মানবজীবনকে কয়েকটি আশ্রমে বিভাজিত করেছে। কেবল সন্ন্যাস নয় সংসারকেও একটি আশ্রমরূপে সম্মান দেওয়া হয়েছে। এই গৃহস্থ আশ্রমের যথার্থরূপ কেমন হওয়া উচিত, তার একটি বাস্তব প্রয়োগ তিনি তাঁর গৃহীভক্তদের পরিবারগুলির উপর প্রযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। দেখাতে চেয়েছিলেন একটি আদর্শকে। কারণ পরিবারে গুণমানের উপরেই গড়ে ওঠে সমাজের সুদৃঢ় ভূমি। শ্রীরামকৃষ্ণের নারী জাগরণের ভাবনা বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হয়েছিল। এবং একথা অনস্বীকার্য যে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনার যথার্থ সঙ্গী ছিলেন শ্রীমা সারদা। নারীকে নারী যতটা বুঝতে পারবে, নিজেদের সমস্যা নিজেরা যতখানি চিহ্নিত করতে পারবে অন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই মাতৃরূপিণী সারদা এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

গৃহীভক্তদের মধ্যে বাগবাজারের বলরাম বসু ছিলেন প্রধান। প্রধানত, তাঁর বাড়িই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র। রসিক মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরকে বলতেন, 'মায়ের কেল্লা'। আর বলরামবাবুর বাড়িকে বলতেন, 'কলকাতার কেল্লা'। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই এই পরিবার একটি আশ্রমে পরিণত হয়েছিল। পরিবারের কেউ ঈশ্বরের নাম না করে জলস্পর্শ করতেন না। এমনকী ছোটদের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। মনিবের ঈশ্বর প্রীতির সুযোগ নিতেন কাজের লোকেরা। কাজে ফাঁকি দিতে হলে জপের মালা নিয়ে বসে গেলেই হল। বাড়ির কেউ তখন তাঁকে কাজের কথা বলবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'বলরামের পরিবার সব একসুরে বাঁধা।' অর্থাৎ পরিবারের প্রতিটি সদস্যর মধ্যে ঈশ্বরপ্রাণতা দেখতে পাওয়া যেত। শুদ্ধ পবিত্র দেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বত্র অন্ন গ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু বলরাম বসুর বাড়িতে তিনি আহার করতেন এবং 'বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন।' বলরাম বসুর বাড়ি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য পূজা হত। বলরাম বসুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবী আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে গভীরতা সম্পন্ন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তিনি শ্রীমতী রাধারানির অষ্টসখীর প্রধান সখী।' এই লীলা কার্যে সহায়তা করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণভাবিনীর ভাই বাবুরাম পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ নামে খ্যাত, কৃষ্ণভাবিনীর পিতৃগৃহ ছিল আঁটপুরে। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ সহ অন্যান্য যুবকেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে বলরাম বসুর গৃহ, আজ যা বলরাম মন্দির নামে প্রসিদ্ধ তা ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম বসুকে পরমাত্মীয় জ্ঞান

করতেন। এই পরিবারের প্রতি তাঁর কতখানি আস্থা ছিল তা আমরা শ্রীমায়ের একটি স্মৃতিকথায় পাই, ‘একবার রামের মা’র (বলরামবাবুর স্ত্রী) অসুখ হয়েছিল। ঠাকুর আমাকে বল্লেন, ‘যাও দেখে এসো গে। আমি বল্লুম, যাব কিসে? গাড়িটাড়ি নাই! ঠাকুর বল্লেন, আমার বলরামের সংসার ভেঙে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে, হেঁটে যাও। শেষে পালকি পাওয়া গেল। দক্ষিণেশ্বর থেকে গেলুম।’

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত পরিমণ্ডলীর প্রসঙ্গে কথামৃতকার মাস্টারমশাই বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা আসতেই পারে। সাংসারিক বিপর্যয়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মাস্টারমশাই আত্মহত্যার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। দক্ষিণেশ্বরে এক পাগল বামুনের কাছে আত্মনিবেদন করতে হল তাঁকে। সাংসারিক সুখ মহেন্দ্রনাথের কপালে ছিল না। একে বিবাহের পর পিতামাতার সঙ্গে মতান্তর। অপরদিকে একটি সন্তানের মৃত্যুর পরে স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবী প্রায় উন্মাদিনী। তাঁর মধ্যেও জেগেছে আত্মহত্যা করার সুতীব্র বাসনা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাথা স্থির করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আনিয়ে রাখলেন। তাঁর ভয় হয়, পাশেই গঙ্গা। যদি সেখানেই আত্মহত্যা করেন? নহবতে মায়ের কাছে থাকেন নিকুঞ্জ দেবী। ধীরে ধীরে শান্ত হন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন, ‘যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী,....এমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।’ আবার চিন্তান্বিত মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে আশ্বাসবাণী শুনালেন, ‘কিন্তু যার ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে।...ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।’ মাস্টারমশাইয়ের ঈশ্বর ভাবনার প্রধান বাধাটিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, দূর করেছিলেন স্বয়ং নিজেই। নিকুঞ্জদেবীর জীবনধারা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহে ভেসে গিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক গৃহী ভক্ত ছিলেন নবগোপাল ঘোষ। কলকাতায় বাদুড়বাগানে বাসা করে তিনি থাকতেন। দু-দুবার বিপত্নীক হওয়ার পর তৃতীয়বার যাঁকে বিবাহ করে ঘরে আনলেন তিনি বড়ই ভক্তিমতী। তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীমা বৃন্দাবনে গিয়ে বলেছিলেন, ‘যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি ভাবে দেখলুম নবগোপালের স্ত্রী রাধারমণের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাওয়া করছেন।’ শোনা যায় শেষ জীবনে ইনি ছিন্নমস্তার ভাবে ভাবিতা ছিলেন এবং অপবিত্র কারও স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নবগোপালবাবুর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। ঘোষ পত্নীর ইচ্ছা ছিল স্বহস্তে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে খাওয়াবেন। মনের কথা জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, ‘কী তুই আমাকে হাতে করে খাওয়াবি?’ এই বলে একটু স্থির থেকে বললেন, ‘আচ্ছা দে।’ ঘোষজায়া শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে মিষ্টান্ন তুলে দিতে গিয়ে দেখলেন সাপের মতো একটি বস্তু ভিতর থেকে বাইরে এসে ‘আঁক’ শব্দে খাদ্য গ্রহণ করছে। কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেলেন ঘোষজায়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিমণ্ডলীর মধ্যে যেসব নারীভক্তের কথা আমরা বললাম এঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের থেকেও শ্রীমায়ের সম্পর্ক ছিল আরও নিবিড়। কেবল ভক্ত পরিবার থেকে বহু সাধিকা সাধন প্রেরণায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। এঁরাও ছিলেন শ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গী। বাস্তবিকই দক্ষিণেশ্বরের নহবত হয়ে উঠেছিল বৃত্তাকৃতি নারীমঠ। কালীপদ ঘোষের স্ত্রীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল এই ব্রতের ভার বহন করেছেন সারদা। হৃদয়ে রামকৃষ্ণকে ধারণ করে ‘রামকৃষ্ণগতপ্রাণা’ সারদা হয়ে রামকৃষ্ণেরই আরেক বিগ্রহ।

নয়

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেসব পরিবার ও পরিবারের নারীরা এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যে শ্রীমায়ের সংযোগ ঘটেছিল এমনটি নয়। তবু আমরা এঁদের জীবনকে ছুঁয়ে গিয়েছি। দেখতে চেয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবিত ও সারদা পরিচালিত এই একটি নারী আন্দোলনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলিকে। আমরা বারংবার বলেছি নারীমঠের সূত্রপাত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরেই। কত ত্যাগ, তপস্যা ও অশ্রুজল দিয়ে গাঁথা এই দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি। এই তপপ্রাণা ভক্তমহিলাগণ সমাগত হয়েছিলেন ব্যষ্টি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, নিজ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নী সারদার ছিল সমষ্টি ভাবনা। সমষ্টি চেতনা। যা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রতরূপে উদ্‌যাপিত করেছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ভারতবর্ষে নারীকে সাধন মার্গ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে বহুকাল। আদিতে শ্রী শঙ্করাচার্য নারীকে নরকের দ্বাররূপে চিহ্নিত করেছেন। তবু প্রতিটি যুগপুরুষের সঙ্গেই তাঁর শক্তিরূপে, তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনে একজন নারী শামিল হয়েছেন। শ্রীরামের সঙ্গে ছিলেন সীতা, বুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। সীতা, রাধা, যশোধরা বা বিষ্ণুপ্রিয়াদের জীবন অসাধারণ কিন্তু এঁরা কেউই স্বামীর ব্রত উদ্‌যাপনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি। প্রত্যেকেই থেকেছেন অন্তরালে। উপেক্ষিতার বিষাদে মগ্ন হয়ে। এদিক দিয়ে সারদা অনন্যা। তিনি স্বামীর পবিত্র সাহচর্য পেয়েছেন, পেয়েছেন সেবা করার অধিকার, অতুলনীয় স্নেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীরূপে সারদার একটি ভূমিকা ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জীবনে রাধা, রামচন্দ্রের জীবনে সীতা, বুদ্ধের জীবনে যশোধরা কোনো প্রাধান্য পাননি। রামচন্দ্রই প্রধান, শ্রীকৃষ্ণের জীবনে কৃষ্ণই প্রধান। কিন্তু সারদাদেবীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি, তাঁকে একটা পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হতে পারে সারদার ভূমিকাটি কী? আমরা এক্ষেত্রে সীতা ও রাধার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। রামচন্দ্রের জীবনে সীতার কী ভূমিকা ছিল? রামায়ণে বিবৃত সীতা কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি, রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতা বাস করেছেন কতটুকু সময়। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই যুবরাজ হওয়ার কথা রামচন্দ্রের। কিন্তু অভিষেকের আগেই ছন্দপতন হয়ে গেল। যুবরাজ হওয়া হল না, রামচন্দ্রকে বনে যেতে হল। চৌদ্দ বছর বনবাসের মধ্যেই সীতা হরণ হল। রাবণের অশোকবনের মধ্যে সীতা বন্দিনী হয়ে থাকলেন। রাম রাবণের যুদ্ধের পর অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে সীতাকে গ্রহণ করলেন রাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে যেতে হল। যদি রাবণ বধই রামচন্দ্রের জীবনে সবথেকে বড় কাজ হয়ে থাকে তবে সীতা এই কাজের একটি কারণ বা instrumental হয়েছিলেন। কারণ সীতার জন্যই রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ হল। কিন্তু রামচন্দ্রের সমগ্র জীবনের যে ব্রত তার মধ্যে সীতাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

আবার রাধার জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে গেলেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ হয়েছিল চৌদ্দ বছর বয়সে, তারপর কৃষ্ণ বহুদিন বেঁচে ছিলেন কিন্তু রাধার সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের বয়স প্রায় ছিয়াশি বছর। এত দীর্ঘ জীবনে রাধার কোনো ভূমিকা নেই। যা ভূমিকা তা চৌদ্দ বছরের মধ্যে। আবার বুদ্ধের লীলাসঙ্গিনী হল যশোধরা। বুদ্ধ তাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। তারপর বোধিলাভের পরে রাজা শুদ্ধোধন তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। এইসময় বুদ্ধের সঙ্গে যশোধরার দেখা হয়। যশোধরা ও মা গৌতমীর ইচ্ছায় ও ভিক্ষু আনন্দের প্রচেষ্টায় ভিক্ষুনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন বুদ্ধ। কিন্তু নারীমঠ গঠন ও নারীদের সন্ন্যাসের অধিকারদানের খুব একটা পক্ষপাতী ছিলেন না তথাগত। বুদ্ধের কাছে যখন প্রথম প্রস্তাবটি রাখা হল তখন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, শুধু আনন্দের আর্তিতে বুদ্ধ রাজি হয়েছিলেন। বুদ্ধ বলেছিলেন নারীমঠ গঠনে সঙ্ঘ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতিহাস বলছে সঙ্ঘ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে যশোধরা বা গৌতমীর কোনো দোষ নেই। পরবর্তীকালে তা ঘটেছিল। সুতরাং বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে, তাঁর ব্রতের সঙ্গে যশোধরা এসে মিলিত হলেন, যে সংযোগ রাধা বা সীতার জীবনে দেখা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘে নারীদের ভিক্ষুণীরূপে প্রতিষ্ঠা করা হলেও বুদ্ধ প্রতিটি ভিক্ষুণীকে একটি ভিক্ষুর অধীনে রেখেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসিনীদের স্বাধীন মর্যাদা প্রদান করেননি। সন্ন্যাসিনীরা সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন কিন্তু সন্ন্যাসীর অধীনে থাকার ফলে নারীর স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ফুটে উঠল না। নিজেদের কোনো স্বাধীনতা থাকল না। অর্থাৎ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পরে যশোধরা ভিক্ষুণী সঙ্ঘের প্রধান হয়েছিলেন কিন্তু তাঁকেও কোনো সন্ন্যাসীর অধীনে থাকতে হয়েছে। সুতরাং মৌলিক কোনো অবদান রাখা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। ভারতের ধর্মবিপ্লব গঠনে বুদ্ধের যে অসাধারণ ভূমিকা, তার মধ্যে যশোধরা নেই। ধর্ম-আন্দোলনকে অহিংসা, মুদিতার বাণী প্রচারে বুদ্ধের জীবনে পরিপুষ্টি দানের ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাই না। অর্থাৎ বুদ্ধ জীবনেও যশোধরা নিরুচ্চার, নেপথ্যচারিণী। এরপর আমরা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা বলতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাংলার ধর্ম ইতিহাসে একটি বিরাট অবদান রেখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য যদি না আসতেন তবে বঙ্গ ও উড়িষ্যায় হিন্দুধর্ম টিকে থাকত না। শ্রীচৈতন্যের জন্যই হিন্দুধর্ম টিকে ছিল। শ্রীচৈতন্য গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন চব্বিশ বছর বয়সে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলে রেখে গেলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুরে এলেন তখন মা শচীদেবী তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া পাননি। জীবনে আর দেখাই হল না বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের। চৌদ্দ বছরের বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের মর্মবেদনা আজ আমরা অনুভব করার চেষ্টা করি। বিষ্ণুপ্রিয়া নব্বই বছর বেঁচে ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কখনো তাঁর দেখা হয়নি। এই যে দীর্ঘ জীবন, শচীদেবী ও বংশী নামে এক পুরাতন ভৃত্য ছাড়া আর কেউ তাঁর মুখ দর্শন করতে পারেননি। সারাদিন নিজেকে গৃহবন্দী রাখতেন, একটি করে চাল নিতেন আর মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, দিনের শেষে সেই অল্প অন্নটুকু গ্রহণ করতেন। নিমকাঠের গৌরাঙ্গ মূর্তি তৈরি করে তিনি পূজা করতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া চিরদিনই 'চৈতন্যগতপ্রাণ' হয়ে ছিলেন কিন্তু শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনে তাঁর কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাই না।

তবে প্রশ্ন আসতে পারে, সীতা, রাধা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া অবতার পুরুষের সঙ্গে এলেন, কিন্তু কোনো ভূমিকা নেই কেন! এর উত্তররূপে বলা যায় যে যে যুগে এঁরা এসেছিলেন সে যুগে নারী আন্দোলন ও নারীর সামাজিক অবস্থান হয়তো বা কোনো ভূমিকা পালনের উপযোগী ছিল না। কিন্তু ইতিহাস আমাদের জানায় এঁরা কোনো ভূমিকা পালন করেননি। আমরা রামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীরূপে যখন সারদাকে পেলাম তখন একটু ভিন্ন ছবি দেখতে পেলাম। তিনি আজীবন স্বামীর ব্রত উদ্‌যাপনে সহায়তা করেছেন। শ্রীমা খুব লজ্জাশীলা ছিলেন। ঘোমটা ছাড়া খুব কম লোকই তাঁর মুখ দেখতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি অধ্যাত্ম ভাবনায়, চিন্তা ও চেতনায় স্বামীর অনুবর্তিনীরূপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। চিরকাল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পাশাপাশি থাকলেন, যে সৌভাগ্য, সীতা, রাধা বা বিষ্ণুপ্রিয়ার হয়নি। কিন্তু পাশাপাশি থাকলেও বিচ্ছেদের সুর ছিল। দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন তার কয়েক হাত দূরেই নহবত। শ্রীমা সেখানে থাকতেন তবু দেখা সাক্ষাৎ হত না। পরস্পর পরস্পরে কথা বলতে পারতেন না। শ্রীমা বলতেন, এমন সময় গিয়েছে দুমাস তাঁর দেখা পাইনি।' মা নিজেকে বলতেন, 'মন তুই কী এমন ভাগ্যি করেছিস যে রোজ রোজ তাঁর দর্শন পাবি।' এতবড় আত্মবিলয় জগতে বিরল। অর্থাৎ স্বামীর কাছে কোনো অভিযোগ অনুযোগ নেই। তবু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে আছেন তখন একদিন শ্রীমাকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁগা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজের শরীর দেখিয়ে) এই সব করবে?' শ্রীমা বললেন, 'আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?' শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই উত্তর দিলেন 'না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।' এরপরেও একদিন ভাবের ঘোরে শ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'দ্যাখো, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' শ্রীমা অনুযোগের স্বরে বললেন, 'আমি মেয়েমানুষ। তা কী করে হবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'এ আর কী করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।' এরও আগে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে গানের ছন্দে শুনিয়েছিলেন,

এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়;
যার দায় সে আপনি জানে, পর কী জানে পরেব দায়?
হায় বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া এ কী দায়!

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমাকে সজাগ করে দিতেন, 'শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।' এসব প্রসঙ্গ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। পরবর্তীকালে কোনো এক ভক্ত শ্রীমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মা অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন কিন্তু এবার আপনাকে রেখে ঠাকুর আগে চলে গেলেন কেন? শ্রীমা এর উত্তরে বললেন, 'বাবা, জানো তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল, সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।' অন্য এক সময় শ্রীমা বলেছিলেন, 'যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল, আমিও যাই। তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] দেখা দিয়ে বললেন, 'না তুমি থাকো, অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, 'তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।' অর্থাৎ লীলাসঙ্গিনীরূপে সারদাকে 'ভার সমর্পণ' করে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্য যুগপুরুষের মতো নেপথ্যচারিণী করে রাখেননি। যদিও শ্রীমা সকলের আড়ালে থাকতেই ভালোবাসতেন।

তবু বলতেই হয় শ্রীরামকৃষ্ণের যে অবদানটি আছে, যা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে বলে গিয়েছেন শ্রীমার ভূমিকা তার চেয়েও বেশি। 'এ আর কী করেছে? তোমাকে এর চেয়ে বেশি করতে হবে'—কথাটির অর্থ তাই দাঁড়ায়। শ্রীরামকৃষ্ণ চলে গেলেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি একটি ধর্মবিপ্লবের সূচনা করে গেলেন, কিন্তু এই আন্দোলনকে গতিদান করতে পারেননি শ্রীরামকৃষ্ণ। এই গতিটি প্রদান করলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এটি শ্রীরামকৃষ্ণেরই অনবদ্য বেদান্ত দৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের বজ্র হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের আন্দোলন এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্রবাহ পথে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, সনাতন ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মতো হিমালয়ের গহন কন্দরে গিয়ে সাধনায় ডুবে যেতে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সমাজমুখী করে তুললেন। 'বনের বেদান্তকে ঘরে' আনার কথা বললেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে 'শিব-জ্ঞানে জীব-সেবার' মন্ত্রদান করেছিলেন। কিন্তু তিনি আদর্শটি প্রদান করে গিয়েছিলেন, এই আদর্শকে রূপায়িত করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন শ্রীমা সারদা।

দশ

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আন্দোলনকে গড়ে তুলেছিলেন কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসী শিষ্যকে কেন্দ্র করে। এঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত সন্ন্যাসী সন্তান। এঁদের সকলেরই শ্রীমা সারদার প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। কাশীপুরে তিনি এই সন্ন্যাসী শিষ্যদের ভিক্ষা করিয়েছিলেন, এবং প্রথম ভিক্ষাটি গ্রহণ করেছিলেন সারদার কাছ থেকে। তাঁরা সেদিন শ্রীমাকে অন্নপূর্ণারূপে প্রণাম জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় শ্রীমার দেবী রূপটি সম্বন্ধে সব সন্ন্যাসী সন্তানই অবহিত ছিলেন তবু দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কয়েকজন বিশেষ সন্ন্যাসী সন্তান শ্রীমায়ের ভারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীমায়ের প্রথম সেবক সন্তান ছিলেন লাটু মহারাজ,—স্বামী অদ্ভুতানন্দ। অদ্ভুতানন্দের জীবন অদ্ভুত। অদ্ভুতানন্দের শৈশবের নাম ছিল রাখতুরাম। তিনি বিহারের ছাপড়া জেলার এক গ্রামে মেষপালকের দরিদ্র ঘর আলো করে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করলে তাঁর জীবন সংশয় উপস্থিত হল। মেষপালকের গৃহে দরিদ্র মাতার একমাত্র অবলম্বন ঈশ্বরের করুণা, অসহায় অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের কাছে পুত্রের জীবন ভিক্ষা করলেন। ধীরে ধীরে পুত্র সুস্থ হলে ঈশ্বরই তাঁকে রক্ষা করেছেন এই বিশ্বাসে নাম রাখলেন রাখতুরাম।

দরিদ্রের সংসারে পাঁচ বছর বয়সেই লাটু অনাথ হলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অকালেই মৃত্যুর কবলে কবলিত হলেন রাখতুরামের পিতামাতা। সুপুত্র প্রসব করেও তাঁর বিকশিত জীবন দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হল না। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন, দুঃখের ছদ্মবেশেই তিনি নিজের কাছে ভক্তকে টেনে নেন। রাখতুরামের আশ্রয় হলেন নিঃসন্তান কাকা। কাকার অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। কিছুদিনের মধ্যেই মহাজনের ঋণের দায়ে ঋণগ্রস্ত হলেন তিনি। নিঃসম্বল অবস্থায় পরিবার ও রাখতুরামকে নিয়ে অন্নের খোঁজে চলে এলেন কলকাতায়। গ্রামবাসী ফুলচাঁদ কলকাতায় রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি আর্দালির কাজ করতেন। রাখতুরামের কাকা সেই ফুলচাঁদের দ্বারস্থ হলেন। ফুলচাঁদের সুপারিশেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত হলেন রাখতুরাম। রাখতুরামের কাজ ছিল বাজার করা, মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, ফাই-ফরমাশ খাটা ইত্যাদি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। রামচন্দ্র দত্ত তাঁর প্রতি স্নেহে নাম রাখলেন 'লালটু'। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'লালটু' হয়ে উঠলেন 'লাটু' 'লেটো' কখনো বা 'নাটু'। শ্রীমাও তাঁকে ডাকতেন 'নাটু' বলে।

রামচন্দ্র দত্তের ভৃত্য রাখতুরাম কী করে শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বামী অদ্ভুতানন্দ হয়ে উঠলেন তা এক আশ্চর্য কাহিনী। রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যান।

সর্বসমক্ষে তিনি প্রচার করে বেড়ান, যে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবতার এবার ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব ঘোষণায় দুজন সোচ্চার ছিলেন একজন রামচন্দ্র দত্ত ও দ্বিতীয় জন নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ। রামকৃষ্ণ পার্ষদ রামচন্দ্র দত্ত জীবিকা ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের দুজনের এই সরব ঘোষণা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই রসিকতা করে বলতেন, 'আমাকে দুজন ভগবান বলে, একজন থ্যাটার করে, অপরজন মড়া কাটে।' যাই হোক রাখতুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি রামচন্দ্রের ভালোবাসার সঙ্গে পরিচিত হলেন। রামচন্দ্র দত্তের কাছে শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণর কিছু উপদেশ, 'ভগবান মন দেখেন। কে কী কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না।

তিনি ব্যাকুল, তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চান না, তাঁরই কাছে ঈশ্বর প্রকাশ হন। ....'সরল ও অকপট হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে না পারলে তিনি দেখা দেন না।.....নির্জনে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে হয়, তাঁর জন্য কাঁদতে হয়, তবে তো তাঁর দয়া হয়।' রাখতুরামের মনে দাগ কেটে যায় কথাগুলি। সকলের অলক্ষ্যে তাঁর জীবনে সূত্রপাত হয় সাধনার ফল্গুধারা। মনে মনে ভাবেন, 'তাই তো এ পরমহংস কে? এত মিঠে যাঁর কথা, সেই সাধুটি থাকেন কুথায়? দক্ষিণেশ্বর, সে কতদূর?' এক রবিবার সে রামচন্দ্র দত্তকে বলে, 'আপুনি আজ উখানকে যাবেন; হামায় লিয়ে চলুন। হামি আপুনাদের *পরমহংসকে দেখবে।' রামচন্দ্র দত্ত রাজি হলেন, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে লাটু দেখলেন* শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও লাটু মহারাজের প্রথম দর্শনের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন,—

'একদিন দেখি রামবাবু সঙ্গে করে এক ছোঁড়া—চাকর এনেছেন, ছোঁড়াটা দেখতে গোলগাল বেঁটে খেটে জোয়ান বলেই মনে হল। তখন আমি তার নাম জানতেম না। এই যে পশ্চিমের বারান্দা দেখছ, এইখানে ছোঁড়া-চাকরটা দাঁড়িয়েছিল, তখন ঘরের ভিতর রামবাবু ঠাকুরের অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। ঠাকুর তখন বাহিরে ছিলেন। রাধিকার কীর্তন গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইলেন—তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে, তাহাতে আখর দিতে ছিলেন, 'কথা কইতে পেলুম না', 'আমার বধুর সনে কথা হল না; দাদা বলাই ছিল সাথে, তাই কথা হল না ইত্যাদি। বারান্ডায় ঠাকুরের সঙ্গে লাটুর দেখা হয়, সেইসময় রামবাবুও ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ঠাকুর রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ? রাম! একে কোথা পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।' এই কথা বলিতে বলিতে রামবাবু ও পরমহংসদেব ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, লাটু তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে রইল; আমি বললুম—যাও না ভেতরে। আমার কথা শুনে বালক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে কিনা ভাবতে লাগল। ঠাকুর তাকে ঘরে ডেকে নিলেন। আমি আর ঘরের মধ্যে যাইনি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও লাটুর প্রথম দর্শনে ঘরের মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ আমরা রামচন্দ্র দত্তের স্মৃতিকথায় পাই। তিনি বলেছেন, "আমাকে এক বেশভূষাহীন সাধুর পায়ে প্রণাম করতে দেখে লেটোটা কী ভাবলে জানি না। আমার পরই দেখি সে ঠাকুরের পায়ে ধরে প্রণাম করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ঠাকুর আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা আরম্ভ করে দিলেন, ততক্ষণ দেখি লেটোটা চুপ করে হাতজোড় করে ওনার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের

কথাগুলো শুনছে। আর ঠাকুর মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন আর বলছেন—'বোস না রে বোস'। এমন সময় আমাদের কথার মধ্যে এসে গেলো সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধের কথা। ঠাকুর বললেন—যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথর চাপা ফোয়ারা। মিস্ত্রি এখান-সেখান ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গায় চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফরফর করে জল বেরোতে থাকে। —এই কথা কয়টি বলিয়া ঠাকুর লালটুকে ছুঁয়ে দিলেন। ঠাকুরের স্পর্শে লেটোর ভাব যেন উথলে উঠল। তাঁর হুঁশটুশ সব চলে গেল—মনে হল সে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে বাস করছে। সহসা তার লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর গদগদ হয়ে পড়ল, দরদরধারে অশ্রু পড়তে লাগল, আর ঠোঁট দুটো কী জোরে জোরে কাঁপতে লাগল। ঠাকুরের স্পর্শে লেটোর এমন ভাববিহ্বল অবস্থা দেখে আমার ভারী আশ্চর্য ঠেকল। লেটোকে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে দেখলাম। এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল তবু কান্না থামল না শেষে বাধ্য হয়ে অনুরোধ করে বসলুম, এখন এই ছেলেটা কী সারাক্ষণ কাঁদতে থাকবে? আমার কথায় ঠাকুর পুনরায় লালটুকে ছুঁয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে লালটুর ফোঁপানি কমে গেল।'

ছাপরা জেলার এক সামান্য মেষপালকের পুত্র রাখতুরামের জ্ঞানের ফোয়ারা খুলে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ফিরে আসবার সময় বললেন, 'ওরে! আসিস, এখানে মাঝে মাঝে আসবি।' একদিনের দর্শনে সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হয়ে গেল লাটুর। প্রাণবন্ত ছেলেটি কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। নীরবে সে কাজগুলি করে যেত, যেন ঠিক দম দেওয়া কলের পুতুল—একটি যন্ত্রমাত্র। লাটু ধীরে ধীরে একা একা দক্ষিণেশ্বরে যেতে শুরু করল। প্রথমদিন মন্দিরে ভবতারিণীর আরতি দেখে চোখে জল এসে গেল লাটুর, তারপর দৌড়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করল। আরতি শেষ হওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাকে প্রসাদ পেয়ে যেতে বললেন। বিহার দেশীয় আচার নিষ্ঠায় প্রবল সংস্কারবশত কালীবাড়ির আমিষ প্রসাদ গ্রহণে তার কুণ্ঠা জেগেছিল। সেই কথা বুঝে অন্তর্যামী ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওরে! এখানে মা কালীর আমিষ ভোগ হয় আর বিষ্ণুমন্দিরে নিরামিষ ভোগ হয়—সব গঙ্গাজলে রান্না, তোকে কার প্রসাদ নিতে বলব। প্রসাদে কোনো দোষ নেই, জানবি।' নিরক্ষর লালটু অতশত বুঝিল না, বলিয়া ফেলিল—"আপুনি যা পাবেন, হামনে তাই করবে। হামনি ত আপুনার প্রসাদ পাবে—বাকি আর কুচ্ছু পাবে না।"

সরলচিত্ত বালককে তাঁহার প্রসাদ প্রার্থী দেখিয়া ঠাকুর রামলালদাদাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—"শালা কেমন চালাক দেখেছিস। আমি যা পাব, শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়।"

ক্রমে ক্রমে তথায় 'একে একে ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়, ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কলকাতার যাবিনি রে, সারা বেলা যে কাটিয়ে দিলে এখানে? পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, পয়সা আছে তো রে, যাবি কিসে? কোনো কথা না বলিয়া বালক আপনার পকেট নাড়া দিয়া পকেটস্থ পয়সাগুলিকে বাজাইয়া দিল। ঠাকুর হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।'

লাটুর আর প্রভুগৃহ ভালো লাগে না। দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত মানুষটির প্রেমে বদ্ধ হয়েছে সে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আর্তি জানায়, 'হামনে আপুনার ইখানকে থাকবে। আর নকরি করবে না। আপুনার কাজ হাম্‌নি কোরবে। একসঙ্গে দু-তিন দিন ধরে দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে থাকেন লাটু। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'ওরে! রাম যে তোর জন্য ভেবে ভেবে সারা হল।' লাটু বলেন, 'আমি ইখানকে থাকলে মনিবের কোনো গুঁসা হয় না। তিনি তো আর একজনকে রেখেছেন।—সেই সব কাজ করবে। হামি ইখানকে থাকবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'সে কী রে? তুই রামের মাইনে খেয়ে এখানকে বসে থাকবি? এ তো হয় না বাপু! যার মাইনে নিবি, তার কাজ করবি, এই তো জানি। একজনের মাইনে নিবি আর অপরের কাজ করবি এমন কথা তো কোথাও শুনিনি।' লাটু আর শ্রীরামকৃষ্ণের এইরকম কথার মধ্যেই একদিন রামচন্দ্র দত্ত সস্ত্রীক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে বললেন, 'ওগো রাম! এই ছেলেটা কীরকম দেখো, বাপু! যত বলি বাড়ি যা, ওরা কত ভাবছে, ছেলেটা কেবল ফিকফিক করে হাসছে, আর বলছে—এখানে থাকলে ত মনিবের গুঁসা হয় না। ইখান হতে চলে যেতে হামার মন কেমন করে। হামি যাবে না। যত বল্লি কলকাতায় যা, কিছুতেই কী এখান হতে নড়বে না। একী বাপু! কাজকর্ম ছেড়ে এখানে এত থাকা কেন? পারো তো তুমি ওকে বুঝাও।

ঠাকুরের কথার ভাবে ভক্ত রামচন্দ্র ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। বালক যে ঠাকুরের কৃপা পাইয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া রামবাবু কৃত্রিম ক্রোধে লালটুকে বুঝাইতে বসিলেন—'হ্যাঁরে! এখানে কিসের জন্যে পড়ে আছিস, বল তো? বাড়ি যাবি না।'

লালটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কথার কোনো উত্তর দিল না।

পরক্ষণেই রামবাবু ঠাকুরের নিকট আবেদন করিলেন—'ভালোবেসে ছেলেটার তো মাথা খেলেন, আর কেন আমায় এ বিড়ম্বনা ভোগ করান?'

ঠাকুর স্মিতহাস্যে বলিলেন—'কী মধু পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায়, বলো তো রাম? আমি তো কিছু বুঝি না।

—'ভক্তের কাছে ভগবান জানিতে চাহেন—ভক্ত কেন ভগবানকে ছাড়িয়া থাকতে পারে না। এ রহস্যের মীমাংসা কে করে?'

অবশেষে অনুমতি মিলল, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে বাস করার সুযোগ পেলেন লাটু। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ তখনো শেষ হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দেখেন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছেন লাটু। তিনি লাটুকে ডেকে বললেন, 'ওরে লেটো! তুই এখানে বসে আছিস; আর উনি যে নবতে রুটি বেলার লোক পাচ্ছেন না।'—শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ধ্যান ভাঙে লাটুর। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হন নহবতে। শ্রীমাকে উদ্দেশ করে বলেন, 'এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ত্ব, তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বোলো, এ করে দেবে।'—সেইদিন থেকে লাটু শ্রীমার সেবাধিকার পেলেন যা তাঁর জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছিল।

এগারো

যুবক লাটুকে মাতৃসেবায় নিযুক্ত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমা তাঁর প্রিয় পুত্র 'লাটু' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন 'লাটুর সবই অদ্ভুত'। মায়ের এই কথার সূত্র ধরেই যেন নরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় গুরুভাইকে সন্ন্যাস নামটি প্রদান করেছিলেন এইরকম—স্বামী অদ্ভুতানন্দ। হ্যাঁ, সুদূর ছাপরা জেলার অখ্যাত গ্রামের মেষপালক রাখতুরাম এইভাবেই রূপান্তরিত হয়েছিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দে।

দক্ষিণেশ্বরের নহবতে শ্রীমায়ের বসবাসকালীন স্মৃতি লাটু মহারাজ ভুলে যাননি কোনোদিনই। পরবর্তীকালে কাশী থেকে এক ভক্তের হাতে মায়ের জন্য কিছু পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'আমার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা।' নহবতের ছোট্ট ঘরে শ্রীমায়ের দিন কেমন কাটত তারই স্মৃতিচারণ করে লাটু মহারাজ বলেছিলেন, "দেখো! মা কত কষ্টে না দিন কাটিয়েছেন। সামান্য এইটুকু ঘরে তিনি কতদিন রইলেন, কেউ জানতে পারত না। কখন যে গঙ্গাস্নানে যেতেন, কেউ টের পেত না।....মা'র মতো বৈরাগ্য হাম্‌নি ত দেখেনি! আউর তাঁর দয়ার কী তুলনা আছে? হামার বহু ভাগ্য যে, উনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) হামাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন—মায়ের কৃপায় হামার জীবন তো সার্থক হয়ে গেছে।.....হামাদের কাছ হোতে তিনি ত কুছু পাবার আশা রাখেন না, বাকি তাঁর দয়ায় হাম্নে তাঁকে পেয়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিনটি থেকে লাটু মহাবাজকে শ্রীমায়ের সেবার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন সেইদিন থেকে বরাহনগর মঠের দিনগুলি পর্যন্ত তিনিই ছিলেন শ্রীমায়ের সেবক। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর শ্রীরামকৃষ্ণেরই নির্দেশে যুবক যোগীন বা স্বামী যোগানন্দকে শ্রীমা প্রথম দীক্ষাদান করেন। লাটু মহারাজের পরে স্বামী যোগানন্দই শ্রীমায়ের সেবক হন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার আগে পর্যন্ত যুবক লাটু মাতৃসেবায় তৎপর ছিল। অসুখের জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতার শ্যামপুকুরের বাটীতে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমা কিন্তু রইলেন দক্ষিণেশ্বরে। অবগুণ্ঠনবতীর অন্তরের যন্ত্রণা সকলের হৃদয় স্পর্শ করল না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর বিশেষ কোনো গুরুত্ব একদল ভক্ত দিতে চাইলেন না। কিন্তু সরব হলেন সেবক লাটু। না প্রতিবাদে মুখর হননি, শ্রীমায়ের কথাটি তাঁর মনকে বিদ্ধ করল। তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীমাকে শ্যামপুকুরে নিয়ে উপস্থিত হলেন। যুবক ভক্তের নিজে নেওয়া সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট কিছু গৃহী ভক্তের মনঃপুত হল না। তাঁরা বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কিন্তু কথামৃতকার শ্রীম বা মাস্টারমশাই ও অন্যান্য যুবক ভক্তদের ইচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণ একটি নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, 'আজকের রাতটা থাকুক, গতিক দেখে পালাবে।' অত্যধিক লজ্জাশীলা সারদা হয়তো শ্যামপুকুরে থাকতে পারবেন না—এইরকমই ইঙ্গিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু না, শ্রীমা গতিক দেখে পালালেন না, স্বামীর সেবায় তীব্র প্রেরণায় নহবতের ছোট ঘরটি ছেড়ে একটি সিঁড়ির চাতালকে তপস্যার

বেদি করলেন। এখানে প্রশ্ন আসে, শ্রীরামকৃষ্ণ কি জানতেন না শ্রীমায়ের মনোগত ইচ্ছা ও স্বরূপ। জানতেন, তাঁর নীরব সম্মতি ছাড়া সেবক লাটু কখনোই শ্রীমাকে শ্যামপুকুরে নিয়ে আসতেন না। তবু একদল ভক্তের তাঁকে অবতার বলে সরব প্রচার ও তিনি যে কত বড় ত্যাগী তা লোককে দেখাবার প্রবল বাসনার কথাও তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি ভক্ত ও ভগবতীর মধ্যেখানে এক নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মাত্র!

শ্যামপুকুরের বাড়ি ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরের বাগানবাড়িতে এলেন তখনো শ্রীমার কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছেন যুবক লাটু। দুরারোগ্য ব্যাধিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবতী তনু। যাঁকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতাররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁরই এ হেন দেহযন্ত্রণা! অনেকের মনেই সংশয় জেগেছে। যাঁদের মনে সংশয় দোলা দেয়নি তাঁরা সাধনায় ডুবে যত্নপর হয়েছেন। 'নির্বিকল্প সমাধি' চাই শেষের দিনকটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের বাসনা। এই সময় যুবক ভক্তদের মানসিক অবস্থা ও শ্রীমায়ের ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লাটু মহারাজ বলেছেন, "মায়ের মতো এমন বুদ্ধিমান মেইয়া লোক হাম্‌নে দেখলুম না। তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) সেবা করতে করতে হামাদের মধ্যে কেউ হতাশ হোয়ে পড়লে তিনি (শ্রীশ্রীমা) তা বুঝতে পারতেন। যোগীনভাইকে দিয়ে বলে পাঠাতেন—"ওকে হতাশ হোতে মানা করো। তাঁর শরীরও আজকাল একটু ভালো রয়েছে, এখন তো ঘায়ের মুখ বাহিরের দিকে হয়েছে।" এমনি কোরে মা হামাদের সব সাহস দিতেন।"—একটা একটা করে দিন গড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণের জন্য প্রস্তুত। যেদিন তিনি সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন, সেই দুঃখময় দিনে শোকে মুহ্যমান যুবক লাটু শ্রীমায়ের পাশে ছায়ার মতো ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবতী তনুকে যখন কাশীপুর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল তখন সেই শূন্য উদ্যানে একাকী সারদার পাশে ছিলেন যুবক লাটু। তিনি শ্রীমাকে ছেড়ে শ্মশানে যাননি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীমায়ের শোক প্রকাশ ভঙ্গিটি কেমন ছিল তার অপূর্ব একটি স্মৃতির টুকরো লাটু মহারাজের উক্তিতে পাই। তিনি বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেহত্যাগ করলেন তখন "মা থাকতে না পেরে ঠাকুরের ঘরে এলেন এবং 'মা কালী গো! তুমি কী দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো! বলে কাঁদতে লাগলেন। মাকে কাঁদতে দেখে বাবুরাম আর যোগীনভাই সেখানে গেলো আর গোলাপ-মা মাকে ধোরে ঘরে নিয়ে গেলো।....মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করলেন আর তাঁর গলার আওয়াজ শুনা গেলো না। মেইয়া মানুষের এমন ধৈর্য হাম্‌নে জীবনে দেখেনি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুকে কেবল শ্রীমায়ের সেবকরূপে নিযুক্ত করেননি। তিনি শ্রীমায়ের স্বরূপকেও উন্মোচিত করেছিলেন তাঁর কাছে। 'দেবদেহধারণের জন্য ও রক্ষার জন্য প্রয়োজন একজন দেবীর'—এই দেবীই সারদারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায় তৎপরা। লাটু মহারাজের কাছ থেকে এক বিরল স্মৃতিচারণ শুনেছি আমরা, 'একবার একজন মেয়ে-ভক্ত মায়ের কাছে এসে বললেন—'আমি বড় গরিব, ঠাকুরের জন্য বিশেষ কুছু আনতে পারিনি', একথা শুনে মা বললেন—'ওনার খাওয়া হয়ে গেছে। উনি কী এখন আর খাবেন? এত দেরি করে আসতে হয়, বাছা!' মায়ের কথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভাবে টলমল করতে করতে সেইদিকে এলেন আর মেয়েটির হাত থেকে খাবার নিয়ে প্রসাদ করে দিলেন।

তারপর হামায় বললেন—'দ্যাখ! এবার থেকে যে-কোনো জিনিস আসবে, সব নহবতে এনে দেখাবি, তারপর সবাইকে দিবি।'

"........ কেনো করলেন জানো? অসুখের আগে দক্ষিণেশ্বরে এমন সব লোক আসতে লাগল যাদের দেহ মন সুদ্ধ নয়। সে সব লোক আবার মানসিক করে তাঁকে খাবার পাঠাতে লাগল। এমন সব ব্যাপার হতে লাগল যে, হামি যদি একটা জিনিস তাঁর পাতে দিয়েছি অমনি তিনি চেঁচিয়ে বলতেন—'এ জিনিস কোন শালা দিয়েছে রে? শালার ছেলে ভালো থাকবে মানসিক করে তাই গজা পাঠিয়েছে। শালা হাড় কিপ্পিন।' এই না বলে সেই জিনিস ফেলে দিতেন। এমনি সব ব্যাপার হতে লাগলো। জিনিসগুলোর দোষ কাটাবার জন্যে তিনি মায়ের কাছে নহবতে পাঠাতে বলতেন।"

শ্রীমার কাছে 'দোষ কাটিয়ে' অন্নগ্রহণ করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ! শুনতে আশ্চর্য লাগে না কি? কতখানি সম্মান তিনি স্ত্রীকে প্রদান করেছিলেন তা এই ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করতে পারা যায়। দক্ষিণেশ্বরে দিন শেষ হয়ে কাশীপুরের পর্বও সমাধা হল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে নেই। শ্রীমা যাবেন তীর্থ করতে। বৃন্দাবন বাসের খণ্ডচিত্র লাটু মহারাজের স্মৃতিকথায় পরিস্ফুট হয়েছে, "শুনলুম মাকে ও লক্ষ্মীদিদিকে বলরামবাবু তীর্থে পাঠাচ্ছেন। সঙ্গে যোগীনভাই আর কালীভাই যাবে। মা তীর্থে যাচ্ছেন শুনে, তাঁর সঙ্গে হামার যাবার ইচ্ছা হল। মা তা বুঝে নিলেন। তিনি হামাকেও সঙ্গে নিলেন। মাস্টারমশায় তাঁর পরিবারকেও মায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন আর গোলাপ-মাও তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। দেখো তো! মায়ের কৃপায় হামাদের তীর্থে যাওয়া হল। এমন ভালোবাসা দিয়ে মা আমাদের ঘর বেঁধে রেখেছেন।"

বৃন্দাবনে লাটু মহারাজের স্বভাবসিদ্ধ উদাসীনতা ও বৈরাগ্য আরও বৃদ্ধি পেল। একদিন কাউকে কিছু না বলেই কোথায় চলে গেলেন। কেউ তাঁর কোনো খোঁজ পেল না। তিনদিন পরে হঠাৎ এসে উপস্থিত। চুল উস্কোখুস্কো, চোখ লাল। সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'হ্যাঁরে, কোথায় ছিলি?'—কোনো উত্তর নেই। কেবল হাসেন সাধক লাটু। শেষে শ্রীমা জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'নদীর ধারে ছিলুম।' তারপর ছেলেমানুষের মতো মায়ের কাছে আবদার করলেন, 'বড় খিদে পেয়েছে মা, কুছু খাবার দিন।' মা তাড়াতাড়ি খাবার দিতেই, সেটুকু খেয়ে আবার কোথায় চলে গেলেন। লাটুর এ হেন ব্যবহার দেখে মা বলেছিলেন, 'লাটুর সবই অদ্ভুত।"

বৃন্দাবন বাসকালে ধীরে ধীরে যোগীন মহারাজ বা স্বামী যোগানন্দ শ্রীমায়ের সেবকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এর প্রথম কারণ, বোধহয় লাটুর উদাসীন স্বভাবের আধিক্য এবং দ্বিতীয় কারণ যোগীন মহারাজের দীক্ষালাভ। শ্রীমা তীর্থাদি দর্শন করে যখন নীলাম্বর মুখার্জির বেলুড়ের বাগানবাড়িতে বাস করছেন তখনো লাটুমহারাজ মায়ের সেবক, আবার যোগীন মহারাজও সেবক। জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে, একদিন যোগীন মহারাজ অনুপস্থিত থাকায় শ্রীমা লাটুকে বাজারে পাঠাতে চাইলেন, লাটু মহারাজ জানিয়েছেন, 'মায়ের কথা শুনে হাম্‌নে বল্‌লুম—'এখন হামি যেতে পারব না; তার চেয়ে বরং যাই, যোগীনকে ডেকে দিই গে। হামার এখন ওসব হাঙ্গামা পোয়াতে মন যায় না।' লাটুর মুখে একথা শুনে শ্রীমা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'তোর গিয়ে কাজ নেই, থাক, তুই যোগীনকেই ডেকে দে।' এই ঘটনা

উল্লেখ করে লাটু মহারাজ বলেছিলেন, 'এরকম কত যে উৎপাত মায়ের কাছে করতুম! কিন্তু মা কখনো তাতে বিরক্ত হতেন না। মায়ের সহ্যশক্তির কি তুলনা আছে?'

পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর নীরব ও গভীর সম্পর্ক কখনো কখনো প্রকাশিত হয়ে পড়ত। এক ভক্তের কাছে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'দেখো! মা বলরাম মন্দিরে মাঝে মাঝে আসতেন। হাম্‌নে বাহিরের ঘরে থাকতুম। হামাকে হামেশা লোকে জিজ্ঞেস করত—'মশায়। মা উপরে রয়েছে, আপুনি এখানে কেনো? তাদের বলতুম—'তাতে কি হয়েছে' হামার মনের ভাব কেউ বুঝত, কেউ বুঝত না। কেউ কেউ আবার একথা শুনে চটে যেত।....শালারা কেউ কৃচ্ছ্র করবে না কেবল মা-ঠাউন, মা-ঠাউন বলে হুজুগ করবে। হাম্‌নে মানে না তোদের এমন মা-ঠাউনকে।

'মাকে মানা কি সহজ কথা রে? তাঁর (ঠাকুরের) পূজা তিনি গ্রহণ করেছেন, বুঝো ব্যেপার! মা-ঠাউন যে কি, তা একমাত্র তিনি বুঝেছিলেন, আর কিঞ্চিৎ স্বামীজি বুঝেছিলেন। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে বহুৎ তপস্যার দরকার।"

লাটু মহারাজের শ্রীমার জীবন-বর্ণনায় ভীতি ছিল। কারণ তিনি জানতেন, এ জীবন-বর্ণনা দুঃসাধ্য। তাই বলতেন 'আমি মা'র কথা যেখানে সেখানে বলি না, ঠাকুর ও স্বামীজির কথা বলে থাকি। সকলে বুঝবে না, উলটো বুঝবে, তাই।' আর একবার বলেছিলেন, 'মাকে চিরদিনই মা'র মতোই দেখতাম। মা আমাদেরই মা, এতে আর সন্দেহ কি আছে?—লাটু মহারাজের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা সত্যিই সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহই রাখে না। বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবারতির দায়িত্বে ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শশী মহারাজ। কঠোর নিষ্ঠাবান শশী মহারাজ একদিন সকালে ভোগের জন্য হালুয়া তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন কড়া অপরিষ্কার। খবর নিয়ে জানলেন, লাটু মহারাজ ওই কড়াতে ছোলা সিদ্ধ করে রেখেছিলেন। ঠাকুরের সেবাপ্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও শশী মহারাজের পক্ষে অসহনীয় ছিল। অধৈর্য শশী মহারাজ সেদিন লাটু মহারাজকে এইরকম অমনোযোগের জন্য বেশ কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন। অভিমানী লাটু জবাব দিলেন, 'হামি মাকে পত্র দিব; তোমার বাবা-মা, আউর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে?'

লাটু মহারাজ বা স্বামী অদ্ভুতানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের এক বিস্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসী সেবকগণ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় 'ইউনিভার্সিটি বয়।' কিন্তু নিরক্ষর মেষপালক লাটু আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে তাঁদের থেকে কিছু কম ছিলেন না। শাস্ত্রীয় উপলব্ধি তিনি নিজ জীবনে অনুভব করেছিলেন সাধনার মাধ্যমে। আক্ষরিক অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরক্ষর বলা যায় না। কারণ তাঁর অক্ষর জ্ঞান ছিল। শ্রীমাও রামায়ণ, মহাভারত পড়তে পারতেন। কিন্তু লাটু ছিলেন যথার্থই নিরক্ষর। নিজের শিক্ষিত সন্তানদের পাশে লাটুকে যাতে ম্রিয়মাণ না লাগে সেই ইচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁকে পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যত তাঁকে বলেন, 'ক', লাটু মহারাজের বিহারি উচ্চারণে তা হয়ে যায় 'কা'। বহু চেষ্টার পর শ্রীরামকৃষ্ণ হাল ছাড়েন, হ্যাঁরে 'ক' যদি 'কা' বলবি তবে ক-এ আকারকে কি বলবি? যা তোকে পড়তে হবে না! এইরকমই কেবল গুরু ও শ্রীমায়ের আশীর্বাদে রাখতুরাম হয়েছিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। শ্রীমায়ের একান্ত অনুগত পুত্র।

বারো

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ কি চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন সনাতন ঋষির মতো ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে। তাঁকে সমাজের কাজের জন্য সাধারণ জনমানসের জন্য কর্মের মধ্যে টানলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে করিয়েছেন শ্রীমা। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমা গেলেন বুদ্ধগয়ায়। বৌদ্ধ মঠে সাধুদের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন ও সচ্ছলতা দেখে শ্রীমারও সন্ন্যাসী সন্তানদের কথা মনে পড়ল। তিনি কেঁদে কেঁদে একটি মঠের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানালেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টট যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, ঠাকুর তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? যদি সঙ্ঘই না হল তবে এত কষ্ট করে আসার কী দরকার—একজন স্ত্রীর স্বামীর প্রচারিত আদর্শ ও ব্রত সম্বন্ধে কী গভীর ও মহান উচ্চারণ। কারা আসেন? যাঁরা মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন, দিয়ে চলে যান মানবজাতির পথে চলবার একটি পথরেখা। বুদ্ধ এসেছিলেন তাই তিনি তথাগত বুদ্ধ রূপে সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সৃষ্টি করেছেন। রচনা করেছেন ভিক্ষুকের আচরণের নতুন ধারা। সারদাও জানতেন, 'একই চাঁদ রোজ রোজ' অর্থাৎ তাঁর স্বামী গদাধর চট্টোপাধ্যায় কেবল কালীর পূজারি বা দেবীকে দর্শনকারী সিদ্ধপুরুষ নন। তিনি যুগপুরুষ, যুগনায়ক। তিনিও সেই অচীন দেশ থেকে আসা এক মানুষ। তিনি জানিয়েছেন, 'চোখ বুজলে ঈশ্বর আছেন, চোখ খুললে কি নেই!' তিনি জানিয়েছেন, 'শিব-জ্ঞানে-জীব সেবার কথা'। বনের বেদান্তকে ঘরে আনার কথা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে ধর্ম। প্রতিটি মুহূর্তেই ধর্মাচরণ। ধর্ম শুধু ঠাকুরঘরের ব্যাপার নয়। দরিদ্র অন্নহীন মানুষদের দিকে তাকাতে বলেছেন তিনি। জনগণের মতোই নারীদের জন্য রয়েছে তাঁর বিশেষ ভাবনা, তিনি দেখিয়েছেন তাৎক্ষণিক সামাজিক দুঃখ দুর্দশা নারীকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে, এই সামাজিক কারণগুলি ধর্মের মোড়কে প্রযুক্ত। ধর্মের এই বিকৃত প্রয়োগ বন্ধ হবে। নারী জাগবে নতুন প্রেরণায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় ছিল এইসব—কিন্তু তাঁর ঈশ্বর তন্ময়তা ও ব্যাকুলতা, তাঁর জীবনের একের পর এক ধর্মসাধনার ইতিবৃত্ত তাঁর অন্যান্য ভাবকে ছাপিয়ে গিয়েছে। সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধরা পড়েনি সকলের কাছে। সেই রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথের কাছে, উৎসারিত হয়েছে সারদার মধ্যে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁরা ব্যাকুল, অস্থির। কবে বাস্তবায়িত হবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন স্বপ্ন। বিবেকানন্দের জ্বলন্ত বেদনার সঙ্গে

আমরা পরিচিত, তাঁর আহত সন্ন্যাসী সত্তা বারংবার ফিরে গিয়েছে মাটির টানে। বিরাট বটবৃক্ষ হয়ে ওঠার যন্ত্রণায় তিনি হয়েছেন কাতর। কিন্তু সারদা? উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণের বিধবা? যে যুগে মেয়েরা গঙ্গাস্নান করতেন পালকির মধ্যে বসে, সেই যুগে শুচিবাই আর সংকীর্ণ দৃষ্টির মধ্যেও একটি পূজারি ব্রাহ্মণের গৃহিণী জগৎকে কিছু দেওয়ার জন্য উন্মুখ! কেবল উন্মুখ নয়, আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর। এই জন্যই তো আসা। যুগধর্মকে বহন করবেন তিনি। করবেনই তো, তাঁর একদিকে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ। একজন পতি, অপরজন পুত্র। স্বামী বীজ রোপণ করে গিয়েছেন, বজ্রের মতো তীব্র তা, তাঁকে পরিচালিত করতে হবে, গঠন করতে হবে তাঁকে। তাঁকে হতে হবে সঙ্ঘপ্রসাধনী। সবাই জানবে তাঁর স্বামীকে, জানবে তাঁর পুত্রকে, তিনি থাকবেন নীরবে নিভৃতে, একান্ত আলয়ে, নারীর নিজস্ব বিচরণক্ষেত্রে। সেখানে তিনি স্বামী ও পুত্রের সাফল্যে এক চিরন্তন নারী, চিরন্তন মাতা। তবু বিদ্যুৎ ঝলকের মতো পর্দা যেন সরে যায়। উন্মোচিত হয় সারদার রূপ। পরবর্তীকালে স্বামী সারদেশানন্দকে যোগেন মা বলেছিলেন, যা কিছু দেখছ (মঠ আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়। যেখানে যা দেখেছেন—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'ঠাকুর, আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা করো, দুটি খাবার সংস্থান করো'। মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

কাশীপুর উদ্যানবাটীর দিনগুলি নরেন্দ্রনাথের কাছে ছিল এক যন্ত্রণাপীড়িত অধ্যায়। একদিকে পরিবারে অভাব অনটন, অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সময় ঘনিয়ে আসছে। অথচ তাঁর মহান বিশ্বগ্রাসী ব্রতকে ধারণ করার ক্ষমতা সকলের নেই। সেই দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি যেন তখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করছিলাম।.....অথচ এমন কেউ ছিল না যে একটু সহানুভূতি জানাবে আমাকে। শুধু একজন ছাড়া। সেই একজনেরই আশীর্বাদ আমরা পেয়েছিলাম। আর তাঁর সহানুভূতিই আমাদের মনে আশা জাগিয়েছিল। তিনি একজন নারী।.....একমাত্র তিনিই আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। যদিও তিনি নিজে ছিলেন অসহায়, আমাদের চেয়েও দরিদ্র। এই নারী আর কেউ নয়, স্বয়ং সঙ্ঘজননী সারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণহীন নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে তাঁর সন্তানদের কাছে যিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতীক।'

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর থেকে নরেন্দ্রনাথের অণুক্ষণের চিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব কেন্দ্র করে সঙ্ঘ হবে, মঠ হবে, মন্দির হবে, জীবনের এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন বিবেকানন্দ। পরিব্রাজকরূপে তিনি যখন দক্ষিণ ভারতে তখন তাঁর চিকাগো যাত্রার সুযোগ এল। গুণমুগ্ধদের মাধ্যমে অর্থও জোগাড় হয়ে গেল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তখনো দ্বিধাগ্রস্ত। কী করবেন স্থির করতে পারছেন না। কন্যাকুমারিকার শেষ শিলাখণ্ডে বসে নরেন্দ্রনাথ একদিন ভাবচক্ষে দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ইঙ্গিত করছেন সমুদ্রপারে যাওয়ার জন্যে। তবু নিশ্চিন্ত হন না নরেন্দ্রনাথ। শেষে মনস্থির করার জন্য চিঠি লিখলেন শ্রীমাকে। অনুমতি চাইলেন, তিনি যাবেন কিনা চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দিতে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আর কাউকে জিজ্ঞাসা না করে স্বামীজি এই পল্লীবাসিনী অশিক্ষিতা নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন যিনি হয়তো আমেরিকা কোথায় বা আমেরিকা বলে যে একটা দেশ আছে তাও জানতেন কিনা সন্দেহ।

প্রামাণ্য সূত্রে জানা যায়, স্বামীজির চিঠি পাওয়ার পর মাতৃস্নেহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। মা হয়ে কী করে ছেলেকে অজানা দেশে যেতে বলবেন? শেষরাতে স্বপ্ন দেখলেন, "ঠাকুর সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর নরেন্দ্রকে বলছেন অনুসরণ করতে। তখন মা অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে স্বামীজি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আঃ এতক্ষণে সব ঠিক হল, মা'র ইচ্ছা আমি যাই। এতক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিন্ত।

তেরো

ধর্ম মহাসম্মেলন যে বিবেকানন্দের কপালে বিশ্বজয়ের টীকা লেপনের জন্যই দৈব্যনির্ধারিত তা যেন শ্রীমা বুঝতে পেরেছিলেন। আমেরিকা দেশটি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণা তাঁর ছিল না, ছিল না ধর্ম সম্মেলন সম্বন্ধেও। তবু শ্রীমা অনুমতি দিলেন। ধর্ম মহাসম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরূপে নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন না। তাঁর সাগর পারের যাত্রা কাহিনীর একমাত্র পুঁজি ছিল সারদার আশীর্বাদ। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর শ্রীমাকে তিনি বলেছিলেন, 'মা, আপনার আশীর্বাদে এযুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি।' বক্তব্যটি বিস্তারের প্রয়োজন, স্বামীজির মতো যুক্তিবাদীর ভাষায় এ কি কোনো আবেগ। রামরাজ্যে রাবণ বধের জন্য হনুমান লাফিয়ে সাগর পার হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথও নিজেকে সেই ভূমিকায় দেখেছেন। এখানে দুই অবতার ও তাঁর পার্ষদ প্রসঙ্গ। কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপিণী সারদা। যিনি অগ্নির দাহিকা শক্তির মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব গঙ্গাকে উত্তাপ দিয়েছেন, আবেগ দিয়েছেন, দিয়েছেন নির্দিষ্ট একটি রূপ। চলার একটি ছন্দ। নরেন্দ্রনাথের কাছে রামকৃষ্ণ ও সারদা ছিলেন একই সত্তার দুটি মুখ। একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। বিশ্বজয় করে ফেরবার পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম যেদিন শ্রীমায়ের চরণ বন্দনা করলেন সেদিনের দৃশ্যটি শ্রীমায়ের ভ্রাতৃবধূর স্মৃতিকথায় এরকম ছিল, 'রাজার মতো চেহারা, ঠাকুরঝির পায়ে লম্বা হয়ে পড়ল; জোড়হাতে বলল—মা, সাহেবের ছেলেকে ঘোড়া করেছি, তোমার কৃপায়!'

এই দর্শনের আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায় কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন, 'মা তাঁর ঘরের দরজায় সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীজি তাঁর সামনে এসেই সোজা মাটিতে শুয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।..... কিন্তু সাধারণ রীতি অনুযায়ী তাঁর পাদস্পর্শ করলেন না। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত আমরা যারা স্বামীজির পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের কোমল কণ্ঠে বললেন, যাও মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো। কিন্তু কেউ তাঁর চরণ স্পর্শ কোরো না। তাঁর এতই করুণা, এতই কোমল তাঁর প্রকৃতি, এতই তিনি স্নেহময়ী যে যখন কেউ তাঁর পাদস্পর্শ করে তিনি তাঁর সর্বগ্রাসী করুণা, সীমাহীন ভালোবাসা এবং সমবেদনা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তার যাবতীয় দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নেন। তার ফলে তাঁকে নীরবে অপরের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হয়। ধীরে ধীরে একে একে তাঁর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও। মুখে কেউ কিছু না বলে তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে নীরবে তাঁর কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করো ও তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করো। তিনি সর্বদাই অতিলৌকিক স্তরে অবস্থান করেন এবং সকলের মনের কথা জানেন—তিনি অন্তর্যামিনী।

"আমাদের সকলের প্রণাম শেষ হলে গোলাপ-মা নীরবতা ভঙ্গ করে স্বামীজিকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন, 'মা জানতে চাইছেন, দার্জিলিঙে তোমার শরীর কেমন ছিল? বিশেষ উপকার হয়েছে কি?'

"স্বামীজি—হ্যাঁ, সেখানে অনেকটা ভালো ছিলাম।'......

গোলাপ মা—'মা বলছেন ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন। আর জগতের কল্যাণের জন্য তোমার আরও অনেক কাজ করতে হবে।'

"স্বামীজি—আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই, অনুভব করি এবং উপলব্ধি করি যে আমি ঠাকুরের যন্ত্র মাত্র। যেভাবে যেসব অসাধারণ বিরাট সব ব্যাপার ঘটছে আর যেভাবে ওদেশের মেয়ে-পুরুষ ঠাকুরের কাছে জীবন উৎসর্গ করতে এবং ঠাকুরের বাণী প্রচার করতে আমাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করার আগ্রহ দেখিয়েছে, তাতে আমি নিজেই কখনো কখনো অবাক হয়ে যাই। আমি মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলাম সেখানে আমার বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের মনে যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিলাম এবং তাদের কাছে যে অভাবনীয় সম্মান লাভ করেছিলাম তাতে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝেছিলাম যে, মায়ের আশীর্বাদের শক্তিতেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।"

নিজের জীবনের সাফল্যের সম্মুখে এসে মাতৃকরুণাকে বিস্মৃত করেননি বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি তর্ক করেছেন, একবগ্গা কথায় নিজের জেদে চলার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু শ্রীমায়ের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব ছিল ঠিক বিপরীত। সেখানে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত ছিল আত্মসমর্পণ ও শরণাগতের সুরে বাঁধা। বিবেকানন্দের দুরন্ত বজ্রকে যিনি নিয়ন্ত্রণে রাখেন তিনি কোন শক্তিতে শক্তিমান? নাকি তিনিই স্বয়ং শক্তি? যে শক্তির অঙ্গুলি হেলনে বিশ্বজগৎ ওলটপালট হয়ে যায়। গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে এইরকমই একটি আভাস দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন। অমনি হুপ করে পগার পার, এই বুঝ।' হুপ—অর্থাৎ আবার সেই হনুমানের প্রসঙ্গে। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথের ঘটন অঘটন পটীয়সী শক্তিকে মেনে নেবার নেপথ্য কাহিনীটিও শুনে নেওয়া যাক। তরুণ নরেন্দ্রনাথ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিশ্চিতরূপে জানিয়েছেন ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়। আর কোনো সাধকের মুখে এই প্রত্যয়ের বাণী উচ্চারিত হতে শোনেননি নরেন্দ্রনাথ। তাই বাঁধা পড়েছেন। এই সরল মানুষটি মাতৃভক্ত। মায়ের সঙ্গে নাকি তাঁর কথা হয়। মায়ের কাছ থেকে আদেশ পেয়েই তিনি সব কার্য সমাধা করেন। যুবক নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য। তাঁর কাছে ঈশ্বর 'সগুণ নিরাকার'। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ আরাধনাকে 'মাথায় খেয়াল' ছাড়া আর কিছু ভেবে পান না। তাই গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মাঝে মাঝেই দ্বন্দ্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বড় দুঃখ, 'নরেন মাকে মানে না'। কিন্তু এক্ষেত্রে শিষ্যের প্রতি গুরুর ভালোবাসার কিছু কমতি হয় না। শিষ্যের উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। পুরোহিত প্রাধান্য যুক্ত সমাজে এ এক বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রমী মনোভাব নিশ্চয়। কিন্তু মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের বিপুল তর্কের স্রোতে 'মা'কে ভেসে যেতে দেখে মনে মনে কষ্ট পান শ্রীরামকৃষ্ণ। দিন এইভাবেই এগিয়ে চলে। নরেন্দ্রনাথের পরিবারে হঠাৎ-ই নেমে

আসে বিপর্যয়। রইস পিতার পুত্র নরেন্দ্রনাথ মুহূর্তে যেন কাঙাল হয়ে যান। পারিবারিক দুর্গতির সঙ্গে সূত্রপাত হয় আর্থিক অসচ্ছলতা। নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—নিজের পুরুষকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হন তিনি। মনে পড়ে দক্ষিণেশ্বরের নিজগুরুর কথা, তিনি যেমন জগদম্বার কোনো আদেশ ব্যতীত অগ্রসর হন না। জগদম্বাও তাঁর আঁচলের ছায়ায় পালিত পুত্রটির কোনো কথা ফেলতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই উপস্থিত হন নরেন্দ্রনাথ, আপনি মাকে বলে দিন, যাতে আমার সংসারের একটা উপায় হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, তোর কথা মা শুনবে কেন? তুই মাকে জানিস না। তা তুই নিজে গিয়েই বল না। আজ শনিবার যা নিজেই যা না মায়ের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মতো নরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন দক্ষিণেশ্বরের গর্ভমন্দিরে, 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'—ব্রাহ্মসমাজের এই ধর্ম চেতনা কোথায় ভেসে গেল নরেন্দ্রনাথের, ভবতারিণীর সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবলেন নরেন্দ্রনাথ, 'মায়ের কাছে এসে সংসার সুখ চাইব?' নিজের মধ্যে সুপ্ত সংস্কার কোথায় ভেসে গেল তাঁর। করজোড়ে বললেন, 'মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক বৈরাগ্য দাও'। মায়ের কাছে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য কামনা করে বাইরে এলেন নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী, চেয়েছিস মায়ের কাছে?—না তো চাওয়া হয়নি। '—যা যা, আবার যা।' — এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে তিনবার গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু না, কোনোবারই তাঁর সংসার, স্বাচ্ছন্দ্য চাওয়া হল না। শেষবার নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকেই ধরলেন, 'আপনিই পারেন, এই রহস্যের সমাধান করতে।' হাসেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'আমি কে রে! যা, আজ থেকে তোর মোটা ভাত কাপড়ের আর অভাব হবে না।'—এইদিন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার রূপটি চিনে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'নরেন মাকে মেনেছিলেন'। সমস্ত রাত নাটমন্দিরে বসে মাতৃ সংগীতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ, কারও কারও মতে এইদিনই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গুহ্য মন্ত্রলাভ করেছিলেন। তবে সেই রাত্রের রহস্যময়তার আবরণ কোনোদিনই উন্মোচিত হয়নি। কারণ ঠিক কী ঘটেছিল। কোন রহস্যে নরেন্দ্র নামে বলগা ঘোড়াটিকে কাবু করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তা কোনোদিনই প্রকাশ করেননি নরেন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'সে রাতের রহস্য আমার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে, কেউ জানতে পারবে না কোনোদিনও।' না, জানতে পারা যায়নি। গুরুশিষ্য দুজনেই এ প্রসঙ্গে নীরব। তবু কোনো কোনো বিদগ্ধ সন্ন্যাসীর মনে হয়েছে, তবে কি এদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নবহতের রহস্যটি উন্মোচিত করেছিলেন নরেন্দ্রনাথের কাছে? জানিয়েছিলেন, যিনি ভবতারিণীরূপে মন্দির আলো করে রয়েছেন, তিনি নহবতে বধূরূপে তপস্যা করছেন।

দুই মাতৃরূপের মধ্যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ। যেন সংযোগ-সূত্র! শ্রীমায়ের প্রকৃত রূপটি নরেন্দ্রনাথের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল সেদিন। সেইজন্যই হয়তো নরেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন শ্রীমায়ের দেবীরূপের সম্বন্ধে সেইজন্যই তিনি শ্রীমা সম্বন্ধে, বারংবার সচেতন করেছেন সবাইকে। সেইজন্যই হয়তো নরেন্দ্রের জ্ঞানের পথ, বিতর্কের তর্কজাল রুদ্ধ হয়ে যেত এই এক উপস্থিতির কাছে।

সেইজন্যই নরেন্দ্রনাথ জীবন জ্বালায় জ্বলতে ও বলতে বারংবার ছুটে গিয়েছেন সারদার কাছে শান্তিজল আহরণের জন্য। সারদা তাঁর কাছে ছিল প্রেরণার আরেক নাম, সাধনার অপর বিগ্রহ।

স্বামীজি বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর গিরিশ ঘোষ তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী লিখতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে স্বামীজি বলেছিলেন 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এত মহান ছিলেন, এত বড় ছিলেন যে, আমি তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁর জীবনের এক কণাও আমি জানতে পারিনি। শেষে শিব গড়তে গিয়ে কি বানর গড়ে ফেলব? আমি তা পারব না।' মায়ের জীবনী-লেখার কাজে হাত দিতেও তিনি ভয় পেতেন। একটি চিঠিতে গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজি লিখছেন : সান্ডেল (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) আমাকে তিন পাতা লেকচার দিয়েছে যে, মা ঠাকুরানিকে ভক্তি করতে হবে এবং তিনি আমায় কত দয়া করেন।

'সান্ডেলের এই মহা আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ। তাঁর (শ্রীমায়ের বিষয়ে) একটা কিছু লিখব মনে করি, কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে যাই। যাক, তাঁর ইচ্ছা হয় তো কালে কালে হবে।'

বিবেকানন্দ যে জীবন চিত্র অঙ্কনে ভীত হন, সে জীবনকে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীরূপে সীমাবদ্ধ করা যায় কি? তাঁর অবগুণ্ঠনের আড়ালে একটি মুক্তসত্তা ছিল। মাতৃরূপে যাঁর বিরাট প্রকাশ ঘটেছিল। 'মা' মন্ত্রকে যিনি বিশ্বজগতের কাছে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। তিনি শ্রীমা, আমাদের 'মা'।

চোদ্দ

১৯০১ সালে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম দুর্গাপূজার সূচনা করেন। স্বামীজির প্রিয় গৃহী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, 'বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে আচার ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন বিলাত প্রত্যাগত স্বামীজি কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বদা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদির বাছ বিচার নাই—প্রধানত এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ওই কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দু নামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চলতি নৌকার আরোহীগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাশা করিতে এবং এমনকী সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামীজির অমলধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না'। —বেলুড় মঠ বোধহয় হিন্দুভাব থেকে সরে এসেছে—এইরকম একটি ধারণা জনসাধারণের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। মানুষের মনে সেই ধারণাকে ভাঙবার জন্য এবং বেলুড় মঠ হিন্দু ভাবধারার বিরোধী নয়—একথা প্রতিপন্ন করার জন্য দুর্গাপূজার আয়োজন করেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজির বেলুড় মঠে পূজা প্রচলন করার পিছনে দ্বিতীয় কারণটি তাঁরই এক গুরুভ্রাতার অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন। তিনি একদিন দেখেন সাক্ষাৎ মা দশভুজা দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে বেলুড় মঠের দিকে আসছেন। গুরুভাইয়ের মুখে এ সংবাদ শুনে স্বামীজি উৎসাহিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, যেমন করেই হোক, এবার মঠে পুজো করতেই হবে।

স্বামীজি যখন পুজোর সিদ্ধান্ত নিলেন তখন শারদীয়া পূজার আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। সেদিনই স্বামীজির নির্দেশে একজন সন্ন্যাসী গেলেন কলকাতার কুমোরটুলিতে প্রতিমার বায়না করতে, আর একজন গেলেন বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে মঠে দুর্গাপুজোর অনুমতি আনতে। মাতৃ আদেশ ভিন্ন পূজা করা যায় না। স্বামীজির কাছে শ্রীমাই যে 'জ্যান্ত দুর্গা'। তাঁর আদেশই চরম। শ্রীমা পুজোর অনুমতি দিলেন। স্বামীজিও মহা উদ্যমে পূজার নানা বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর মাধ্যমে স্মৃতিকার রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' গ্রন্থটি সংগ্রহ করলেন। যার মধ্যে বিবৃত রয়েছে দুর্গাপূজার আচার অনুষ্ঠান। পুস্তকটি পাঠ করে স্বামীজি সকলকে জানালেন, নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমস্' (অর্থাৎ বলির রক্ত দিয়ে দেবীকে ধুইয়ে দেব) মা'র ইচ্ছা হয় তো তাও করব। স্বামীজির ইচ্ছা শুনে সকলে প্রমাদ গুনলেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। অথচ মঠে পশুবলি হোক, এ ঘটনা অনেকেরই মনঃপুত নয়। অবশেষে স্বামীজিকে বলা হল, স্বামীজি বলির ব্যাপারে শ্রীমায়ের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন নয় কি? সঙ্গে সঙ্গে বালক স্বভাব স্বামীজি বললেন, 'হ্যাঁ, চলো মায়ের কাছে। মঠে বলির প্রসঙ্গ শুনে শ্রীমা বলে পাঠালেন; তোমরা সন্ন্যাসী, সকল জীবকে অভয়দান করবে। তোমাদের হাতে পশুবধ হওয়া উচিত নয় বাবা। মায়ের আদেশমাত্র

সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা পরিহার করলেন স্বামীজি। মঠে বলি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য পূজার অঙ্গস্বরূপ পশুবলি না হলেও কুমড়ো বা আখ বলির প্রচলন রয়েছে।

বেলুড় মঠের শারদীয়া দুর্গাপূজায় প্রথমবার পূজকের আসন অলংকৃত করেছিলেন কৃষ্ণলাল নামে জনৈক নবীন ব্রহ্মচারী। আর তন্ত্রধারক হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজির পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিল্ববৃক্ষে দেবীর অধিষ্ঠান, বোধনের দিন এখানেই স্বামীজির প্রিয় একটি আগমনী গান গাওয়া হল। স্বামীজি প্রায়ই মঠের ওই বেলগাছের পাশে বসে গাইতেন একটি আগমনী গান। যে গানটি মঠের পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আজও বোধনের দিন এই গানটি গাওয়া হয়। গানটি হল :

"গিরি গণেশ আমার শুভকারী,
পুজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি।।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী
আসবে কত দণ্ডী জটাজূটধারী।।"

মঠের প্রথম পূজার গুরুত্বপূর্ণ সাধনা হল শ্রীমায়ের পূজায় উপস্থিতি। বোধনের আগের দিনই শ্রীমা বেলুড়ে এলেন। মঠের পাশে একটি ভাড়া বাড়িতে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। এ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্তগণ নিমন্ত্রিত ছিলেন। এই পূজার পর থেকেই আশেপাশের ব্রাহ্মণদের বেলুড় মঠের প্রতি বিদ্বেষ কমতে থাকে। বেলুড় মঠের সেই প্রথম দুর্গাপুজোর একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে স্বামীজির গৃহী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, 'মহা সমারোহে দিনত্রয় ব্যাপী মহোৎসবে কল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তানতরঙ্গ গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক ঢোলের রুদ্রতালে কলনাদিনী ভাগীরথী নৃত্য করিতে লাগিল। 'দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্' কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্ন্যাসীগণের মুখে ঐ তিনদিন আর কোনো কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে পূজায় সাক্ষাৎ শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী উপস্থিত, যাহা স্বামীজির সঙ্কল্পিত দেহধারী দেবসদৃশ মহাপুরুষগণ যাহার কার্য সম্পাদক, সে পূজা যে অচ্ছিদ্র হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? দিনত্রয়ব্যাপী পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। গরীব দুঃখীর ভোজন—তৃপ্তিসূচক কলরবে মঠ তিনদিন পরিপূর্ণ হইল'।

উদ্বোধন পত্রিকার (১৩৬০-৬১ ৯ম সংখ্যা) কুমুদবন্ধু সেন বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজার একটি মনোজ্ঞ স্মৃতিচারণ উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, '৩১শে আশ্বিন (১৭ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার মঠের সাধু ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রী দুর্গা প্রতিমা নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুলিলেন। ধীরে ধীরে যত্ন সহকারে ঠাকুর ঘরের নিচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ পর প্রবল বৃষ্টি—আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল। মঠের জমিতে উত্তরদিকে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসবে এখন বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়—সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। সেইরূপ সাবধানের সঙ্গে মণ্ডপটি তৈয়ার করা হইয়াছিল।

"স্বামীজির কণ্ঠনিঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীমাও এইদিন কলিকাতা বাগবাজার হইতে অন্যান্য পরিজনবর্গ ও ভক্তদের লইয়া গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনা হইল। কলিকাতা হইতে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত আসিয়াছিলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল।

"প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে অর্চনায় সমাপার্শ্বে দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত রুদ্রাক্ষ মালা পরিশোভিত তেজোদীপ্ত কাষায় বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন তখন দর্শনার্থীরা তন্ময়চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে রসুনচৌকীর সানাই মধুর সুরে নানা রাগিণীতে বাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া মহামায়ীর পূজাবার্তা বীরগর্বে ঘোষণা করিতেছিল। বালি উত্তরপাড়া বেলুড়ের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুদের সম্বন্ধে কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি কেহ কেহ ফল প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু মঠে যোড়শোপচারে শ্রীশ্রীদুর্গামন্ত্র শাস্ত্রবিহিত বিস্তারিত পূজা, আনুপূর্বিক সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব পরিবেশ—আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হইয়াছিল। তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া পূজায় পশু বলিদান হয় নাই। ভক্তেরা দেখিতেছেন—একদিকে দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী অসুরদলনী দশভুজা—দক্ষিণে সর্বৈশ্চর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ বামে পরাবিদ্যাস্বরূপিনী জ্ঞানদাকমলদলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপরদিকে স্বয়ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রী জগজ্জননী মাতৃরূপে অবতীর্ণা উপাস্য ও উপাসিকভাবে পূজা মণ্ডপে বিদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া আনন্দরাম ভক্তদের হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল।"

১৯০১-এর সেই শারদীয় পূজায় বেলুড় মঠে এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। মহাষ্টমীর দিন স্বামীজি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীমা এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কী, 'মা আমার জ্বর করে দাও'। ওমা বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি 'ওমা একী হল এখন কী হবে?' নরেন বললে, 'কোনো চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এইজন্যে যে ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথায় কী ত্রুটি হবে, আমি রেগে যাব, বকব, চাই কী দুটো থাপ্পড় দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম কাজ কী, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতে আমি বললুম, 'ও নরেন এখন তাহলে ওঠো।' নরেন বললে, 'হ্যাঁ মা এই উঠলুম আর কী'—বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল। মা ও পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের চমকপ্রদ অনুভূতির সৃষ্টি করে। দুর্গাপূজার আনন্দ উৎসবের মধ্যেও এক অপার্থিব অলৌকিক অস্তিত্বের প্রকাশ।

শ্রীমায়ের জীবনে অনেক ঘটনাই পাওয়া যায় যেখানে তিনি সেই ভোলানাথের গৃহিণী পার্বতীরূপে নিজেকে প্রকাশিত করছেন। জয়রামবাটীর কাছে দেশড়া গ্রামের হরিদাস নামে

এক বৈরাগী প্রায়ই শ্রীমায়ের বাড়িতে একটি আগমনী গান গাইত। গানের প্রতিটি লাইনে যেন শ্রীমায়ের জীবন ব্যক্ত হয়েছে। এই ভাববাহী গানটি ছিল এইরকম :

"কী আনন্দের কথা উমে (গো মা)
(ও মা) লোকমুখে শুনি সত্য বল শিবানি
অন্নপূর্ণা নাম তোর কী কাশীধামে?
অপর্ণে তোমায় যখন অর্পণ করি
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী
এখন নাকি তাঁর দ্বারে আছে দ্বারী
দেখা পায় না তাঁর ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে॥
খ্যাপা খ্যাপা আবার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে।
এখন নাকি তিনি রাজা কাশীপুরে,
বিশ্বেশ্বরী তুই বিশ্বেশ্বরের বামে॥"

এই গান শুনে চোখের জলে ভাসতেন শ্রীমায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবী। সত্যিই কত দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে সারদাকে। সকলেই সারদার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, মায়ের মন তাই কন্যার ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। তাই যতবারই তিনি গানটি শুনতেন, ততবারই তাঁর চোখ জলে ভরে উঠত। কখনো কখনো কাউকে বলতেন, হ্যাঁগো তখন সকলেই জামাইকে খেপা বলত, সারদা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। আমায় কত কথা শোনাত, মনের দুঃখে মরে যেতুম আর আজ দেখো, কত বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবীজ্ঞানে সারদার পা পূজা করছে। কেবলমাত্র ভক্ত রসিক ভানুপিসি বলতেন, 'বউ ঠাকরুন তোমার জামাই শিব, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—এখন যা বিশ্বাস করতে পারছ না, পরে পারবে বলে রাখছি।' সত্যিই পরে তা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু এই গান শুনে মহাকবি গিরিশচন্দ্রেরও চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়েছে। আর স্বয়ং শ্রীমা তাঁর চোখের দুফোঁটা অশ্রু আমাদের জানায় সত্যিই তিনি জগজ্জননী। দেবীর মর্তে অবতরণ আমরা বিশ্বাস হয়তো করি না। আমাদের যুক্তিবাদী মন কোন অজানা অস্তিত্বের অবতরণ সম্বন্ধে সন্দিহান হয় বারংবার। কিন্তু মানুষের উত্তরণে আমরা বিশ্বাসী। জয়রামবাটীর দলঘাস কাটা বিধবা ব্রাহ্মণী নিজের জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিও প্রসারিত করেছিলেন। নিজের মধ্যে প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন জগৎজননীর রূপ। সেই সীমাহীন গণ্ডিহীন ভালোবাসা দেখেই যুক্তিবাদী দেবত্বে উত্তরণের কথা বলে আর ভক্তিবাদী দেখে দৈবীসত্তার বাস্তবে অবতরণকে। দুদিক দিয়েই দেবীরূপে মা প্রকাশিত হলেন।

পনেরো

অন্ত্যলীলার সূচনা

স্বামী যোগানন্দের মৃত্যুর পর স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের সেবার ভার গ্রহণ করলেন। স্বামী সারদানন্দের মাতৃসান্নিধ্যে আসবার মূল কারণ ছিল স্বামী যোগানন্দের প্রেরণা। স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন, একদিকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ অপরদিকে কর্মযোগের কথা বলে চলেছেন। যেদিন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা হচ্ছে সেদিন অন্য কোনো ভাবের প্রকাশ হচ্ছে না, পরের দিনই হয়তো ভক্তিযোগের প্রাবল্যে ভেসে গেলেন বিবেকানন্দ। প্রখর সূর্যের তাপ যেন সাধুভাইরাও সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে লিডার করে দিয়েছেন। নরেনের কথা ফেলতেও পারেন না তাঁরা। এইরকমই এক দ্বন্দ্বের মুহূর্তে স্বামী সারদানন্দজি যোগানন্দজিকে বলেছিলেন, 'যোগীন, নরেনের সব কথা তো বুঝতে পারি না; কতরকম কথা বলে—যখন যেটাকে ধরবে, তখন সেটাকে এমন বড় করবে যে, যেন অপরগুলো একেবারে ছোট হয়ে যায়।' সারদানন্দজির কথা শুনে স্বামী যোগানন্দ বললেন, 'শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর; তিনি যা বলবেন, তাই ঠিক।' কেবল উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না যোগানন্দ, তিনি সারদানন্দজিকে শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। এই যোগাযোগ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকল।

স্বামী যোগানন্দের চারমাস পরে ১৮৯৯-এর ২রা আগস্ট শ্রীমায়ের জীবনে আরেকটি মৃত্যু দাগ কেটে গেল। শ্রীমায়ের অতি প্রিয় ছোট ভাই অভয় বিসূচিকা রোগে মারা গেলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারি পড়েন এবং মৃত্যুর অল্পদিন আগেই তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষাটি দিয়েছিলেন। এই মৃত্যু শ্রীমায়ের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। পরবর্তীকালে নিজের ছোট ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করে বলতেন, 'এরা সব মুখ্যু হয়ে বেঁচে থাক।' এতে যদি কোনো ভ্রাতৃজায়া আপত্তি করে বলতেন, 'ওইরকম আশীর্বাদ করে নাকি?' তবে শ্রীমাও ম্লান মুখে বলতেন, 'হ্যাঁরে, হ্যাঁ! তোরা কী জানিস?' অভয়কে মানুষ করলুম, অভয় চলে গেল।' ছোট ভাই অভয়ের চলে যাওয়া শ্রীমায়ের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ।

দেহত্যাগের সময় শ্রীমার কোলে মাথা রেখে অভয় অনুরোধ করেছিলেন, 'দিদি, সব রইল—দেখো।' অভয়চরণের স্ত্রী সুরবালা তখন অন্তঃসত্ত্বা। স্বামীর মৃত্যুর পরেই শৈশবে মাতৃহারা সুরবালার শেষ সম্বল দিদিমা ও মাসিমাও হঠাৎ মারা গেলেন। তিনটে বড় শোকে সুরবালার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। পাগল অবস্থাতেই ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি সুরবালা এক কন্যা প্রসব করলেন। কন্যার নাম হল রাধারানি—সংক্ষেপে রাধু বা রাধী। শ্রীমায়ের জীবনে পাগলি মামি ও রাধারানি এক গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য অস্তিত্ব। ভাবতে অবাক লাগে স্বামী সারদানন্দজি ভারীরূপে কর্মগ্রহণ ও রাধারানির জন্ম প্রায় একসময়। অবশ্য

এখানে মনে রাখতে হবে, স্বামী যোগানন্দের পর স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বেশ কিছুদিন মাতৃসেবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের সময় স্বামী সারদানন্দ স্বামীজির আদেশে অর্থ সংগ্রহের জন্য পশ্চিম ভারতে গিয়েছিলেন। এই সময় 'উদ্বোধন' নামে রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্রের সূচনা হয়েছে। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজি এই পত্রের দায়িত্বে ছিলেন তিনিই এই সময়ে কয়েকমাস শ্রীমায়ের সেবা করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনিই শ্রীমায়ের সেবা করেন।

শ্রীমায়ের প্রতি অগাধ ভক্তি ছিল ত্রিগুণাতীতানন্দজির। তাঁর মাতৃভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ এক কাহিনী শোনা যায়। যোগীন মা একবার তাঁকে শ্রীমায়ের জন্য বাজার থেকে লঙ্কা কিনে আনতে দেন। শ্রীমায়ের জন্য লঙ্কা কেনার বাসনায় এবং সবথেকে ঝাল লঙ্কা কেনার ইচ্ছায় ত্রিগুণাতীতানন্দজি বিভিন্ন বাজারে লঙ্কা চাখতে চাখতে বাগবাজার থেকে বড়বাজারে উপস্থিত হলেন। বড়বাজারে যখন সর্বাধিক ঝাল লঙ্কা পাওয়া গেল ততক্ষণে তাঁর জিব ঝালের চোটে ফুলে উঠেছে।

শ্রীমায়ের ক্ষেত্রে ত্রিগুণাতীতানন্দজি আবেগপ্রবণ ছিলেন। তাঁর আবেগপ্রবণ মনেরই একটি কাহিনী। — ছোটভাই অভয়ের মৃত্যুর পর শ্রীমা ৩০শে অক্টোবর বর্ধমানের পথে দেশে ফিরে চললেন। তিনি চলেছেন গরুর গাড়িতে আর স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ একটি লাঠি হাতে চলেছেন পাশে পাশে। দিনের আলো নিভে গিয়ে জ্যোৎস্না ধোয়া রাত্রি নেমে এল। হঠাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দজি দেখলেন বানের জলে পথের এক জায়গা এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে যে সেই জায়গাটি অতিক্রম করলে গাড়ি উলটে যাবে। কিংবা বিষম ঝাঁকুনি লেগে শ্রীমায়ের নিদ্রার ব্যাঘাত হবে। তিনি কালবিলম্ব না করে গর্তের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং গাড়োয়ানকে তাঁর স্থূল, সবল দেহের উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে বললেন। কিন্তু অঘটন ঘটে যাওয়ার আগেই শ্রীমা টের পেলেন। এবং তৎক্ষণাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দজিকে উঠিয়ে নিজে হেঁটে সেই গর্তটি পার হলেন। এরকমই মাতৃভক্তির অভূতপূর্ব নিদর্শন আমরা ত্রিগুণাতীতানন্দজির জীবন থেকে পাই।

ত্রিগুণাতীতানন্দজির পরে এলেন স্বামী সারদানন্দ। আমরা বলেছি স্বামী সারদানন্দের আগমন ও রাধারানির জন্ম দুই-ই শ্রীমায়ের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর শ্রীমায়ের সংসারে আর কিছুই ভালো লাগছে না। মন বলছে, 'আর আমার এ সংসারে থেকে কী হবে?' এইসময় হঠাৎ দেখলেন, একটি লাল কাপড় পরা দশ-বারো বছরের মেয়ে যেন সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, 'একে আশ্রয় করে থাকো। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।' এই কটি কথা বলেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। এই দর্শনের পর বহুদিন কেটে গেছে। শ্রীমা এসেছেন জয়রামবাটীতে। ভাই বউ সুরবালা তখন বদ্ধ উন্মাদ। রাধারানি বা রাধু তখন ছোট। হঠাৎ শ্রীমা দেখলেন সুরবালা কতগুলি কাঁথা বগলে করে টানতে টানতে চলেছেন আর রাধু তাঁর পিছন পিছন হামা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। এই দৃশ্য দেখামাত্রই শ্রীমায়ের বুকের ভিতর কেমন করে উঠল। তিনি ভাবলেন, তাই তো, একে আমি না দেখলে আর কে দেখবে। বাবা নেই, মা ওই পাগল!' তিনি ছুটে গিয়ে শিশুটিকে কোলে তুলতেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখা দিয়ে

বললেন, 'এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে থাকো, এটি যোগমায়া।' শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ শিরোধার্য করলেন।

স্বামী সারদানন্দের সেবকরূপ গ্রহণ ও রাধুর জন্ম শ্রীমায়ের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের পর লোক কল্যাণমুখী শ্রীমায়ের মন সঙ্ঘ গঠনের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছে বেশি। কারণ, এই পর্যায়েই বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত ভাবাদর্শকে বিশ্বের কাছে স্থাপন করেছিলেন আর নবযুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য মঠের সূচনা করলেন। এই পর্যায়ে সঙ্ঘজননীরূপে ও সঙ্ঘের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য শ্রীমায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু সঙ্ঘকে এখন তিনি প্রসব করে ফেলেছেন, এরপর ১৯০২ সালে নরেন্দ্রনাথও জগৎ ছেড়ে চলে যাবেন—এর পরের পর্যায়ে একটি ভাবান্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্ব কে আছে? এ ছাড়া বহু তাপিত মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনল মাতৃভাবকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে—তাই ভাইদের সংসারকে অবলম্বন করেও রাধারানিকে অবলম্বন করে শ্রীমায়ের নতুন প্রকাশের সূচনা হল। যে প্রকাশ জগতের কাছে এক বিরল ভাবপ্রবাহের নজির রেখে গেল।

শ্রীমায়ের জীবনে এই কালে দেবীভাব ও মানবীভাবের এক বিরল সমন্বয় দেখা যায়। তৎকালে তাঁর পিতৃগৃহের সংসারটি ছিল এইরকম, কালী, প্রসন্ন এবং বরদা—এই তিন ভাইয়েরই মূল লক্ষ্য ছিল টাকা। শ্রীমা যখন কলকাতায় থাকতেন তখন অর্থ আকাঙ্ক্ষা করে ক্রমাগত চিঠি দিতেন ভাইরা। সেই চিঠি পড়ে কেউ হয়তো মন্তব্য করতেন, 'মা তাঁদের খুব করে টাকা দাও। ঠাকুরকে বলো। বেশ ভোগ করুক, যাতে নিবৃত্তি হয়।' এর উত্তরে শ্রীমা বলতেন, 'ওদের কি আর নিবৃত্তি আছে? ওদের কিছুতেই নিবৃত্তি হবে না—শত দিলেও না। সংসারী লোকদের কি আর নিবৃত্তি হয়? ওদের ওখানে কেবল দুঃখের কাহিনী। কেলেটাই (কালীমামা) কেবল টাকা টাকা করে। আবার ওর দেখাদেখি প্রসন্নও এখন করছে। বরদা কখনো চায় না—বলে, দিদি কোথায় টাকা পাবে?' কোনো কোনো সময় ভাইদের সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বাবা ওরা কেবল টাকা টাকা করেই গেল। কেবল 'ধন দাও, ধন দাও'—ভুলেও কখনো জ্ঞানভক্তি চাইলে না। যা চাচ্ছিস তাই নে।'

শ্রীমায়ের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে কোনো সম্যক উপলব্ধি ভাইদের ছিল না। একদিন প্রসন্নমামা শ্রীমাকে বলেছিলেন, 'দিদি, শুনলুম তুমি নাকি কাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছ, তাকে মন্ত্র দিয়েছ, আবার এও বলে দিয়েছ, যে, তার মুক্তি হবে। আর আমাদের তুমি কোলে করে মানুষ করেছ—আমরা কি চিরদিনই এমনি থাকব? মা উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন, 'ঠাকুর যা করবেন তাই হবে। আর দেখ, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকদের সঙ্গে কত খেলেছেন, হেসেছেন, বেড়িয়েছেন, তাঁদের এঁটো খেয়েছেন; কিন্তু তারা কি জানতে পেরেছিল কৃষ্ণ কে?' প্রসন্নমামা আরেকদিন শ্রীমাকে বলেন, 'দিদি, একপেটে জন্মেছি; আমাদের কী হবে?' শ্রীমা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, 'তা তো বটেই; তোদের ভয় কী?'

শ্রীমাকে কেন্দ্র করে ভাইদের মধ্যে একটি নীরব দ্বন্দ্বেরও দেখা পাওয়া যায়। ১৩১৪ সালে গিরিশ ঘোষের বাড়িতে দুর্গাপূজায় যোগদান করে জয়রামবাটী ফিরছেন শ্রীমা। তখন কোয়ালপাড়া গ্রাম হয়ে আমোদর নদী পেরিয়ে জয়রামবাটীতে আসতে হত। শ্রীমা সন্ধ্যায় নদী

পার হওয়া অসুবিধাজনক হবে বলে মামাদের আগে থেকেই খবর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়া থেকে আমোদরের তীরে এসে দেখা গেল ভাইদের কেউই উপস্থিত নেই। বহু কষ্ট করে নদী পার হতে হত। একজন ভক্ত মাকে বললেন, 'মা, দেখলেন এঁদের (মামাদের) কী আক্কেল! আপনি এলেন, তা একটি লোকও নদীর ধারে পাঠালেন না।' শ্রীমা জয়রামবাটীতে পৌঁছে প্রসন্নমামাকে প্রশ্ন করলেন, 'এই যে আমি এলুম, তুই নদীর ধারে লোক পাঠালি না কেন? আমার এই ছেলেগুলি এল। তুই একটি লোকও পাঠালিনে, নিজেও গেলিনে।' মামা উত্তর দিলেন, 'দিদি, আমি কালীর ভয়ে পাঠাইনি—পাছে কালী বলে, 'দিদিকে হাত করে নিতে যাচ্ছে।' আমি কি বুঝি না, তুমি কী বস্তু, আর এঁরা (ভক্তরা) কী বস্তু? সব জানি, কিন্তু কিছু করবার সাধ্য নেই। ভগবান এবার আমাকে সে ক্ষমতা দেননি। এই আশীর্বাদ করো, যেন তোমাকে এবারে যেভাবে পেয়েছি, এইভাবেই জন্মে জন্মে পাই; অন্য আর কিছু চাইনে।' শ্রীমা উত্তরে বললেন, 'তোদের ঘরে আর? এই যা হয়ে গেল। রাম বলেছিল, 'মরে যেন আর না জন্মাই কৌশল্যার উদরে। আরও তোদের মধ্যে!' গিরিশ ঘোষ শ্রীমায়ের পিতৃগৃহের এই সংসার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে মামারা পূর্বজন্মে মাথাকাটা তপস্যার ফলে সারদা রূপিণী স্বয়ং জগদম্বাকে ভগিনীরূপে লাভ করেছিল।

শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে থাকতেন তখন তাঁকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হত। হাঁড়ি হাঁড়ি ধান সেদ্ধ, ঢেঁকিতে সেই ধান ভানা, সঙ্গে সঙ্গে রান্না বাসন মাজা, জল তোলা সবই আছে। জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় বাসন মাজার জন্য তিনি জয়রামবাটী যেতেন। আবার কেবল ভাইরা নয়, ভাইঝিদের অত্যাচার ও অবুঝপনা শ্রীমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। ছোট ভাইয়ের মেয়ে রাধারানি ও তাঁর পাগল মা সুরবালা একদিকে আর একদিকে প্রসন্নমামার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুই কন্যা নলিনী ও মাকু। এঁরা দুজনেও ছিলেন বাতিকগ্রস্ত। একটি পাগলের সংসার নিয়ে ব্যবহারিক দিক দিয়ে বেঁচেছিলেন কিন্তু এর মধ্যেও ছিল আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অপূর্ব এক স্ফুরণ।

ষোলো

১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনে এক বিশেষ দুঃখময় দিন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের নরেন সেদিন ইহজগৎ ত্যাগ করে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণী সফল হল, 'ও যখন নিজেকে জানতে পারবে তখন ও এ দেহ ত্যাগ করে চলে যাবে।' বিশ্ববন্দিত-বিবেকানন্দ তাঁর দেহকে ছেড়ে চলে গেলেন অতীন্দ্রিয় জগতে, এক গুরুভাই স্বপ্নে দেখলেন নরেন্দ্র তাঁকে বলছেন, দেহটাকে থুতুর মতো ফেলে দিয়েছি।

চিকাগো সম্মেলন থেকে মহাসমাধি পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে একটি অধ্যায় রচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে তিনি একাধারে আচার্য, সংগঠক, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, রেনেসাঁর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই কয়েকটি বছর (১৮৯৩-১৯০২) স্বামীজির জীবনের যেমন বিশেষ অধ্যায় ঠিক তেমনই আমরা দেখি শ্রীমায়ের জীবনও এই অধ্যায়ে সঙ্ঘজননীরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারানির জন্ম ১৯০০ সালে। সুতরাং রাধারানিকে কেন্দ্র করে ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত যোগমায়াকে কেন্দ্র করে শ্রীমায়ের লীলার প্রকাশ বিবেকানন্দের শরীর চলে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে শ্রীমায়ের জীবন যেন সুনিপুণভাবে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর জয়রামবাটীতে কন্যারূপে বেড়ে ওঠা, ও দক্ষিণেশ্বরের নীরব তপস্যার দিনগুলি ছাপিয়ে পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক অদ্ভুত জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে তিনি অবগুণ্ঠিতা, স্বামীর মিলনে ও বিরহে ব্যাকুলা, আবার গড়ে ওঠার নিটোল এক অধ্যায় এটি। মনে প্রশ্ন জাগে, পঞ্চতপা অনুষ্ঠানটি বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়িতেই অনুষ্ঠিত হল কেন? কত ভক্তগৃহ ছিল, মা তীর্থ ও ভ্রমণ করেছেন এসময়—সেই পুণ্যতীর্থেও পুণ্যকর্ম সংঘটিত হতে পারত। কিন্তু তা না হয়ে বেলুড় গ্রামটিই কেন দৈব পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট হল। পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই যেন লোককল্যাণের বীজ রোপিত হল সকলের নীরবে। কে জানত এই ভাড়াবাড়িটির পাশেই ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে বিশাল আধ্যাত্মিক ভাবনার কেন্দ্র—বেলুড় মঠ।

স্বামীজি বিদেশযাত্রা করেন ১৮৯৩-এর ৩১ মে। এই বছরই নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে শ্রীমায়ের এক অদ্ভুত দর্শন হয়। তিনি দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ যেন দ্রুত এসে গঙ্গায় মিশে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী বিবেকানন্দ এসে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলতে বলতে দুই হাতে সেই জল চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। শ্রীমা দেখতে পেলেন, সেই জলের স্পর্শে অগণিত নরনারী সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।—শ্রীমায়ের এই দর্শন প্রতীকী ঘটনা। বাস্তবিকই শিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে কিছুদিনের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারাকে জগতে প্রচার করেছিলেন। সেই নতুন ভাবধারার মন্ত্রে ও শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে বহু মানুষ জীবনদর্শনের নতুন ধারাকে খুঁজে পেল। খুঁজে পেল এক নতুন আত্মসংস্কৃতি। সুতরাং 'পঞ্চতপা' অনুষ্ঠানের

মধ্য দিয়ে কেবল লোক কল্যাণের বীজ রোপিত হল না, শিকাগো বক্তৃতার পরবর্তী অধ্যায়ে সঙ্ঘ গঠন ও ভাবপ্রচারের ভিত্তিভূমিও স্থাপিত হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশ যাওয়ার পিছনেও শ্রীমায়ের গভীর প্রেরণা নিহিত ছিল। স্বামীজি যখন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করছিলেন তখন আমেরিকার শিকাগো শহরে এক ধর্ম মহাসম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। স্বামীজির গুণমুগ্ধ একদল ছাত্র তাঁকে ধরলেন তিনি যেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে ওই মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। প্রয়োজনীয় অর্থ প্রস্তুত কিন্তু বিবেকানন্দ তখনো দ্বিধাগ্রস্ত। কী করবেন ঠিক করতে পারছেন না। শেষে ভাবলেন, 'আচ্ছা, শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই অংশ স্বরূপিনী, তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয় না? তিনি যেরূপ বলবেন, সেরূপই করব।' মাকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন কী তাঁর কর্তব্য। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আর কাউকে জিজ্ঞাসা না করে স্বামীজি এই পল্লিবাসিনী অশিক্ষিতা নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন যিনি হয়তো আমেরিকা কোথায় বা আমেরিকা বলে যে একটা দেশ আছে তাও জানতেন কিনা সন্দেহ। প্রামাণ্য সূত্রে জানা যায়, স্বামীজির চিঠি পাওয়ার পর 'মাতৃস্নেহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে' দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। মা হয়ে কী করে ছেলেকে অজানা দেশে যেতে বলবেন? শেষে রাতে স্বপ্ন দেখলেন : ঠাকুর সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর নরেন্দ্রকে বলছেন তাঁকে অনুসরণ করতে। তখন মা অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে স্বামীজি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন : 'আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল; মারও ইচ্ছা আমি যাই।' এতক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিন্ত।' (শতরূপে সারদা, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪)।

আমেরিকায় শিকাগো সম্মেলনে স্বামীজির বিজয় সকলেরই জানা। স্বামীজি বলেছিলেন, 'মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম। দেখলাম, সেখানকার মানুষ আমার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে, আমাকে বিপুল সংবর্ধনা জানাচ্ছে, তখন বুঝলাম, মার আশীর্বাদের জোরেই এই অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে।' শ্রীমা জানতেন যে, স্বামীজির পাশ্চাত্য বিজয়ের মধ্য দিয়ে ঠাকুরের কাজই সাধিত হয়েছে। তাই তিনি স্বামীজিকে বললেন যে, ঠাকুরই তাঁর ভিতর দিয়ে এসব করছেন; স্বামীজি তাঁর (ঠাকুরের) চিহ্নিত শিষ্য এবং সন্তান। জানা যায়, স্বামীজি সেদিন মায়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন যাতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তিনি একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারেন। মা স্বামীজিকে সেই আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, ঠাকুর অচিরেই তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। (Prabuddha bharata, Vol.LVII, 1952, PP. 409-410)

সঙ্ঘজননীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা আজ আমরা বর্ণনা করতে সক্ষম হলেও তৎকালে এই ভূমিকা ছিল নীরব। জনৈক বিদগ্ধ সন্ন্যাসী বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অসাধারণ কাহিনী। কারণ পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত এবং পুরুষদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ও সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠান—তার মাথার উপরে বিরাজ করছেন একজন নারী। কিন্তু এই নারী কোনো সন্ন্যাসিনী নন, ইনি একজন গৃহী। শ্রীমা যখন ছিলেন তখন রামকৃষ্ণ মিশন একটি পৃথিবীখ্যাত বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সন্ন্যাসী আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রথম অর্থাৎ শৈশব অবস্থায় এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণ সক্রিয়তা

ও সুস্থতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীমাই ছিলেন মাথার উপরে। যতদিন শ্রীমা ছিলেন ততদিন তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। মানবধর্মের ইতিহাসে এরকমটি আর কোথাও দেখতে পাই না। এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো ভক্তগোষ্ঠীর প্রয়াস কাজ করেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ঘটেছে। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনি। মা যতদিন ছিলেন ততদিন বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষভাবে মঠ পরিচালিত হয়েছে কিন্তু পরোক্ষে ছিলেন শ্রীমা। এই ভাবান্দোলন পরিচালনার জন্য আদর্শগত সিদ্ধান্ত ও ধর্মগত সিদ্ধান্তে বিরোধ এসেছে। এই সংঘর্ষের সময় শ্রীমায়ের সিদ্ধান্তই সর্বোচ্চ ছিল। সবকিছু ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতির অধীন।

শ্রীমায়ের এই কর্তৃত্বের রূপটি ছিল মধুর ও বিচক্ষণ। শিশু মঠের ক্ষেত্রে যেসব আদর্শগত, ধর্মাদর্শ ও কর্মাদর্শগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল এইসব সিদ্ধান্ত শ্রীমা সুদক্ষ প্রশাসকের মতো গ্রহণ করেছেন। যে সিদ্ধান্ত মঠের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। এক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্মযোগের প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ 'শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা'র ভাব প্রচলন করলেন। সন্ন্যাসীদের সমাজ সংলগ্ন ভাবকে তৎকালে কেউই ঠিক মেনে নিতে পারেননি। এমনকী গুরুভাই অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যেও এ নিয়ে মতবিরোধ ও সংশয় ছিল। কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই সেবা কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমোদিত কিনা—এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। 'নরেন কী বিদেশিভাবের প্রচলন করছে?'—এইরকম একটি কথা ভক্ত মহলে গুঞ্জরিত হত। কিন্তু স্বামীজি দৃঢ়ভাবে জানালেন সন্ন্যাসীর আদর্শ হবে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ—এই দুটিই হবে সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ। তাই স্বামীজির অনুপ্রেরণায় চারিদিকে সেবাশ্রম গড়ে উঠতে লাগল, কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীরা সেবার জন্য ছুটে যেতে লাগলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে সর্বপ্রথম সেবাকাজের প্রবর্তন করা হয়। এরপরের সেবাকাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল কাশী সেবাশ্রম। সন্ন্যাসীর শহর কাশীতে অসুস্থ রোগীদের জন্য একটি হাসপাতাল খোলা হয়। একবার শ্রীমা আছেন কাশীতে, কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও সেখানে উপস্থিত। একদিন শ্রীমা সেবাশ্রমের কাজ দেখতে এলেন এবং সব দেখেশুনে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন।' এই সময় তিনি সেবাশ্রমের অর্থভাণ্ডারে দশ টাকার একটি নোট দান করেন। যে নোটটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। সেবাশ্রম দেখার পরে জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।' (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃ. ২৯২)।

শ্রীমায়ের সেবাশ্রম দর্শন ও সেবাকাজকে মৌখিক সম্মতি প্রদান চিরকালের জন্য সেবাকাজকে কেন্দ্র করে বিতর্কটিকে স্তিমিত করে দিল। স্বয়ং মাস্টারমশাই-এর সামনে এই ঘটনা ঘটায় তিনিও এ প্রসঙ্গ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের সেবক সন্তান, স্বামী সারদেশানন্দের উক্তি চমকপ্রদ। তিনি জানাচ্ছেন, "স্বামীজি যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধুদের জনসেবার কাজে লাগাইয়াছেন, এটি ঠিক ঠাকুরের ভাবানুগ কিনা—এ সংশয় প্রথমদিকে অনেকেরই মনে উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট এ বিষয়ে কেহ কেহ বিভিন্ন সময়ে

জিজ্ঞাসাও করিয়াছেন। মা কাহাকেও বলিয়াছেন, 'এ সবই ঠাকুরের কাজ। আবার কাহাকেও বা বলিয়াছেন, 'বাবা, তোমরা কাজ করে খাও। কাজ না করলে কে খেতে দেবে—রোদে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে মাথা ঘুরে যাবে। ভালো করে খেতে না পেলে শরীরে অসুখ করবে। তোমরা ওসব কথা শুনো না। কাজ করো, ভালো করে খাও দাও, ভগবানের ভজন করো।'

"এই প্রসঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দজির কথা মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন—'স্বামীজি বলেছেন, ঠাকুরের এক একটি উপদেশ অবলম্বন করে বড় বড় পুস্তক লেখা চলে। মায়ের শুধু এই উপদেশটি 'কাজ করে খাও, বাবা' নিয়ে আমিও কয়েক খণ্ড গ্রন্থ লিখিতে পারি।" (শ্রীশ্রী মায়ের স্মৃতিকথা, পৃ. ৩৩)। স্বামী অরূপানন্দ একবার মায়ের কাছে সন্ন্যাসীর কাজ করা উচিত কিনা এ প্রসঙ্গে মতামত চেয়েছিলেন। মা বলেছিলেন, 'কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে?... মঠ এমনিভাবেই চলবে, এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃ. '৯৭)। স্বামী ঈশানানন্দজিকে এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন, 'কাজে মন ভালো থাকে, তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্তত সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল।.....[কিন্তু] সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে ক'জন? প্রথমটা একটু করে। শেষে.... বসে থেকে থেকে নীচের গরম মাথায় ওঠে (অহঙ্কারী হয়)। গাছ পাথর ভেবে নানা অশান্তি মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভালো। মন আলগা পেলেই যত গোল বাঁধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃ. ২১৯-২০)।

একদিকে শ্রীমা যেমন বিবেকানন্দের সেবাদর্শের কাজকে সমর্থন জানাচ্ছেন অপরদিকে প্লেগের সেবাকার্যে অর্থাভাবের জন্য স্বামীজি নবনির্মিত মঠ বিক্রি করে দিতে চাইলে শ্রীমা বলেছিলেন, 'সে কী বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কী? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সংকল্প করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ, তোমার ওসব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়?.... বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তার কত কাজ। ঠাকুরের অনন্তভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এইভাব চলবে।' স্বামীজি মায়ের কথা শুনে নিজের ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন, 'তাই তো, আবেগভরে আমি কী করতে যাচ্ছিলাম, সত্যি তো মঠ বিক্রি আমি করতে পারি না, সে অধিকার আমার নেই।' শ্রীমায়ের কোনো ইচ্ছার উপরই নরেন্দ্রনাথ কোনো কথা বলেননি, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন, 'মাতা ঠাকুরানির যে-প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন নরাধম, তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি?'—এইভাবে শ্রীমায়ের পরোক্ষ প্রভাবে ধীরে ধীরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছিল শিশুমঠের।

সতেরো

সঙ্ঘপরিচালনা

শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করে দূর থেকে সঙ্ঘকে পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন ছোটখাটো বিষয় তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট হত। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর। শ্রীমা তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় পিতৃগৃহ জয়রামবাটীতে বাস করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ আদেশ 'নিজের ঘরটি ছেড়ো না'—এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। বেলুড় গঠনের আগে এবং পরে রামকৃষ্ণ ভাবধারা ক্রমে ক্রমে এমন বিস্তারলাভ করল যে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি তীর্থে পরিণত হল। বহু ভক্ত সমাগম হতে লাগল। ঠিক হল কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণ ভিটা ও তৎসংলগ্ন স্থান একটি মঠে পরিণত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানে গঠিত হবে একটি মন্দির। প্রস্তাবটি কেবল উত্থাপিত হলেই হল না, তাকে কার্যে রূপায়িত করতে বিস্তর বাধা। কারণ চাটুজ্জে পরিবারের অনেক সদস্য রয়েছেন। আছেন গৃহদেবতা রঘুবীর আর শীতলাদেবী। শ্রীমার লীলা সংবরণের কিছু আগের কথা। জীবনীকার লিখেছেন, "লীলা সংবরণের পূর্বে শ্রীমা যখন উদ্বোধনে ছিলেন, ঐ সময়ে কলিকাতার ইটালিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দেখিতে যাইবার পথে রামলালদাদা, লক্ষ্মীদিদি ও রামলালদাদার কন্যা দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীমায়ের নিকট আসিয়াছেন। গল্প প্রসঙ্গে ঠাকুরের জন্মস্থান, মন্দির ও অপর আনুসঙ্গিক বিষয়ে কথা উঠিল। তখন লক্ষ্মীদিদি জানিতে চাহিলেন, 'ও (মন্দির) হলে সেটি আমাদের হেপাজতে থাকবে তো? এদের (রামলালদাদা ও শিবুদাদার) ছেলেপিলেরাই সব পুজোটুজো করবে, থাকবে?' শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'তা কী করে হবে। এরা সাধুভক্ত; এদের কি জাতের বিচার আছে? কত দেশের লোক, সাহেবসুবো যাবে, ওখানে থাকবে প্রসাদ পাবে। আমাদের তো সব ভক্ত নিয়েই কারবার। তোরা হলি সংসারী। তোদের সমাজ আছে, ছেলেমেয়েদের বে-থা আছে। তোদেব কী ওদের সঙ্গে থাকা চলবে?' এইরূপ কিছু কথাবার্তার পর শ্রীমা আরও বলিলেন যে, বেলুড় মঠের সাধুরা ঐ জন্মস্থান ও ভাবী মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লইয়া রামলালদাদা প্রভৃতির জন্য আলাদা করগেটের বাড়ি করিয়া দিবেন এবং রঘুবীর ও শীতলার মন্দির পাকা করিয়া দিবেন। কিন্তু ঐ গৃহদেবতাদের পূজার্চনাদির ভার রামলালদাদার উপরই থাকিবে। তবে লক্ষ্মীদিদি, রামলালদাদা বা শিবুদাদা যখনই কামারপুকুর যাইবেন, তাঁহারা সাধুদেরই সঙ্গে থাকিবেন ও মন্দির হইতে প্রসাদ পাইবেন। আগত সকলে মাতাঠাকুরানির এই প্রস্তাবগুলি সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইলেন এবং স্বামী সারদানন্দজিও ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

"এই ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান ১৩২৫ সালের ১১ই শ্রাবণ (২৭-৭১৮) বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের হস্তে অর্পিত হয় এবং দলিলে শ্রীমা প্রভৃতি সকলে স্বাক্ষর করেন।

ইহার কিছু আগে (২৮ শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৪, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯১৭) ঠাকুরের জন্মস্থানের সংলগ্ন এক টুকরো জমি কেনা হয়। পরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জুলাই কিছু জমি সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ি কিনিয়া লইয়া মন্দিরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। ১৯৫১ এর ১১ মে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরের যথাবিধি প্রতিষ্ঠা হয়। বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ গৃহদেবতাদের জন্য পাকা মন্দির করিয়া দিয়াছেন, রামলালদাদা ও শিবুদাদার বংশধরদিগকে বাটী নির্মাণের জন্য উপযুক্ত অর্থও দেওয়া হইয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মস্থানে মন্দির গঠনের ক্ষেত্রে শ্রীমা যেমন দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি নিজের জন্মস্থানে মন্দির গঠন ও তার রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থাই হয়েছিল তাঁরই ইচ্ছানুসারে। স্বামী সারদানন্দ কেবল তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ্যে বাস্তবায়িত করতেন মাত্র।

বেলুড় মঠ একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘ শঙ্করাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ের কর্ম ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। যদিও সন্ন্যাস গ্রহণের আনুষ্ঠানিক নিয়ম সন্ন্যাসী সঙ্ঘের চিরাচরিত নিয়ম মেনেই পালিত হয় তবু শ্রীমায়ের জীবৎকালে তাঁর ইচ্ছা ও কেবল গেরুয়া বস্ত্রদানের মাধ্যমেও সন্ন্যাস হয়েছে বহুজনের। ত্যাগীরা যে তাঁর কাছে বিশেষ সম্মান পেতেন তা বলাই বাহুল্য। কখনো কখনো তাঁর মুখে শোনা যেত, 'বাবা, ত্যাগীরা না হলে কাদের নিয়ে থাকব?' একবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন। এইসময় একদিন দুপুরের খাওয়ার পর এক সন্ন্যাসী সন্তান শ্রীমার হাতে জল ঢেলে দিলেন। হাত ধোয়ার পর পা ধোয়ার প্রয়োজন। সন্ন্যাসী মহারাজ জানতেন পায়ে বাতের জন্য মায়ের নিচু হতে অসুবিধা হয়। তাই তিনি শ্রীমায়ের চরণে জল দিতে উদ্যত হলেই শ্রীমা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে বললেন, 'না, না বাবা, তুমি! তোমরা দেবের আরাধ্য ধন।' এই বলে নিজেই হাত দিয়ে পা মুছলেন। এই সন্ন্যাসী তখনো কাছা দিয়ে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করেন। সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র তখনো তাঁর অঙ্গে ওঠেনি।

সন্ন্যাসের গৈরিক বস্ত্র তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। এখানে আমরা জীবনীকারের সুচিন্তিত মতামতকে গ্রহণ করব। 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "সাধনার অঙ্গ ও সংস্কার হিসাবে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করা ও বিরজাহোমান্তে চিরকালের মতো সর্বস্ব ত্যাগ করার মধ্যে শ্রীমা একটা পার্থক্য করিতেন বলিয়া মনে হয়। এক ব্রাহ্মণ যুবক বিহার মন্ত্রিদপ্তরে কাজ করিতে করিতে বৈরাগ্য হওয়ায় চাকরি ছাড়িয়া মায়ের নিকট গেরুয়া লইতে আসেন। শ্রীমা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তিনি কিছুকাল উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করেন। সেখানে অপর সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে বিরজা হোম করিতে বলিলে তিনি এই বিষয়ে শ্রীমায়ের মতামতের জন্য পত্র লিখিলেন। শ্রীমা উত্তরে জানাইলেন, 'বিরজাহোম অতি কঠিন ব্যাপার বলে আমি তোমাকে উহা করতে আদেশ দেই না।' দীর্ঘকাল তপস্যার পর এই ভক্ত সংসারে ফিরিয়া যান। শ্রীমা সম্ভবত ইঁহার অন্তর দেখিয়াছিলেন বলিয়াই চরম ত্যাগের অনুমতি দেন নাই।"

অনেক সময় শ্রীমা নিজে গেরুয়া না দিয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রবিজয় নামক এক যুবককে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি উদ্বোধনে শ্রীমায়ের কাছে এনে বলেন, 'মা, এ ছেলেটি আমার সঙ্গে মাদ্রাজ যাচ্ছে, একে সন্ন্যাস দিয়ে দেবেন কি? মা

বললেন, 'শরৎকে বলো, সে দিক।' শরৎ মহারাজ বললেন, 'আমি কার কী মনের ভাব বুঝি না, আর সন্ন্যাস-টন্ন্যাস মহারাজ (ব্রহ্মানন্দজি) দেন।' তখন মা বললেন, 'তাহলে পুরীতে রাখালের (ব্রহ্মানন্দজি) কাছে নেয় যেন।' ঠিক সেইরকম, স্বামী জগদানন্দ সন্ন্যাস প্রার্থী হলে শ্রীমা গেরুয়া কাপড় নিয়ে ঠাকুরের পটের সামনে ছুঁইয়ে ও নিজের মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে বলেন, 'আমি গেরুয়া দিলুম, কিন্তু মঠে গিয়ে রাখালের কাছে বিরজা করিয়ে নাম নেবে।'

কোনো প্রথা বা অনুষ্ঠানকে শ্রীমা অস্বীকার করেননি। তিনি সমস্ত অনুষ্ঠানেরই মান রেখে গিয়েছেন। গুরু হলেও গেরুয়া দিয়েছেন কিন্তু সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান করিয়ে নিয়েছেন সন্ন্যাসীদের মাধ্যমেই। আবার সন্ন্যাস যে বাইরের ব্যাপার নয়, অন্তরে সাধুত্বকে স্থাপন করাই যে মূল লক্ষ্য—তা শ্রীমা বহু ঘটনায় স্মরণ করিয়েছেন। কোনো এক সন্ন্যাসী সন্তান শ্রীমায়ের কাছে গৈরিক বাস লাভ করে সন্ন্যাস গ্রহণের অন্যান্য বিধি কীরূপে অনুষ্ঠিত হবে তা জানতে চাইলে শ্রীমা ধীর গম্ভীরভাবে বললেন, 'বিশ্বাস নিষ্ঠাই মূল, বিশ্বাস-নিষ্ঠা থাকলেই হল।' শ্রীমায়ের এই কথায় নতুন সন্ন্যাসী খুব সন্তুষ্ট না হয়ে বারংবার বিধি অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ তুলতে লাগলেন। শ্রীমা তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মঠে ছেলেদের দিয়ে ওসব করিয়ে নিয়ো।' এ প্রসঙ্গে আমরা আরেকটি কাহিনীর উল্লেখ করব। "১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত গোপেশ মহারাজের সহিত জয়রামবাটীতে ও পরে কামারপুকুরে গমন করেন। গোপেশ মহারাজ একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমায়ের নিকট হইতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য গ্রহণের কথা সুরেন্দ্রবাবুকে জানাইলেন। সুরেন্দ্রবাবু তখনো চাকরি করেন; কিন্তু হৃদয়ে অশেষ বৈরাগ্য। তাই তাঁহারও মনে ব্রহ্মচর্যের জন্য আগ্রহ হওয়ায় তিনি কামারপুকুরে নতুন কাপড় কিনিয়া পুনর্বার মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ব্রহ্মচর্যের একান্ত বাসনা জানিয়া শ্রীমা তাঁহার আত্মীয়স্বজনের খবর লইলেন এবং পরে ঠাকুরকে কাপড়খানি দেখাইয়া জ্ঞান মহারাজের হাতে দিয়া বলিলেন, 'তুমি ডোর-কৌপীন ও বহির্বাস করে নাও।' সুরেন্দ্রবাবু চাকরি ছাড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা তাঁহাকে আরও কিছুকাল কাজ করিতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, রোজগারের টাকা হইতে ভক্তদিগকে ধর্মকর্মে সহায়তা করা ভালো। সুরেন্দ্রবাবু এই উপদেশ পালন করিয়াছিলেন। তিনি পরে আরও একবার সংসার ত্যাগের ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন; মা তখনো অনুমতি দেন নাই। অবশেষে শ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর সংসারের কর্তব্যভার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।"

আঠারো

মাতৃত্বই ছিল শ্রীমায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনন্তভাবকে একটি ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রকাশভঙ্গি ছিল অভিনব। একদিকে তিনি সাধারণ গৃহবধূ অপরদিকে তিনি বহু ভক্তের ভবপারের কাণ্ডারী। গুরুর গুরুদায়িত্ব অতি অনায়াসে স্কন্ধে বহন করে চলেছেন। গুরুরূপে বহুজনকেই দীক্ষাপ্রদান কালে স্বয়ং ইষ্টদর্শন করিয়েছেন অনায়াসে কিন্তু বিধিবদ্ধ সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান করিয়েছেন সন্ন্যাসী সন্তানদের মাধ্যমে। তাঁর মধ্যে সঙ্ঘজননী ও স্নেহময়ী মাতার যে সংমিশ্রণ হয়েছিল তার তুলনা মেলা ভার! দৈব দুর্বিপাকে এক ভক্ত সঙ্ঘ ত্যাগ করে যাচ্ছেন। সঙ্ঘের আদেশ। শ্রীমায়েরও তাতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তবু শ্রীমা সেই ভক্তটির যাওয়ার ক্ষণে চোখের জল ফেলছেন স্নেহপূর্ণ মায়ের মতোই। শ্রীমাও কাঁদেন ভক্তও কাঁদেন। কিছুক্ষণ পরে উদ্বেল হৃদয় শান্ত হলে শ্রীমা নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে চোখ মুছলেন এবং ভক্ত ছেলেটিকে কলঘরে গিয়ে মুখ ধুয়ে আসতে বললেন। তারপর স্নেহভরে বললেন, 'আমায় ভুলো না। ভুলবে না তা জানি, তবু বলছি।' ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা আপনি?' মা বললেন, 'মা কখনো ভুলতে পারে? জেনো, আমি সবসময় তোমার কাছে আছি কোনো ভয় নেই।' সঙ্ঘের নিয়ম আর জননীর স্নেহ দুই পৃথক বস্তু নয় কি? তিনি যে গণ্ডিভাঙা মা!

সন্ন্যাসের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা নয় এক অদ্ভুত বৈরাগ্যপূর্ণ অনুভূতির বিচ্ছুরণ হত শ্রীমায়ের কথায়। একদিন এক যুবক ভক্ত জয়রামবাটীতে উপস্থিত হয়েছেন। যুবকটির বয়স বেশি নয়। সবেমাত্র আই এ পরীক্ষা দিয়ে বি এ পড়ছেন। দুপুরবেলা শ্রীমা তাঁর বারান্দায় বসে গুল দিয়ে দাঁত মাজছেন। যুবক রামময় তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ নলিনী বলে উঠলেন, 'দেখো দিকি পিসিমা, কেমন সোনার চাঁদ ছেলে। দুটো পাস করে তিনটে পাসের পড়া পড়ছে। বাপ-মা কত কষ্ট করে মানুষ করেছে, পড়ার খরচ জোগাচ্ছে। ছেলে কিনা সাধু হবেন! কোথায় রোজগার করে মা-বাপকে খাওয়াবে, তা নয়।' মা বললেন, তুই তার কী বুঝবি? ওরা তো কাকের বাচ্চা নয়, কোকিলের বাচ্চা। বড় হলেই আসল মাকে বুঝতে পারে, লালন-পালন করা মাকে ছেড়ে আসল মায়ের কাছে উড়ে যায়। বাস্তবিকই যুবকটি সাধু হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদা দেবী গ্রন্থে একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবনীকার লিখছেন, 'শ্রীমা শেষবারে জয়রামবাটীতে আছেন। মনসা নামক এক যুবক তাঁহার নিকট গৈরিকবস্ত্র পাইয়া সন্ধ্যার সময় খুব আনন্দিত মনে কালীমামার বৈঠকখানায় বসিয়া শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেছেন। মাতাঠাকুরাণীর উহা খুব ভালো লাগিল। তাঁহার কাছে বসিয়া রাধু, মাকু প্রভৃতি এবং মামীদের দুই একজনও গান শুনিতেছিলেন। মামীদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'ঠাকুরঝি ঐ ছেলেটিকে সাধু করে দিলেন।' মাকুও তাহাতে যোগ দিয়া বলিল, ঐ ছেলের বাপ-মা কত আশা করে তাঁকে মানুষ করেছিলেন, এখন সে সব চুরমার হয়ে গেল। বিয়ে করাও তো একটা

সংসারধর্ম। পিসিমা এভাবে সাধু করতে থাকলে মহামায়া তাঁর উপর চটে যাবেন। সাধু তারা হতে চায়, নিজেই হোক, পিসিমার ঐজন্য নিমিত্ত হতে যাওয়া কেন।' সব শুনে শ্রীমা বললেন, 'মাকু, ওরা দেবশিশু। সংসারে ফুলের মতো পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের কী আছে বল দেখি? সংসারে যে কী সুখ তা তো দেখছিস। তোদের সংসারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে গেল।'

শ্রীমায়ের পরিমণ্ডল বিচিত্র। সেখানে সংসার ও মঠের একত্র বিহার। একই সঙ্গে তিনি সংসারী ও সন্ন্যাসীকে পরিচালিত করছেন। এর ফলে কোনো কোনো সময় তিনি কঠোর কখনো বা কোমল। নবাসনের বউ একদিন শ্রীমাকে প্রশ্ন করলেন, 'মা, আপনার সব ছেলেরা সমান। তবে যে বিয়ে করার মতামত চেয়েছে, তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন আর যে সংসার ত্যাগ করতে চায়, তাকে সেইমতো ত্যাগের প্রশংসা করে উপদেশ দিচ্ছেন। আপনার তো উচিত, যেটি ভালো সেই পথেই সকলকে নিয়ে যাওয়া।' মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'যার ভোগ-বাসনা প্রবল, আমি নিষেধ করলে কি সে শুনবে? আর যে বহু সুকৃতি বলে এইসব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে তাকেই একমাত্র সার ভেবেছে, তাকে একটু সাহায্য করব না? সংসারে দুঃখের কি অন্ত আছে, মা?

শ্রীমা কখন কারও কারও সন্ন্যাসের প্রতি অসম্মতি জানিয়েছেন এমন দেখা গিয়েছে। জীবনীকার জানিয়েছেন, 'ক্ষেত্র বিশেষে তিনি দৃঢ়ভাবে সন্ন্যাসে অসম্মতিও জানাইতেন। একবার তাঁহার শিষ্যা এক ভক্তিমতী স্ত্রীলোক তাঁহাকে পত্রে জানাইলেন যে, স্বামী তাঁহাকে বারংবার বলিতেছেন, তুমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের ঘরে গিয়ে থাকো। আমি আর সংসারে থাকব না—সন্ন্যাসী হব।' নিরুপায় নারীর পত্রের প্রতি ছত্র শ্রীমায়ের প্রতি কাতর অনুনয়ে পূর্ণ। পত্র শুনিয়া তিনি উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'দেখো দিকিন, কী অন্যায়। সে বেচারি এই কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে যায় কোথায়? তিনি সন্ন্যাসী হবেন? কেন সংসার করেছিলেন? যদি সংসার ত্যাগই করতে চাও, আগে এদের খাওয়া থাকার সুব্যবস্থা করো।'

তাঁহার দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। একসময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'অসুস্থ হয়েছে বলে গৃহস্থ-বাড়িতে সন্ন্যাসী কেন থাকবে? মঠ রয়েছে, আশ্রম রয়েছে। সন্ন্যাসী ত্যাগের আদর্শ। কাঠের স্ত্রীমূর্তি পুতুল যদি রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, সন্ন্যাসী কখনো পায়ে করেও উলটে দর্শন করবে না। আর সন্ন্যাসীর অর্থ থাকা একান্ত খারাপ। চাকি (টাকা) না করতে পারে এমন জিনিস নেই—প্রাণ সংশয় পর্যন্ত।' কালবিশেষে শ্রীমা নিজ সন্তানদের প্রতি এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা করিতেন। ১৩১৮ সালে তিনি রামেশ্বর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া জনৈক সাধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সাধুর মন মাতাঠাকুরানির জন্য তিন-চারি মাস যাবৎ খুব ব্যাকুল হইয়াছে। ইহাতে আনন্দিত না হইয়া তিনি বরং বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'সে কী! সাধু সব মায়া কাটাবে। সোনার শিকলও বন্ধন।.....সাধুর মায়ায় জড়াতে নেই। কী কেবল মাতৃস্নেহ করে মায়ের ভালোবাসা পেলুম না। ওসব কী? বেটাছেলে সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফেরা—আমি ওসব ভালোবাসি না। মানুষের আকৃতিটা তো? ভগবান তো পরের কথা। আমাকে কুলের ঝি বউ নিয়ে থাকতে হয়।'

চরম বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শ্রীমায়ের। আদর্শের ক্ষেত্রে কোনোরকম ভাবালুতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। একবার আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন দুইজন ভক্ত যুবক জয়রামবাটীতে উপস্থিত হলেন। তাঁরা শ্রীমায়ের পায়ে পদ্মফুলের অঞ্জলি প্রদান করে আবেগে আপ্লুত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা জানালেন। তাঁদের ভাব প্রবণতা চোখে পড়ার মতো হলেও শ্রীমা তাতে ভুললেন না। তিনি কেবল 'হবে বাবা, হবে বাবা' বলে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ভক্ত যুবক দুটি সন্ন্যাস না নিয়েই ফিরে গেলেন। এক সাধু গিয়েছিলেন হৃষীকেশে তপস্যা করতে। হৃষীকেশে গিয়ে শ্রীমাকে চিঠি লিখলেন, 'মা, তুমি বলেছিলে, সময়ে ঠাকুরের দর্শন পাবে। কই তা হল?' শ্রীমা সেই পত্র পাঠ করেই বলে উঠলেন, 'দাও তো, দাও ওকে লিখে, তুমি হৃষীকেশে গিয়েছ বলে ঠাকুর তোমার জন্য সেখানে এগিয়ে থাকেননি। সাধু হয়েছ। ভগবানকে ডাকবে না তো কী করবে? তিনি যখন ইচ্ছে দেখা দেবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তেরা সর্বসময় বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করতেন। ভক্ত পরিমণ্ডলে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। এঁদের মধ্যেই একজন বিশিষ্ট ভক্তের সঙ্গে স্বামী শান্তানন্দের কাশী যাওয়ার কথা উঠলে শ্রীমা পরম বৈরাগ্যের সঙ্গে বলেছিলেন, 'তুমি সাধু, তোমার কি আর যাওয়ার ভাড়া জুটবে না? ওরা গৃহস্থ, ওদের সঙ্গে কেন যাবে? এক গাড়িতে যাচ্ছ, হয়তো বললে, 'এটা করো, ওটা করো।' তুমি সন্ন্যাসী, তুমি কেন সেসব করতে যাবে? শ্রীমায়ের দীক্ষিত জনৈক ব্রহ্মচারী গেরুয়া কাপড় ছেড়ে সাদা কাপড় পরছেন শুনে মা বলেছিলেন, মাটির ভাঁড়ে সিংহের দুধ টেঁকে না। গেরস্তের অন্ন খেয়ে খেয়ে ওর বুদ্ধি মলিন হয়ে গেছে।'

জয়রামবাটী থেকে একবার শ্রীমা উদ্বোধনে এসেছেন। সঙ্গে রয়েছে রাধু। রাধুর পায়ে মল। একদিন রাধু দ্রুত তেতলা থেকে নামছে পায়ের মল খুব জোরে বাজছে। শ্রীমা তাঁর অতি প্রিয় রাধারানিকে সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কার করে উঠলেন, 'রাধী, তোর লজ্জা নেই? নীচে সব সন্ন্যাসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পায়ে দৌড়ে নামছিস। ছেলেরা কী ভাববে বল তো? তুই এখনই মল খুলে ফেল। এখানে ছেলেমেয়ে যারাই আছে তারা তামাশা করার জন্য আসেনি, সকলেই ভজন-সাধন করছে। এদের ভজনের ব্যাঘাত ঘটলে কী হবে জানিস? অবুঝ রাধু রাগের চোটে পায়ের মল খুলে ছুঁড়ে দিল। শ্রীমা সর্বদা নিজের কাছের মেয়েদের সাবধানে রাখতেন এবং সর্বদা মনে করিয়ে দিতেন, সন্ন্যাসীর আশ্রম এটি। মহান আদর্শে উৎসর্গীকৃত কতগুলি প্রাণ একত্র হয়েছে। এঁদের সম্মান দেওয়া কর্তব্য। একদিন স্নানের পর রাধু মাথা আঁচড়িয়ে কেশবিন্যাস করছে। গামছায় চাপা দিয়ে চুলের পাতা বের করছে দেখে শ্রীমা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

সন্ন্যাসীকে স্নেহাঞ্চল দিয়ে রক্ষা করতেন শ্রীমা। জয়রামবাটীতে শ্রীমার একান্ত সহচরী ভানুপিসি এইরকম একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 'সেদিন একজন এসেছিল। তার ছেলে ঘর থেকে পালিয়ে মা'র কাছে এসে সন্ন্যাস নিয়েছে। খবর পেয়ে মা পাগলের মতো ছুটে এসে বলছে, 'আমার ছেলে কই, ছেলে কই?' ছেলে কিন্তু আগেই গেরুয়া নিয়ে চলে গেছে। তাই মা ও স্ত্রীর শ্রীমার উপর ভারী আক্রোশ। অনুযোগ দিয়ে শ্রীমাকে বলছে, 'উপার্জনশীল ছেলের অভাবে সংসারে বিপর্যয় ঘটেছে—দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই।' শ্রীমা কিন্তু

দৃঢ়রূপ ধারণ করলেন। তিনি বললেন, ' সে তো কোনো অন্যায় করেনি, ভালো পথেই গেছে; আর শুনেছি, সে তোমাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছে।' শ্রীমায়ের স্নেহ ও আদরে তারা শান্ত হয়ে ঘরে ফিরেছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেসব যুবক ভক্ত উপস্থিত হতেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন পারিবারিক অবস্থার কথা। একজন যুবক যতই বৈরাগ্যবান হন না কেন পারিবারিক কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক সময় তাঁকে সন্ন্যাসের পথ থেকে দূরে রাখতে বাধ্য করে। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বৈরাগ্যকে খুব প্রাধান্য দেননি যে বৈরাগ্য কয়েকজন মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে কেবল নিজের মুক্তির পথ খোঁজে। পিতৃহীন যুবকের উচিত তাঁর মায়ের জন্য আপ্রাণ সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা করা। বৈরাগ্যমুখী মনের ক্ষেত্রে চাকরি বন্ধন স্বরূপ কিন্তু মায়ের জন্য চাকরিতে কোনো দোষ নেই—যুবক ভক্ত নিরঞ্জনকে এইরকম কথাই শুনিয়েছিলেন। শ্রীমায়ের জীবনেও আমরা ঠিক এই ভাবের বিকাশ দেখতে পাই। একজন ত্যাগী যুবকের পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে শ্রীমা তাঁর কাছ থেকে তাঁর বাড়ির সমস্ত খবর জানলেন এবং বললেন, 'আজ যে তোমার বাড়ির কথা, মা'র কথা, এত জিজ্ঞাসা করলুম, কেন জানো? প্রথম গ-র মুখে তোমার বাবা মরার খবর শুনলুম। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তোমার মা'র আর কে আছে, খাবার সংস্থান আছে কি-না, তুমি না থাকলে তাঁর চলবে কী না। যখন শুনলুম তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে, তখন মনে হল, যাক, ছেলেটার যদি একটু সদ্‌বুদ্ধি হয়েছে, ঠাকুরের ইচ্ছায় তার সৎপথে থাকবার বিশেষ বাধা পড়বে না।' ঠিক এইরকমই স্বামী কেশবানন্দ তাঁর মাতার একটি সন্তান বলে তাঁকে সন্ন্যাস দিতে শ্রীমা প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন।

সংসারের দায়িত্বকে যেমন স্বীকার করেছেন আবার সংসারের অজুহাতে সন্ন্যাসের মহান আদর্শকে গ্রহণে ইতঃস্তত করাকে তিনি দুর্বলতা বলে মনে করেছেন। জীবনীকার 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে সুন্দরভাবে এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ত্যাগীকে ত্যাগের পথে সাহায্য করা অবশ্যকর্তব্য হইলেও সে ত্যাগীকে চিনিবে কে এবং চিনিয়া অনুরূপ সহায়তা করিবে কে? ত্যাগী ও গৃহীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ এক হইতে পারে না—ইহা শ্রীমায়ের জানাই ছিল। আমরা নবাসনের বউ-এর নিজের বৈধব্য ও শ্রীমায়ের প্রতি ভক্তি হইতে সঞ্জাত ত্যাগীর প্রতি শ্রদ্ধার কথা বলিতেছি না—সংসারে থাকিয়াও যথার্থ অধিকারীকে ত্যাগের পথে আগাইয়া দেওয়ারই কথা উল্লেখ করিতেছি। ইহা কয়জন পারেন? মাতাঠাকুরানির শেষবার জয়রামবাটীতে থাকার সময় পৌষ মাসে এক এম এ পাস যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন যে, তিনি এক দ্বিধায় পড়িয়াছেন। তাঁহার সাধু হইবার ইচ্ছা আছে জানিয়া বেলুড় মঠে স্বামী শিবানন্দজি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিলেও তাঁহার মায়ের মনঃকষ্ট হইবে ভাবিয়া প্রতিবেশী মাস্টার মহাশয় আরও বিলম্ব করিতে বলিতেছেন। শ্রীমা সব শুনিয়া গেলেন মাত্র—তখনই কোনো নির্দেশ দিলেন না। পরে বরদা মহারাজকে বলিলেন, 'মাস্টারের বাড়ির কাছে ওদের বাড়ি; ঘরে মা-ভাই আছে। সাধু হবে শুনে মাস্টার একটু গড়িমসি করছে, বলছে, এত তাড়াহুড়া করে নাই বা সাধু হলে।' মঠে তারক [শিবানন্দজি] কিন্তু খুব উৎসাহ দিচ্ছে। মাস্টার হাজার হোক সংসারী কিনা! আর তারক সাদা, সাধু লোক। ঠাকুরের ত্যাগের আদর্শ

গ্রহণ করা আহা, কত ভাগ্যে হয়? তারক ঠিকই বলেছে। সংসারে পড়লে আর উঠতে পারে কয়জন? ছেলেটির মনে খুব জোর আছে।' পরদিন ওই যুবক শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আবার মনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলে তিনি খুব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, বাবা। তারক যা বলেছে, খাঁটি কথাই বলেছে।' এখানে মনে রাখা প্রয়োজন শ্রীমা এই কথাটি মাস্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পর্কে বলছেন, যাঁকে গৃহীভক্তদের মধ্যে 'ছেলেধরা মাস্টার' নামে চিহ্নিত করা হত। কারণ তিনি বহু যুবক ও ছাত্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমুদ্রে অবগাহন করিয়েছিলেন এবং উৎসাহ দিয়ে সন্ন্যাসের পথে পরিচালিত করেছিলেন।

সন্ন্যাসের প্রতি অভূতপূর্ব সম্মান শেখালেও সন্ন্যাসের অভিমান সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের সচেতন করে দিয়েছেন শ্রীমা। স্বামী অরূপানন্দ তাঁকে একদিন বললেন, 'মা, বড় অভিমান আসে সন্ন্যাসে।' শ্রীমা তাঁর কথা সমর্থন করে বললেন, 'হ্যাঁ, বড় অভিমান—আমায় প্রণাম করলে না, মান্য করলে না, হেন করলে না। তার চেয়ে বরং (নিজের সাদা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে) এই আছি বেশ (অর্থাৎ অন্তরে ত্যাগ)।' যথার্থ ত্যাগকে স্বীকার করেছেন শ্রীমা, ত্যাগীর ভেককে নয়।

উনিশ

সমাজসচেতন শ্রীমা

শান্তজলে স্পন্দন সৃষ্টি করলে যেমন গোলাকার বৃত্তের সৃষ্টি হয়, বৃত্তটি জলের উপরে প্রসারিত হতে হতে জলাশয়ের প্রান্তে মিশে যায়। শ্রীমায়ের জীবন যেন সেই চলমান বৃত্তের মতো, কেবলই তা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। শ্রীমায়ের ত্যাগ, সেবা, তপস্যার সূচনা হয়েছে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে। আচারনিষ্ঠ ভক্তিবান পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছেন তাঁদের শুভসংস্কার। বিবাহ হয়েছে ব্রাহ্মণ পরিবারে যে পরিবারের সঙ্গে সাধন ও তপস্যা অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। স্বামী উন্মত্ত সাধক, দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন শ্রীমা—পেয়েছেন বৃহত্তর আদর্শের এক রূপরেখা, তাঁর পিতৃগৃহ ও পতিগৃহের জীবনধারা থেকেই সংগ্রহ করেছেন বিশ্বজীবনের উপাদান। দেশকাল, জাতিকে তিনি অতিক্রম করেছেন অবহেলায়।

শ্রীমায়ের জীবনে ডাকাত বাবা সাগর সাঁতরার পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তুঁতে ডাকাত আমজাদ। নারীর মধ্যে সৃষ্টিশীল উপাদান রয়েছে, এ তার উপর প্রকৃতির দান। এই সৃষ্টিধর্মী মন যে কত উদার হতে পারে তার চূড়ান্ত উদাহরণ শ্রীমা ও আমজাদের কাহিনী।

বাড়ি তৈরির কাজেই আমজাদের মায়ের বাড়িতে প্রথম আগমন। জয়রামবাটি ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে এই আপাতনিরীহ আমজাদ ভীতিপ্রদ নাম ছিল। শ্রীমা কেবল তাকে আদর করে কাছে ডাকেননি, তিনি জাতপাতের তীব্র ভেদাভেদকে দূর করে দিয়ে এক অসাধারণ ও বিপ্লবের উদাহরণ দেখিয়ে গিয়েছেন। কেমন ছিল এ বিপ্লব? এ প্রসঙ্গে আমরা সরাসরি জীবনী গ্রন্থে চলে যাব। শুনব সেই অসাধারণ কাহিনী।

'আমজাদ নামক এক তুঁতে মুসলমান মায়ের বাড়ির দেওয়াল প্রস্তুত করিয়াছিল। একদিন মা তাঁহাকে বাড়িতে ভিতরে নিজের ঘরের বারাণ্ডায় খাইতে দিয়াছেন, আর নলিনীদিদি উঠানে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া পরিবেশন করিতেছেন। মা তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অমন করে দিলে মানুষের কী খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস, আমি দিচ্ছি।' খাওয়ার পর আমজাদ এঁটো পাতা তুলিয়া লইয়া গেলে মা উচ্ছিষ্ট স্থানটিতে জল ঢালিয়া ধুইয়া দিলেন। নলিনীদিদি শ্রীমায়ের ভাইঝি মাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া, ও পিসিমা, তোমার জাত গেল, ইত্যাদি বলিয়া আপত্তি করিতে লাগিলেন। মা তাঁহাকে ধমক দিলেন। আমার শরৎ সারদানন্দজী যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।" (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃ. ২৮৯) হে পাঠক, এই ঘটনা কিন্তু আজকের নয়। একশো বছর আগের সমাজ যে সমাজে ব্রাহ্মণের বিধবারা দিনে দুবার অন্নগ্রহণ করতে পারতেন না। বেশভূষাতেও দেখা যেত কৃচ্ছ্রতার চরম নিদর্শন। শ্রীমা সেই গ্রাম্য পরিবেশে বেশভূষা পরিধানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর পিছনে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ ও ইচ্ছা। আবার জাতিভেদের তীব্র কঠোরতার মধ্যেও নিজের পরিধির ক্ষেত্রে নীরবে সমাজের অত্যাচার থেকে সরে এসেছেন। সমদৃষ্টির এ এক উল্লেখযোগ্য

উদাহরণ, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী সারদানন্দ ও ডাকাত আমজাদ তাঁর কাছে সমান স্নেহের অধিকারী। কারণ তিনি যে মা। মায়ের কাছে সকলের সমান অধিকার! এ কেবল একদিনের কথা নয়! এরপরে একসময় জ্বরে শয্যাগত শ্রীমাকে দেখতে এসেছেন আমজাদ। একদিন শ্রীমায়ের সেবায় নিযুক্ত ব্রহ্মচারী দেখলেন, একজন কৃষ্ণকায়, শীর্ণ ছিন্নবসন পরিহিত লোক শ্রীমায়ের বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। মায়ের দৃষ্টি তাঁর দিকে যেতেই তিনি বললেন, 'কে বাবা, আমজাদ? এসো।' শ্রীমায়ের আহ্বান শুনেই আমজাদ খুশি মনে বারান্দায় উঠে এল। ব্রহ্মচারী দেখলেন, তারপর মাতা ও পুত্রের সুখ দুঃখের কথা আরম্ভ হল। এদিকে সময় পার হয়ে ক্রমে ঠাকুরের ভোগ নিবেদনের ক্ষণ উপস্থিত হল। ব্রহ্মচারী পড়লেন মহামুশকিলে। শ্রীমায়ের ঘরে পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল রাখা থাকে। ভোগ নিবেদনের সময় পঞ্চপাত্রের জল প্রয়োজন। অথচ বারান্দায় আমজাদ বসে, মুসলমানের সামনে দিয়ে পূজার জল নিয়ে আসেন কী করে। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তার পর ব্রহ্মচারী ঠিক করলেন, কিছু না বলে মায়ের সামনে দিয়েই পঞ্চপাত্র নিয়ে যাবেন। প্রয়োজন হলে নিজে মা বারণ করবেন। এইভাবেই তিনি পঞ্চপাত্র নিয়ে এলেন এবং ভোগ নিবেদন করলেন। শ্রীমা সব দেখলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। ঠাকুর ঘরে ভোগ সমাপন হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, ব্রহ্মচারী দেখলেন, আমজাদ ঘরে ফিরছেন। তাঁর সকালের বিষণ্নবদন তখন হাস্যময়। সে স্নান করেছে, মাথায় মাখার জন্য পেয়েছে তেল, পেট পরিপূর্ণ করে প্রসাদ খাইয়েছেন শ্রীমা। এবার সে পান চিবাতে চিবাতে ঘরের দিকে চলেছে। হাতে একটি কবিরাজি তেলের শিশি, ও পুঁটলিতে নানা জিনিস। কৌতূহলী ব্রহ্মচারীকে যে শ্রীমা জানালেন, 'গরম ওষুধ খেয়ে আমজাদের মাথা গরম হয়েছে, রাত্রে ঘুম হয় না। অনেকদিন থেকে ঘরে এক শিশি নারায়ণ তেল পড়ে ছিল, তাকে দিয়েছি—মাখলে মাথা ঠান্ডা হবে, খুব ভালো তেল।' শ্রীমায়ের দেওয়া ওই তেল মেখে আমজাদ শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠল। কোনো প্রয়োজনে তাকে সংবাদ পাঠালেই সে মায়ের বাড়িতে এসে বিশ্বস্তভাবে সমস্ত কাজ করে দিত। জ্বরের সময় শ্রীমায়ের আহারে অরুচি হওয়ায় ডাক্তার আনারস খাওয়ার বিধান দান করেন। পল্লিগ্রামে কোথাও আনারস না পাওয়া গেলেও আমজাদ শ্রীমায়ের জন্য আনারস সংগ্রহ করে আনে।

একবার বহুদিন পর একঝুড়ি লাউ নিয়ে মায়ের বাড়ি উপস্থিত আমজাদ। শ্রীমা তাঁকে দেখেই বললেন, অনেকদিন ভাবছিলুম তুমি আসোনি কেন? কোথায় ছিলে? আমজাদ নিঃসংকোচে জানাল, গরু চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়েছিল। এই কারণেই তার আসা হয়নি। নিজের মুখে চুরির স্বীকৃতিকে শ্রীমা বেশি গুরুত্ব দিলেন না। ওই প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে সহজভাবে বলে উঠলেন, তাই তো ভাবছিলুম, আমজাদ আসে না কেন? শ্রীমায়ের যখন শেষ অসুখ, তখন বাগবাজারে শ্রীমায়ের বাড়িতে একদিন খবর এল, আমজাদ ডাকাতির দায়ে দিনকতক ফেরার থেকে অবশেষে ধরা পড়েছে। শ্রীমা শুনে বললেন, ও বাবা দেখলে। আমি জানতুম তার ডাকাতিটা জানা আছে। শ্রীমায়ের স্নেহ পেয়ে আমজাদ তার স্বভাব পরিবর্তন করেনি, ভালো করে বলতে গেলে সে তার নিজের পেশা ত্যাগ করেনি। কিন্তু অন্য গ্রামে ডাকাতি করলেও আমজাদের প্রভাবে জয়রামবাটী গ্রামটি এই ভয় থেকে মুক্ত ছিল। শোনা যায়, শ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর ডাকাতি করতে গিয়ে আমজাদের গায়ে তরোয়ালের চোট

লাগে। ওই চোট থেকে সৃষ্ট ঘা-ই তার মৃত্যুর কারণ হয়। আমজাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জীবনীকার বলেছেন, "শুধু বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধনী ভক্তদের প্রতি মায়ের স্নেহের দৃষ্টান্ত দিলে কেহ কেহ হয়তো ভাবিবেন, 'উহা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।' আমরা তাই দস্যু আমজাদের বিবরণ একটু বিস্তারিতভাবেই উল্লেখ করিলাম। শ্রীমা তাহার চরিত্র অবগত ছিলেন এবং এইরূপ দস্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা ও আশ্রিতজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও অত্যাবশ্যক জানিতেন। অথচ সে ব্যবস্থার জন্য তিনি লোকবল বা অস্ত্রবল ইত্যাদির উপর নির্ভর না করিয়া, নির্ভর করিয়াছিলেন একমাত্র অসীম স্নেহের উপর। আমরা দেখিয়াছি, সে স্নেহ দস্যুর হৃদয় জয় করিয়াছিল।"

উনবিংশ শতাব্দীর নারী আন্দোলন ও তার ইতিহাস আমাদের জানায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক ক্ষেত্রে পরাশ্রয়ী ভাবই তৎকালের নারী সমাজের মূল ভাব ছিল। স্ত্রী স্বামীর অধীনে পরাশ্রয়ী জীব মাত্র। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পরিবারের ধারণা নারীর মর্যাদাকে যথাযথ সম্মান করেছে। আত্মসম্মান ও নিজ আদর্শের সার্থক ব্যাপ্তিই নারীকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে তোলে। ভারতীয় নারীদের উন্নতি ও সামাজিক অধিকারের জন্য যখন সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ আইন এবং বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রচার করা হচ্ছে তখন আমেরিকাতেও চলছে নারী স্বাধীনতার জোয়ার। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে Women's Suffrage Convention-এ নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এ সবই ছিল শ্রীমায়ের সামাজিক পটভূমি। পরিবার পরিজন ও জয়রামবাটীর মতো প্রত্যন্ত গ্রামে থেকেও মনকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন সারদামণি। তাই তিনি গৃহীজীবন থেকে অনায়াসে সমাজ জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছেন এবং সামাজিক সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন।

জয়রামবাটীর কাছেই কোয়ালপাড়া গ্রাম। সেখানে জনৈক সন্ন্যাসীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে একটি আশ্রম। জগদম্বা আশ্রম। জয়রামবাটী থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে বিশ্রামস্থল সেটি। শ্রীমা বহুবার সেখানে থেকেছেন। একবার মা আশ্রমের তেঁতুলতলায় চৌকি পেতে বসে আছেন। এমন সময় এক ডোমশ্রেণির মেয়ে এসে মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা আমার উপপতি আমাকে ত্যাগ করেছে। মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে শ্রীমা সেই ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন এবং ভর্ৎসনা করে বললেন, ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে, এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে— নরকেও স্থান পাবে না। শ্রীমায়ের কথায় ছেলেটি তার ভুল বুঝতে পারল এবং মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে গেল।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর গ্রন্থ শ্রীশ্রীসারদাদেবী-তে লিখেছেন, "স্নেহ বিতরণে শ্রীশ্রীমা সুপুত্র-কুপুত্রের মধ্যে তারতম্য করিতেন না, গুণী-দোষী বিচার করিতেন না। বরং যাহাকে অন্য সকলে অবজ্ঞা উপেক্ষা করে, মা যেন তাঁহারই পক্ষে থাকিতেন বলিয়া বোধ হইত। অত্যন্ত অসৎ প্রকৃতি লোকের সমস্ত দোষ দুর্বলতা জানিয়াও শোকে বিপদে সহানুভূতি করিতে, ঔষুধপথ্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে মা বিরত হইতেন না। ইহার ফলে বহু দুশ্চরিত্র লোকের স্বভাব পরিবর্তিত হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীমা যখন বোসপাড়া লেনে বাস করছিলেন, মঠের একটি উড়িয়া চাকরকে চুরি করার অপরাধে স্বামীজি মঠ থেকে তাড়িয়ে দেন। সে মা'র কাছে উপস্থিত হয়ে কেঁদে কেঁদে বলল, মা, আমি গরিব লোক, যা মাইনে পাই তাতে আমার কুলায় না। বাড়িতে সংসার আছে, তাই আমার স্বভাব এরকম। মা তাকে নিজের কাছে রেখে স্নানাহার করালেন। বিকেলবেলা স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীমাকে প্রণাম করতে এলে মা তাঁকে বললেন, দেখো বাবুরাম এই লোকটি বড় গরিব, অভাবের জন্য সংসারের তাড়নায় ওরকম করেছে, তাই বলে কি নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে? তোমরা সন্ন্যাসী—সংসারের যে বড় জ্বালা, তোমরা তো কিছু বোঝো না! লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

শ্রীমায়ের কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, একটি চোরকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে স্বামীজির বকুনি খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি হয়তো বিরক্ত হবেন। বাবুরাম মহারাজ একথা বলা মাত্র শ্রীমা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমি বলছি, নিয়ে যাও। সন্ধ্যার কিছু আগে লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে বাবুরাম মহারাজ মঠে প্রবেশ করলেন। স্বামীজি বারান্দায় বসে ছিলেন, তাঁদের দেখেই বলে উঠলেন, ওটাকে আবার নিয়ে এসেছে—বাবুরামের কাণ্ড দেখেছ? বাবুরাম মহারাজ যেই শ্রীমায়ের আদেশ জানালেন স্বামীজি আর দ্বিরুক্তি না করে লোকটিকে মঠে স্থান দিলেন।

কুড়ি

মা

'তুই তো আর মা নস'— সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে ঠিক এইভাবেই মাতৃত্বের মর্মব্যথাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শ্রীমা। বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে মাতৃত্বের স্পন্দনকে পৌঁছে দেওয়াই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা। যেখানে যেটুকু অপূর্ণতা, যেটুকু শূন্যতা রয়েছে তা যেন মাতৃত্ববোধ দিয়ে পূর্ণ করে দিতে চেয়েছেন শ্রীমা। তাঁর ভালোবাসা, তাঁর মাতৃরূপ এত আন্তরিক ছিল যে শুধু মানুষ নয়, পশুপাখিও তা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। প্রতিটি ব্যবহারে মাতৃত্বের নতুন নতুন ঝলক দেখা যেত। শ্রীমায়ের যে চিত্ররূপ আমাদের চোখের সামনে আসে তার মধ্যে মায়িক বন্ধন নেই, আছে নিঃস্বার্থ স্নেহ, সমাদর। মা প্রতিটি প্রাণীরই চিরআশ্রয়। চিরনির্ভরের স্থান। দুঃখে শোকে আমরা মাতৃকোলেরই আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু জগতের ব্যবসায়িক বুদ্ধি আমাদের লেনদেনহীন স্বার্থবুদ্ধি শূন্য মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করে অনেক সময়, সেই স্নেহ তাই ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ। বৃহতের আশ্বাস, বৃহতের সম্ভাবনায় তা উদ্দীপ্ত করে না। কিন্তু সারদা এমন এক মাতৃত্বের আশ্রয়, যেখানে সব অপরাধের ক্ষমা আছে, রয়েছে চিরআশ্রয়। তাই জীবনীকার লিখেছেন, "শ্রীমায়ের অঙ্গে এবং প্রতি কথা ও প্রতি আচরণে পূর্ণ মাতৃত্বের ছাপ এমন সুপ্রকটিত ছিল যে, যে কেহ উহার প্রভাব মধ্যে আসিয়া পড়িত তাহারই জীবনের একটা বড় অভাব পূর্ণ হইত, হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইত। রাসবিহারী মহারাজের শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় জীবনে একটা অপূরণীয় অতৃপ্তিবোধ ছিল। অপর ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত এবং অপূর্ব স্নেহের আস্বাদ পাইত, কিন্তু তিনি উহাতে বঞ্চিত ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতা ঠাকুরানির নিকট আসিয়া তিনি দেখিলেন, মা যেন তাঁহার শৈশবের পিপাসা মিটাইবার জন্য স্নেহকুম্ভ পূর্ণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সে স্নেহের কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদনে তিনি মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়া গেলেন।

"বাল্যাবস্থায় মায়ের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অবিকল নিজ জননীরূপে দেখিয়াছে এইরূপ লোকের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অবশ্য এরূপ অনুভূতি যে সর্বদা হইত তাহা নহে, কিন্তু এই দৃষ্টির প্রভাব তাঁহাদের সারা জীবনের সম্বন্ধ ও গতিকে নিয়মিত করিত। স্বামী মহাদেবানন্দ যখন জয়রামবাটীতে শ্রীমাকে দেখেন, তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার জননীই সম্মুখে উপস্থিত।"

এক রাখাল নিযুক্ত হয়েছে জয়রামবাটীতে। তার নাম গোবিন্দ। আদর করে সকলে তাকে 'গোবে' বলে ডাকত। এগার-বারো বছরের এই সদানন্দময় গরিব বালকটি মায়ের আশ্রয়ে মায়ের সন্তান হয়ে উঠল। সকলের অলক্ষ্যে ফোটা এক অমূল্যকুসুমের সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর জীবন। কোন মহাসৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ হল সে তা হয়তো নিজেই জানল না। একবার তাঁর গায়ে ভীষণ খোস দেখা দিল, বহু ওষুধেও তা সারে না। একরাত্রে যন্ত্রণায় তার

ঘুম হল না। সকালে উঠে সকলে দেখল, মা শিলে নিম ও হলুদ বেটেছেন। তারপর মাতা পুত্রে পরমযত্নে খোসগুলির উপর মলমের প্রলেপ লাগাচ্ছেন, কে বলবে এই সমবেদনা নিজের মায়ের নয়।

উদ্বোধনে এক ছোট মেয়ে শ্রীমায়ের কাছে কম্বলে শুয়ে তা নোংরা করে ফেলেছে। সকালে উঠে মেয়েটির মা সেটিকে পরিষ্কার করতে উদ্যত হলে শ্রীমা তাঁর হাত থেকে কম্বলটি কেড়ে নিলেন। মেয়েটির মা তাতে আপত্তি করে বললেন, 'আপনি কেন ধোবেন মা? মা উত্তর দিলেন, কেন ধোব না, ও কি আমার পর?

না কেউ পর নয়, সবাই তাঁর আপন। সবাই তাঁর রামকৃষ্ণের সন্তান। ভগবানের সন্তান পালনে ভগবতী তৎপরা—সকলের জন্য নিজেকে গড়ে তোলার এ কী বিস্ময়কর পদ্ধতি। জগৎ আজও সেই রহস্য ভেদ করতে পারেনি। তাই দ্বন্দ্ব, বিভেদের এখনো সম্মুখীন হচ্ছি আমরা, সন্তানরূপে মায়ের প্রতি অধিকার কতখানি গভীর ছিল তা স্বামী প্রশান্তানন্দের স্মৃতিকথাটি পাঠ করলে বোঝা যায়। —প্রশান্তানন্দ বলেনঃ "আমার মাতৃবিয়োগের পর শ্রীশ্রীমার ছবি দর্শন করি এবং তাঁহাকেই আমার মা বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। ইহার পর যখনই মার কাছে গিয়াছি, পেটের ছেলের মত ব্যবহার করিয়াছি ও পাইয়াছি; কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। ছেলেবেলা হইতে আমার খুব ঘোড়ায় চড়ার সখ ছিল। জিবট্যা হইতে ডাক্তার ঘোড়ায় চড়িয়া জয়রামবাটী আসিতেন। মাকে বলিলাম, তুমি ডাক্তারকে বলে দাও আমি তাঁর ঘোড়ায় চড়ে একটু বেড়াব। ঘোড়াটা যে দুর্দান্ত ছিল তাহা মা জানিতেন ও নানাকথা বলিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, তুমি বাপের জন্মে ঘোড়ায় চড়া; দেখনি বলে ভয় করচ, আমি ঢের ঘোড়ায় চড়েচি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা ডাক্তারকে বলিলেন, ছেলে ঘোড়ায় চড়তে চায়, তোমার ঘোড়াটা একবার দিয়ো তো বাপু। ডাক্তার সানন্দে সম্মত হইলেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িবামাত্র সে একেবারে জিবট্যার দিকে ছুটিল, কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিলাম না। অনেকদূর যাওয়ার পর বহুকষ্টে তাহাকে ফিরাইলাম বটে, কিন্তু সে ঝোপজঙ্গল বাঁশবনের ভিতর দিয়া চলিল। গা হাত ছড়িয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। মা একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া ততক্ষণ দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন আর বলিতেছিলেন কী হবে গো, ঘোড়াটা যে একেবারে বেসামাল হয়ে চলে গেল! আমাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মা আশ্বস্ত হইলেন এবং গা হাত কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া নিষেধ না শোনার জন্য বকিতে লাগিলেন। পরিধানের কাপড়খানাও ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তখনই একখানা নূতন কাপড় আনিয়া পরিতে দিলেন।"

স্বামী শ্যামানন্দের হাতে ইঁদুর দংশনের ফলে আঙুলহাড়া হয়েছে। অসুস্থ হয়ে বেলুড়মঠ থেকে তিনি মায়ের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় যখনই তিনি কেঁদে ফেলতেন অথবা উহু, আহা ইত্যাদি কষ্টসূচক শব্দ উচ্চারণ করতেন তখন শুনতেন দোতলায় মা বলছেন, আহা বাছা আমার সারা হল। বাছার আমার কী কষ্টই না হচ্ছে। সন্ন্যাসী সন্তানের প্রতি যেমন আকুলতা গৃহীর প্রতিও তাই। ময়মনসিংহ থেকে একদল ভক্ত জয়রামবাটীতে এসেছেন। দলটির নেতা বহুদিন হল শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। জয়রামবাটীতে এসে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীমায়ের সেবকদের ইচ্ছা, কাছেই কোয়ালপাড়া আশ্রম। রোগীকে সেখানে নিয়ে গেলে মায়ের উপর বেশি চাপ পড়বে না, আবার রোগীরও

চিকিৎসা ভালো হবে। তাঁরা ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে শ্রীমায়ের কাছে প্রস্তাবটি রাখলে শ্রীমা তা চুপ করে শুনে গেলেন মাত্র, স্পষ্টই মনে হল তিনি প্রস্তাবটি পছন্দ করেননি। অল্প কিছুকাল আগে শ্রীমাও রোগশয্যা থেকে উঠেছেন, ভক্তেরা তাঁকে ডাক্তারের পরামর্শ মতো প্রতিদিন বেদানার রস খাওয়াচ্ছেন। বিশ্বযুদ্ধ চলছে, এইসময় বেদানা দুষ্প্রাপ্য। তাই কলকাতা থেকে বহুকষ্টে সংগ্রহ করে আনা বেদানা সেবকের জিম্মায় রয়েছে। কারণ মায়ের হাতের কাছে কিছু থাকলেই তিনি তা বিলিয়ে দেন। আজ রোগীকে ভিন্ন আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে মাও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, রোগীকে, তাঁর সন্তানকে আজ তিনি বেদানা খাওয়াবেন। সেবকদের কোনো আপত্তি টিকল না। ভক্তটিকে বেদানা দেওয়া হল। দুপুরের আহারের পর পালকি যখন এল তখন আকাশের কোণে মেঘ জমেছে। সেবকগণ তাড়াতাড়ি রওনা হলেন কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ কালো করে বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে প্রবল বৃষ্টি নেমে এল। রুগ্‌ণ সন্তান পথে। সারাদিন পরিশ্রমের পর শ্রীমা একটু বিশ্রাম করছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির শব্দে আলুথালু বেশে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল প্রচণ্ড মর্মবেদনা, 'আমার বাছার কী হবে গো?' তাঁর নিজের শরীরও যে সুস্থ নয়—একথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছেন। সেবক অনেক অনুনয় করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, তিনি চৌকির উপর বসে করুণস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'ঠাকুর, আমার ছেলেকে রক্ষা করো।' 'ঝড়ের বেগ শান্ত হলে মা শান্ত হন আবার দ্বিগুণ বেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হলে মাও উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাইরে আসেন, চোখে জল, মুখে প্রার্থনা, 'দোহাই ঠাকুর, একটু মুখ তুলে চাও, আমার বাছাকে রক্ষা করো। বিকেল থেকে সমস্ত রাত্রি এইরকম চলল। পরদিন সেবক সন্ন্যাসী যখন ফিরে এসে জানালেন ঝড়ের সময় একজন গৃহস্থের বৈঠকখানায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন শ্রীমা শান্ত হলেন।

সন্তানের প্রতি তীব্র ভালোবাসার কোনো সীমা ছিল না। তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ততা অনেক সময় সেবক সেবিকাদের অসুবিধার কারণ ঘটাত। একদিন গোলাপ মা অনুযোগ করলেন, "তোমার যেমন হয়েছে (মা)—যে আসবে মা বলে, অমনি পা বাড়িয়ে দেবে।" মা বললেন, 'কী করব গোলাপ? মা বলে এলে আমি যে থাকতে পারিনে।'—না তাঁর কিছু করার নেই,—কারণ আমরা দায়বদ্ধতার কথা বলছিলাম। দক্ষিণেশ্বরে মৃন্ময়ী মূর্তিকে চিন্ময়ী করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর কাছেই লাভ করেছিলেন এক অঙ্গীকার, প্রতি নারীতে তাঁর অস্তিত্ব। তিনি মাতৃরূপে বিরাজিতা। এই মাতৃশক্তিকে উজ্জীবিত করার জন্য নিজ অঙ্গীকারকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন সারদার উপর। তাই—মা বলে এলে তিনি থাকতে পারেন না। কারণ তিনি সাধারণ জননী নয়, তিনি যে বিশ্বজননী। তাই জয়রামবাটীতে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল এইরকম, সময়ে অসময়ে ভক্তকুল আসছেন, "তাঁহাদের নাম, ধাম, পদবী কিছুই তেমন জানা নেই, কিন্তু প্রায় সকলেই শিক্ষিত ও পদমর্যাদাসম্পন্ন, তাহা তাঁহাদের কথাবার্তা ও চালচলনেই সুস্পষ্ট। গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখিতেছে বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পাশে পাশে ঘুরিতেছে। কিন্তু যাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে এই কল্পনাতীত লীলা চলিতেছে, তিনি সেসব দিকে দৃকপাত না করিয়া আগত সন্তানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই ব্যস্ত। আগন্তুকদের কেহ হয়তো শয্যাত্যাগ করিয়াই চা পানে অভ্যস্ত, শ্রীমা পাত্রহস্ত বাতগ্রস্ত পা টানিয়া টানিয়া চলিতেছেন—কাহার ঘরে গাই দোহানো হইয়াছে, একটু দুধ লইয়া আসিবেন চায়ের জন্য। ক্ষুদ্র পল্লীতে তরিতরকারির একান্তই অভাব। দূরের গ্রাম হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, অকস্মাৎ বহু ভক্তের আগমনে

তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। শ্রীমা প্রতিবেশীদের গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও কিছু তরকারি পাওয়া যায়। শহর হইতে বহু দূরবর্তী এই গ্রামে মুড়ি, গুড় প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোনো জলখাবার সহসা পাওয়া যায় না। তাই শ্রীমা বহু যত্নে সুজি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখেন এবং ঠাকুরের পূজান্তে প্রসাদী ফল ও হালুয়া আদি ভক্তদিগকে খাইতে দেন। কিন্তু এমনও দিন উপস্থিত হয় যখন ঐসব জোটানো সম্ভব হয় না, তখন শ্রীমা ভক্তের হাতে মুড়ি, ফুটি ও গুড় তুলিয়া দেন। ভক্ত বলিয়া উঠেন, একী খেতে দিয়েছ মা। এসব আমি খাই না। মা বুঝাইয়া বলেন, এখানে তো আর কিছু পাওয়া যায় না, বাবা—এই পাওয়া যায়। এতে অপকার হবে না খাও। যখন কলকাতা যাব, তখন ভালো করে খাওয়াব। পূর্ববঙ্গের ভক্তেরা মাছ খাইতে অভ্যস্ত, অথচ জয়রামবাটীতে মাছ দুষ্প্রাপ্য। ইহা জানিয়াও মায়ের চেষ্টার বিরাম নাই। না পাইলে দুঃখ করিয়া বলেন, আমার বাছাকে ভালো করে খাওয়াতে পারলুম না। আবার এইভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও একটুও বিরক্তি নাই, বরং ভাতৃজায়াদিগকে সগর্বে বলেন, ওলো, আমার ছেলেপিলের কোনো জ্বালা নেই, আমার একশো ছেলেও যদি আসে, আমি তাদের সকলকেই আঁটতে পারি।"

এ প্রসঙ্গে স্বামী শঙ্করানন্দের স্মৃতিকথা উল্লেখযোগ্য। বেলুড় মঠ থেকে জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে গিয়েছেন তিনি। একদিন ভোররাত্রে প্রাতঃভ্রমণের জন্য গ্রাম্যপথটি দিয়ে হাঁটার সময় দেখলেন, দুইজন স্ত্রীলোক এই অন্ধকারে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে মায়ের বাড়ির দিকেই আসছেন। কাছাকাছি আসতেই একজন স্ত্রীলোক অন্যজনের মাথায় নিজের ঝুড়িটি দিয়ে দিলেন এবং তাঁকে আড়াল করে পথ চলতে লাগলেন। সেই অন্ধকারেও দেখতে ভুল হল না সন্ন্যাসীর—ইনি শ্রীমা ছাড়া কেউ নন। ভক্তদের জন্য, সন্তানদের জন্য তরকারি আনতে গিয়েছিলেন পাশের গ্রামে। নিজের মাথায় করে বয়ে আনছেন সেই তরকারির ঝুড়ি। সন্তানকে দেখে যতই লুকোতে চেষ্টা করুন না কেন ধরা পড়ে গেলেন তিনি। শঙ্করানন্দ ঠিক করলেন, আর নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে বেলুড় মঠে। শ্রীমায়ের শিষ্য রাখাল নাগ বলেছেন, "শ্রীশ্রীমার কাছে আমি ধর্মলাভের জন্য যাই নাই, সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা তিনি যে কোন গুণে বড় তাহাও জানিতাম না। শ্বশুরঘরে যাতায়াতের পথে জয়রামবাটীতে মায়ের দরজায় অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতাম, তিনি আমাকে মুড়ি, গুড় ও জল খাইতে দিতেন। যাতায়াতের পথে তাঁহার হাতে মুড়ি গুড় খাওয়া আমার যেন একটা নিয়ম হইয়া গিয়াছিল, উহা না হইলে তৃপ্তি হইত না।" আবার শম্ভুচরণ মণ্ডলের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, বাড়িতে ঝগড়া করে প্রায় চব্বিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং জয়রামবাটীতে এসে মুনিষ নিযুক্ত হন। রৌদ্রে ঘেমে নেয়ে যখন ঘরে ফিরতেন ও 'মা, জল দাও' বলে ডাকতেন, তখন শ্রীমা তাড়াতাড়ি তাঁর জন্য জল ও গুড় নিয়ে আসতেন এবং বলতেন, 'নাও বাবা, বড় কষ্ট হয়েছে আহা! 'তারপর নিজের হাতে পাখার বাতাস দিয়ে তাঁর ঘাম মুছিয়ে দিতেন। আবার কোনো দিন শম্ভু বাইরে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত্রে ভয়ে ভয়ে বাড়িতে ফিরলে এই মাই ছিলেন সহায়, তিনি হাসিমুখে বলতেন, 'শম্ভু এসেচ বাপ! এসো ডর নাই, খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।' সন্তানকে অন্নবস্ত্রে, স্বাস্থ্যে, সম্পদে, ধনে মানে পরিপূর্ণ করে দিতেই তিনি তৎপরা। কেবল ইচ্ছা প্রকাশ বা প্রার্থনা নয়, তিনি পরিপূর্ণ করতে পারেন সেই ইচ্ছাকে। সকলের জন্য হয়ে ওঠা ও বিস্তারের এ বিচিত্র প্রকাশ।

একুশ

শ্রীমায়ের পরিবার

আমরা দেখলাম শ্রীমার চারপাশে একটি নতুন পরিমণ্ডল ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। ভ্রাতা অভয় পুত্রী রাধারানির জন্ম হয়েছে। সারদানন্দস্বামী সারদা চরণে সমাগত হয়েছেন, বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে উদ্বোধন নামে বাংলা পত্রিকা। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ নবনির্মিত বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো করেছেন। সাহেব মেম চেলা করার জন্য প্রাচীন হিন্দু সমাজের অনেকাংশের কাছে ব্রাত্য হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। মঠ যে হিন্দু ভাবধারার বিপরীতে নয় সে কথা প্রমাণেরই এক প্রচেষ্টা ছিল মঠে দুর্গাপূজা। পুজার সংকল্প হল শ্রীমায়ের নামে। কারণ স্বামীজি বলেছিলেন, 'আমরা কৌপীণধারী আমাদের নামে সংকল্প হবে না।' এইসময় শ্রীমা আত্মীয় পরিজন নিয়ে কলকাতার বাগবাজারে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে প্রায় একবছর বাস করেছিলেন। এইসময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। শ্রীমা যে বাড়িটিতে বাস করছিলেন তার পাশে একটি গলির মতো রাস্তা ছিল। রাত্রে এক চোর সেই পথে রান্নাঘরের জানলা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। পাগলি মামি সুরবালা তাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। পরে জ্ঞান ফিরলেও তাঁর উন্মাদ রোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পেল। শ্রীমাকে যোগীন মা প্রভৃতি ভক্ত-মহিলারা বললেন, এ অবস্থায় সুরবালাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। শ্রীমা এ কথায় কিছু না বললেও সন্ধ্যায় জপ করতে বসে তাঁর মনে হল, পাগল মায়ের কাছে শিশু রাধারানি খুবই কষ্ট পাচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন, এই শিশুকে ফেলে থাকা যাবে না। এরপর তিনি রাধু ও পাগলি মামিকে নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। শ্রীমায়ের জীবনের এর পরের দুবছরের ইতিহাস আমাদের অজানা। তবে এইসময় রাধারানির ভার গ্রহণ শ্রীমায়ের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই।

১৯০২-এ শ্রীমায়ের জীবনে আর একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা হল, স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীমায়ের জীবনে একটি অধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, সে বছর শিকাগো ধর্মসম্মেলনে বিশ্ব পরিচিতি লাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আবার তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমায়ের জীবনেও এল আরেক অধ্যায়। এবার তিনি এক হাতে ধববেন সন্ন্যাসী সঙ্ঘকে আরেক হাতে থাকবে, বনের বেদান্তকে কী করে দৈনন্দিন গৃহীদের জীবনে প্রয়োগ করা যায় তারই বাস্তব প্রায়োগিক রূপ! একদিকে সন্ন্যাসী অপরদিকে গৃহী—এই দুই ক্ষেত্রকে ফুটিয়ে তুলবেন তিনি। কী বলে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ? পঞ্চবটীর তপস্যায় যে সূত্র লাভ করেছিলেন তার বিস্তার ও সফল প্রতিফলন দেখাতে হবে তো? শ্রীমা এবার সেই পর্যায়ে উপনীত। স্বামী তেজসানন্দ তাঁর 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদর্শ ও ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, 'সঙ্ঘ সৃজন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং, এর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন জননী সারদামণি এবং নরেন্দ্রের উপর

ন্যস্ত হয় পরিবর্ধনের গুরুদায়িত্ব। সমগ্র মানবজাতির কোনো বিশেষ প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য একই মহাশক্তির এই ত্রিধা প্রকাশ।'

ছোট মামি বা পাগলি মামির উন্মাদ অবস্থার জন্য শ্রীমায়ের সহানুভূতি প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। তাঁর বিষয়ে একদিন বলেছিলেন, 'ও পাগল হবে না তো হবে কে? একে তো ওই কাঁচা বয়সে শোকতাপ পেয়েছে, তায় আবার কলকাতার বাড়িতে (১৬ বোসপাড়া লেনে) ভোরবেলা একটা চোরকে দেখে আঁতকে উঠে পড়ে যায়। সেই থেকে ওইরকম হয়ে গেছে।' শ্রীমা এখন পূর্ণ চন্দ্রিমা নিয়ে প্রকাশিত, তিনি ভক্ত ও দেবতাকে একসূত্রে বেঁধেছেন, একাধারে হয়েছেন দেবী এবং মানবী। মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবীর আক্ষেপ ছিল, 'ধরে বেঁধে মেয়েকে জলে ফেললুম। একটা সন্তানেরও মা হতে পারলেন না সারদা!' এই আক্ষেপ এখন কারও মনে নেই। সারদা এখন সহস্র সন্তানের মাতা। একদিন শ্রীমা মেজমামিকে বললেন, 'তোরা একটা-আধটা ছেলে নিয়ে ন্যাতাজোড়া হয়ে থাকিস—মানুষ করতে পারিসনে, আর আমি না-বিইয়ে কানাইয়ের মা—হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে মানুষ করে দিতে হচ্ছে—কেউ সাধু, কেউ অসাধু—হয়তো মাথা খারাপ করে এসে বলছে—'মা, আমার কিনারা করো!'—এসব কথা তোরা বুঝবি কী? তোদের তো আর সে আধার নেই। তোরা জানিস, টাকা, ধান, মরাই, বাড়ি, ঘর, দোর। তোরা যেমনটি এসেছিস, তেমনটিই যাবি। বলে—ভাগ্যে মনুষ্যজন্ম হয়। সেই মনুষ্যজন্ম পেয়ে তোরা করলি কী?'

জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়ে মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার বাণী শোনাচ্ছেন। তার সঙ্গে রয়েছে মাতৃ স্নেহের সুধাময় পরশ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা দেখেছি গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নটী বিনোদিনীকে। যাঁরা নতুন জীবন লাভ করেছিলেন রামকৃষ্ণের পবিত্র পরশে। শ্রীমায়ের জীবনে সে অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। সাধারণ মানুষ নীরবে এসে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাঁর স্নেহ সুধায়।

এইরকম একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে সেবক আশুতোষ মিত্রের স্মৃতিচারণে। তিনি লিখছেন, 'সেদিন পাঁচখানি চিঠি আসিয়াছে—তিনখানি পোস্টকার্ড এবং দুখানি খাম। লেখক প্রথমে একখানি খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। পত্রখানি জনাই হইতে শ্রীশ-র লেখা। তিনি লিখিয়াছেন: 'মা, শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম পূর্বক নিবেদন এই যে, দাস—'আর পড়া হইল না। ছয় পৃষ্ঠা চিঠি—মনে মনে পড়িতে কিছুক্ষণ লাগে। ততক্ষণ শ্রীমা তাঁহার [লেখকের] দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তাঁহার দিকে দেখিবা মাত্র বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। ভাবিল, জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে সে? উত্তর ঠিক করিতে না পারিয়া চিঠিখানি আলাদা করিয়া রাখিয়া অপর চিঠিগুলি পড়িয়া শুনাইল। শ্রীমা চুপ করিয়া সব শুনিলেন। শ্রীমাও কি কি উত্তর লিখিতে হইবে, বলিয়া দিলেন। সব শেষ হইলে শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন: 'ওখানা পড়লে না কেন?' আকাশ ভাঙিয়া পড়িল তাহার মাথায়। কি উত্তর দিবে? একে গুরু—তায় মাতৃরূপা—আবার মাতৃরূপা বলে মাতৃরূপা—স্বয়ং মা! কখনও যে মাকে অ-বলা তাহার কিছুই নাই। তথাপি এ-চিঠি সে কেমন করিয়া পড়িবে? ইহা যে অতীত জীবনের এমন সব কুকার্যের বর্ণনায় ভরা যাহা মনুষ্যে কী করিয়া সম্ভবপর হয়, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই অগোচর।

সঙ্গে সঙ্গে কী অকুতোভয়তা, কী অপকটতা সহকারে নিজ পাপকীর্তি ব্যক্ত করা!—ইহার যে প্রশংসা না করিয়াও থাকা যায় না।

"যাহা হউক, শুষ্ক ওষ্ঠে কম্পিত স্বরে [লেখক] উত্তর করিল : 'কি করে পড়ব মা? পারছি না যে।' শ্রীমা বলিলেন : 'বুঝেছি, পড়তে হবে না। তাকে এরকম চিঠি লিখতে বারণ করে দাও। আমার চিঠি ছেলেরা-মেয়েরা পড়ে শোনায়। দেশে কেউ না থাকলে ভায়েরা পড়ে। আর লিখে দাও—'আগে ছিলে রাহুখেগো চাঁদ, এখন ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে হয়েছ পূর্ণিমার ষোলকলায় পূর্ণ! —ভাবনা কিসের?' —এই অভয়দাত্রী রূপটির সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে, সেবাপরায়ণা ঘরের মায়ের মমতা মাখা রূপটি।

জয়রামবাটীতে এক সেবকের জ্বর হয়েছে। শ্রীমা উদ্বিগ্ন, তিনি শুশ্রূষা করছেন। তাঁর পরিশ্রম দেখে সেবকের মনে লজ্জার সৃষ্টি হচ্ছে। একটু সুস্থ হয়েই মাকে রোধ করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সফল হচ্ছেন না। শ্রীমায়ের মুখে একই উত্তর 'মা করবে না তো কি ও পাড়ার লোকে করবে?' এ প্রসঙ্গে পদ্মবিনোদের কাহিনী শুনলে মন্দ হয় না। মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর ছাত্র বিনোদবিহারী সোমকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান। তাঁর নাম কথামৃতের মধ্যেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। তিনি বাগবাজারের রামকান্ত বোস স্ট্রিটে থাকতেন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি 'পদ্মবিনোদ' নামে পরিচিত ছিলেন, যৌবনে তিনি থিয়েটারে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে অভিনয় করে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু অভিনয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি জীবনে নেমে এল চরম অশান্তি। পদ্মবিনোদ প্রচুর মদ্যপায়ী হয়ে উঠলেন। মদের নেশায় তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। শ্রীমায়ের প্রহরী স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি তাঁকে দোস্ত বলে সম্বোধন করতেন। স্থান ২/১ বাগবাজার স্ট্রিটের ভাড়া বাড়ি। রাত তখন দ্বিতীয় প্রহরের কম নয়। তিনি বন্ধ জানলায় টোকা দিয়ে 'দোস্ত' 'দোস্ত' বলে ডাকতে লাগলেন। উপরে শ্রীমা আছেন, তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে শরৎ মহারাজ চুপ করে থাকলেন। কয়েকবার ডেকে পদ্মবিনোদ, 'আমি ব্যাটা এত রাত্তিরে এলাম আর তুমি দোস্ত উঠলেও না, সাড়াও দিলে না!'—এই বলে চলে গেলেন।

পরদিন রাতে আবার পদ্মবিনোদ উপস্থিত। তখন রাত তৃতীয় প্রহর। এবার সারদানন্দ স্বামীকে নয়, স্বয়ং শ্রীমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, 'মা ছেলে এয়েছে তোমার; ওঠো মা'; আর কেবল বলা নয় সুকণ্ঠে গান ধরেন পদ্মবিনোদ,

'উঠ গো করুণাময়ী, খুলো গো কুটির দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার॥
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে।
(আমি) ডাকিতেছি মা মা বলে, 'নিদ্রা কি ভাঙে না তোমার?'

গানের প্রথম কলির সঙ্গে সঙ্গে উপরে শ্রীমার ঘরের খড়খড়ির একটি পাখি খুলে গেল। গানের চতুর্থ লাইনে মা সমস্ত জানলাটি খুলে দিলেন। নীচে শরৎ মহারাজ বলে উঠলেন, 'এই রে, মাকে তুলেছে!' শ্রীমার জানালা খুলে যাওয়ার শব্দে পদ্মবিনোদ বলে ওঠেন, 'উঠেছ মা? সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছ তো পেন্নাম নাও'—বলে রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর সেই স্থানের ধুলো মস্তকে স্থাপন করে গান গাইতে গাইতে চললেন,

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।
—'আমি দেখি, দোস্ত যেন নাহি দেখে।'

শ্রীমার খড়খড়ি বন্ধ হয়ে গেল। পরদিন সেবকেরা প্রশ্ন করলেন, ঘুমের কি ব্যাঘাত হয়েছে তাঁর, শ্রীমার সহজ উত্তর, 'ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে, তাই দেখা দিই।' এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর হঠাৎ একদিন পদ্মবিনোদের দেখা পাওয়া গেল না। বেশ কিছুদিন পর তাঁর পুত্র স্বামী সারদানন্দের কাছে এসে জানালেন, পিতার উদরী রোগ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার বন্দোবস্ত হল। ডাক্তার ট্যাপ করে পেটের জল বের করে দিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার একই অবস্থা। লুকিয়ে মদ্যপান করেছেন পদ্মবিনোদ। অবশেষে অস্ত্রোপচার করে দেখা গেল পেটের নলিগুলো পচে গিয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর শ্রীমায়ের এক সেবক তাঁকে দেখাশুনার দায়িত্বে রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই রোগী আঙুর খাওয়ার জন্য আবদার ধরলেন, কিন্তু এখন তা দেওয়া যাবে না! রাত একটার সময় রোগী সেবককে বললেন, 'আর বাঁচব না। একটা আঙুর চেয়েছিলুম—দিলিনি। তা না দিয়েছিস, বেশ করেছিস—আর চাইব না। এখন একটা কাজ কর, দোস্ত। ঠাকুরের কথা শোনা—আমার শেষ হয়ে এসেছে।' সেবক কথামৃত খুলতেই দেখলেন কথামৃতের যে অংশে পদ্মবিনোদের কথা উল্লিখিত আছে, সেই অংশটি হঠাৎই খুলে গেছে। তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন, মুহূর্তে পদ্মবিনোদের চোখের ভাবে পরিবর্তন এল, ধীরে ধীরে 'রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। শ্রীমায়ের কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঠাকুরের ছেলে যে! কাদা মেখেছিল, তা হয়েছে কী? যাঁর ছেলে, তাঁরই কোলে গেছে।'

পদ্মবিনোদ শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছিলেন ঠিকই, তাঁর আদর্শকে অন্তরে ধারণও করেছিলেন কিন্তু অসংযম তাঁর জীবনকে ভিন্ন পথে চালনা করেছিল। সংসারের কাছে ব্রাত্য হয়ে তিনি এক অপার্থিব স্নেহের কাঙাল হয়ে উঠেছিলেন, সেই ছিল তাঁর প্রকৃত জীবনতৃষ্ণা। করুণারূপিনী শ্রীমা তাঁর তৃষ্ণাকে পরিপূর্ণভাবে মিটিয়েছিলেন। তাঁকে ধরেই পদ্মবিনোদ আবার ফিরে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনায়। জেনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক রূপ করুণা ও ক্ষমারূপা হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূতা—ইনিই শ্রীমা। ইনিই সারদা।

বাইশ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (যিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ ছিলেন) শ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান। শ্রীমায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "সংসারাশ্রমে জননীর একমাত্র পুত্ররূপে আদরযত্নে পালিত হয়েছিলাম; গর্ভধারিণীর ভালোবাসাই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ করতাম। শ্রীমার সান্নিধ্যে এসে সে ভালোবাসা আলুনি লেগেছিল।" ১৯০৫-১৯০৬ সালে শ্রীমায়ের কাছে গিয়েছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। পরিচয়ের আগে মনে চিন্তা ছিল, কে পরিচয় করিয়ে দেবে। জয়রামবাটীতে যখন পৌঁছোলেন তখন মা বারান্দায় বসে তরকারি কুটছিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজিকে দেখে বললেন, 'কেমন আছ বাবা? রাস্তায় আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো?'—চিরকালের মতো আপন করে নিলেন সন্তানকে।

১৯১১ সালে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন শ্রীমা। ব্যাঙ্গালোরের গোবিন্দপুরের গুহা-মন্দির দর্শন করে সকলে যখন শ্রীমাকে নিয়ে আশ্রমে ফিরলেন তখন আশ্রমে লোকলোকারণ্য। মা গাড়ি থেকে নামলেন। মাকে দেখে দর্শনার্থী জনতা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রণাম করলেন, মা অমনি সমাধিস্থ হয়ে বরাভয় করা মূর্তিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুদূর জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত তাঁর মাতৃসুধাতে প্লাবিত করেছিলেন মা সারদা।

উদ্বোধনে একদিন পূর্ববঙ্গের একটি মেয়েকে দীক্ষা দিলেন শ্রীমা। দীক্ষার পর তাকে পাশে বসিয়ে দুপুরের খাওয়া সম্পন্ন করালেন। পরে তার হাতে এক ঘটি জল তুলে দিয়ে মা বললেন, 'হাত ধোও।' হাত ধোওয়া হলে তাকে আরেক ঘটি জল দিয়ে মা বললেন, 'পা ধোও।' মেয়েটি সেই মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেয়ে কেঁদে ফেলল, মায়ের এ আদেশ কী করে পালন করে। শ্রীমা বললেন, 'তুমি আমার কে?' সে উত্তর দিল 'আমি তোমার মেয়ে।' তখন মা বললেন, 'তবে যা বলছি শোনো। পা ধোও।'

আত্মবিলয় ছিল শ্রীমায়ের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে দু'মাসের মধ্যে হয়তো একদিনও শ্রীঠাকুরের দেখা পেতেন না। কিন্তু এতে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না। পরবর্তীকালে বলেছেন, 'মনকে বোঝাতুম, 'মন তুই এমন কী ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি!' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করতে দেখতেন তিনি। শুনতেন কীর্তনের আখর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে বাত ধরে গেল। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এই বাতব্যাধিতে কষ্ট পেয়েছেন।

কাশীপুরে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বলেছিলেন, কলকাতার লোকগুলি পোকার মতো কিলবিল করছে তুমি তাদের দেখো।' শ্রীমা সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেবল কলকাতার লোক নয় জগৎ সংসারকে মাতৃসুধায় প্লাবিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমা। তাঁর একান্ত সহচরী যোগীন মা একদিন দেখলেন, শ্রীমা কতগুলি পান শুধু চুন-সুপারি দিয়ে সাজলেন এবং কতগুলি ভালো করে নানা মশলা দিয়ে সাজলেন। যোগীন মা আশ্চর্য হয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলিতে মশলা এলাচ দিলে না? ওগুলি কার, এগুলিই বা কার? মা উত্তর দিলেন 'যোগেন এগুলি (ডানদিকে) ভক্তদের। ওদের আমাকে আদরযত্ন করে আপনার করে নিতে হবে। আর ওগুলি (অন্যগুলি) ওঁর (ঠাকুরের) জন্য, উনি তো আপনার জন আছেনই।'

যোগীন মা'র মনে একবার জেগেছিল, 'ঠাকুর দেখছি এমন ত্যাগী; কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর সংসারী—দিনরাত, ভাই ভাইপো ও ভাইঝিদের নিয়েই আছেন।' এর কিছুদিন পরে তিনি একদিন গঙ্গাতীরে বসে জপ করছেন, এমন সময় ভাবচক্ষে দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে এসে বলছেন, 'দেখো, দেখো, গঙ্গায় কী ভেসে যাচ্ছে।' যোগীন মা দেখলেন, এক রক্তাক্ত ও নাড়ীনাল বেষ্টিত নবজাত মৃত শিশুর দেহ ভেসে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, গঙ্গা কি কখনো অপবিত্র হয়? ওকেও (শ্রীমাকেও) তেমনি ভাববে, কখনো সন্দেহ কোরো না। ওকে আর একে (নিজের দেহ দেখিয়ে) অভিন্ন জানবে।

শ্রীমা তাঁর সমগ্র জীবনে দুটি সংসার দুই হাতে সামলিয়েছেন। একটি ভক্ত ভগবানের সংসার অপরটি তাঁর পিতৃকুলের বৃহৎ আত্মীয়তার সংসার। ছোটভাই অভয়চরণের মৃত্যুর পর তাঁর উন্মাদ পত্নী সুরবালা ও কন্যা রাধারানির ভার শ্রীমাই গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর শ্রীমায়ের সংসারে আর কিছুই ভালো লাগছে না। মনে মনে ভাবছেন, আর আমার এ সংসারে থেকে কী হবে? এইসময় হঠাৎ দেখলেন, লাল কাপড় পরা দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে তাঁর সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠাকুর তাঁকে দেখিয়ে বললেন, 'একে আশ্রয় করে থাকো। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।' এ ঘটনার অনেকদিন পর জয়রামবাটীতে শ্রীমা একদিন বসে আছেন। সুরবালা দেবী তখন বদ্ধ উন্মাদ। তিনি কতগুলো কাঁথা বগলে করে টানতে টানতে চলেছেন, আর রাধু কাঁদতে কাঁদতে হামা দিয়ে তাঁর পিছনে চলেছেন। এই দৃশ্য দেখেই শ্রীমায়ের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল—তিনি ভাবলেন, তাই তো, একে আমি না দেখলে আর কে দেখবে? বাবা নেই, মা ওই পাগল। তিনি ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে থাকো, এটি যোগমায়া।'

'রাধারানি' বা 'রাধু'কে আশ্রয় করে শ্রীমা এ সংসারে তাঁর বিচিত্র লীলার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কোনো কোনো ভক্ত সন্দেহ প্রকাশ করে বলত, 'মা আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধী, রাধী' করছেন। শ্রীমা বলতেন, 'এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই না 'রাধী' 'রাধী' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে, তখন আর এ দেহ থাকবে না।' আবার কখনো খুব গভীরভাবে বলেছেন, 'কী জানো, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, তখন শার্সিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।'

শ্রীমায়ের অপর তিনভাই কালীমামা, বরদামামা ও প্রসন্নমামা ছিলেন ঘোরতর সংসারী। অর্থই ছিল তাঁদের একমাত্র সম্পদ। শ্রীমা কখনো কখনো বলতেন, 'বাবা, ওরা কেবল টাকা

টাকা করেই গেল। কেবল ধন দাও ধন দাও'—ভুলেও কখনো জ্ঞানভক্তি চাইলে না। যা চাচ্ছিস তাই নে!' গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীমায়ের পিতৃকুলের সংসারটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, মামারা পূর্ব পূর্বজন্মে মাথাকাটা তপস্যা করেছিলেন, তাই বর্তমান জন্মে স্বয়ং জগদম্বাকে তাঁরা ভগ্নীরূপে লাভ করেছেন।

১৩২৫ সালের পৌষ মাসের ঘটনা। শ্রীমা বেলা দশটা এগারোটার সময় জয়রামবাটীতে সদর দরজায় রোয়াকে বসে আছেন। খামারের পথের দিকে কালীমামা এমনভাবে বেড়া দিয়েছেন যার ফলে বরদামামার ধানের বস্তা আনতে অসুবিধা হচ্ছে। এই নিয়ে দুই মামার মধ্যে প্রথমে বচসা পরে হাতাহাতির উপক্রম হল। এঁদের দুজনকেই কোলে পিঠে মানুষ করেছেন, হাতাহাতির উপক্রম হতেই তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁদের কাছে গিয়ে কখনো একজনকে বলছেন, 'তোর অন্যায়' আবার কখনো অন্যজনকে ধরে টানছেন। এইসময় সাধুরা চলে আসায় দুজনের হাতাহাতি হল না। দুই ভাই গর্জন করতে করতে নিজের ঘরে ঢুকলেন। শ্রীমাও সক্রোধে বারান্দার উপর পা ঝুলিয়ে বসলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই রাগ কোথায় মিলিয়ে গেল। হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, 'মহামায়ার কী মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে—এসব পড়েও থাকবে। জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না?—এই পর্যন্ত বলে মা হেসে কুটি কুটি হলেন। সে হাসি আর থামতেই চায় না। সংঘর্ষের মধ্যেও শান্ত শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরলেন।

প্রসন্নমামার প্রথম স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবীর দুই কন্যা নলিনী ও মাকুও (সুশীলা) শ্রীমায়ের পরিবারভুক্ত ছিলেন। শ্বশুরবাড়িতে পরিত্যক্ত মাতৃহীন এই দুই বোন শ্রীমায়ের কাছেই থাকতেন। এর মধ্যে নলিনীদি ছিলেন খুব শুচিবায়ুগ্রস্তা। তাঁর এই স্বভাবের জন্য মাকে যথেষ্ট উত্ত্যক্ত হতে হত। এ ছাড়া তাঁর মন পল্লীগ্রামের নানা সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ ছিল। এদিকে পাগলি মামি সুরবালার সঙ্গে তাঁর ছিল অহি-নকুল সম্বন্ধ। অথচ এই সংসারেই শ্রীমা নিপুণ হাতে অধ্যাত্মসাধনার দীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর এই মানিয়ে চলার বাস্তব বুদ্ধি তাঁরই কথায় প্রকাশ পেয়েছে, তিনি বলতেন, 'যা কিছু করো না কেন, সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বই কী। একটু আলগা দিয়ে সবদিক দূরে দূরে লক্ষ করতে হয়—যাতে বেশি কিছু খারাপ না হয়। আমি এই যে রাধুর ঘরে (রাধুর বিয়ে হয় তাজপুরে) তত্ত্ব পাঠাব, তা নলিনীর সঙ্গে পরামর্শ করি। ওতে ছোট বউ এত সাপে-নেউলে ও—তার ভালো দেখতে পারে না, সে ওর ছায়া মাড়াতে চায় না। কিন্তু আমি যখন নলিনীকে মুরুব্বি বানিয়ে তার পরামর্শ চাই—বলি, 'দেখ নলিনী, কী তোর পছন্দ, এইসব দেখে শুনে বল'—তখন আমি যেসব জিনিসের ফর্দ দিই, তাতে সে বলে ওতে কী করে হবে, পিসিমা? ওরা যেমনই ব্যবহার করুক—আর রাধীটা তো একটা পাগল জ্ঞানগম্যি কিছুই নেই—কিন্তু তোমার তো একটা মর্যাদা আছে, তুমি অত ছোট নজরে দেখতে যাবে কেন, পিসিমা? তুমি তোমার মতন করে দাও'—এই বলে ফর্দ বাড়ায়। আমিও মনে মনে হাসি। ওইটুকু যদি ওকে না জানিয়ে সেখানে তত্ত্ব পাঠাই, অমনি দুজনে তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাবে। দেখো, সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নিচু হয়ে চলতে হয়। আমি এই থিহি নিয়ে তাদের হাওয়া বুঝে কত সাবধানে চলি; তবু সময় সময় লেগে যায়—যেন ওটা হচ্ছে ওদের স্বভাব। কী করব বলো? ভাবি, তাঁর সংসার, তিনিই দেখছেন।

এক সন্ন্যাসী সন্তান শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কি সকলের মা!' মা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ! পুনরায় প্রশ্ন করলেন সন্ন্যাসী 'এইসব ইতর জীবজন্তুরও'? মা বললেন, 'হ্যাঁ, ওদেরও।' রাধুদি একটি বিড়াল পুষেছিলেন। তার জন্য রোজ এক পোয়া করে দুধের বন্দোবস্ত হয়েছিল। বিড়ালের স্বভাব চুরি করে খাওয়া। মা বলতেন, 'চুরি করা তো ওদের ধর্ম, বাবা, কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে? কোনো কোনো সময় শ্রীমা লাঠি তুলে ভয় দেখালেও বিড়ালটি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাঠি ফেলে দিতেন। জনৈক জ্ঞান মহারাজ বিড়ালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি একদিন বিড়ালটিকে তুলে আছাড় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল। তিনি জ্ঞান মহারাজকে বলেছিলেন, 'দেখো জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।' এ কথা শোনবার পর থেকে জ্ঞান মহারাজের হাত বা লাঠি চলে না। নিজে নিরামিষ খেলেও বিড়ালের জন্য রোজ চুনা মাছ ভেজে ভাতের সঙ্গে দেন। মায়ের বাড়িতে গঙ্গারাম নামে এক পোষা চন্দনা ছিল। সকাল-সন্ধ্যায় মা তার কাছে এসে বলতেন, 'বাবা গঙ্গারাম পড়ো তো?' পাখি বলত 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম; কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাম রাম। মায়ের মুখে মুখে শুনে ব্রহ্মচারীদের নামগুলোও গঙ্গারাম ভালো করে শিখে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে ডেকে উঠত। 'মা, ওমা।' অমনি মা উত্তর দিতেন 'যাই, বাবা যাই।' পাখির মা বলে ডাকার অর্থ হল তখন তার খিদে পেয়েছে।

এক গৃহস্থ যুবক ভক্ত মাকে বললেন, 'মা, আমি সংসারে অনেক দাগা পেয়েছি; তুমিই আমার গুরু, তুমিই আমার ইষ্ট, আমি আর কিছু জানি না। সত্যই আমি এত সব অন্যায় কাজ করেছি যে, লজ্জায় তোমার কাছেও বলতে পারি না। তবু তোমার দয়াতেই আছি।' মা স্নেহভরে সন্তানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'মায়ের কাছে ছেলে, ছেলে।' সন্তানটি সেই স্নেহস্পর্শে বিগলিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মা, কিন্তু এত দয়া তোমার কাছে পেয়েছি বলে যেন কখনো মনে না আসে যে তোমার দয়া পাওয়া বড় সুলভ।

শ্রীশ্রীমায়ের দৈনন্দির ব্যবহারও মাতৃত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকত। রাধুর এক খুড়শ্বশুরের উদ্দেশে মা নিমন্ত্রণ পত্র লেখাচ্ছিলেন। বললেন, 'লেখো—বাবাজীবন!' রাধুর মা শুনে বললেন, 'সে কী গো সে যে তোমার বেয়াই।' মা উত্তর দিলেন, তা হোক, সে আমাকে মা বলে আনন্দ পায়, আমি তার কাছে তাই।' স্বামী তন্ময়ানন্দ একদিন শ্রীমাকে বললেন, 'মা আমি পাড়াগাঁয়ে লোক, কখন আপনাকে আপনি বলি, কখন বা তুমি বলে ফেলি—আমাদের তুমি বলা অভ্যাস। আপনার কাছে কত যে অপরাধী হই তার কী হবে? মা হাসতে হাসতে বললেন, তাতে অপরাধ কী? মা'র সঙ্গে ছেলে কী অত হিসেব কিতেব করে কথা কইবে?'

শ্রীমাকে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে কোনো সেবক বলেছিলেন মা, আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন। কষ্টটা আমায় দিন না? মা ধমকে উঠে বললেন, 'বলো কী? ছেলে! মা কখনো ছেলেকে দিতে পারে? ছেলের কষ্ট হলে যে মা'র আরও বেশি কষ্ট হয়ে থাকে! জাতিধর্ম নির্বিশেষে নানা স্থান থেকে নানা ভক্তের সমাগম হত। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত আলোড়ন তিনি শান্ত স্থির। উদাসীন। সন্তানরা যেতেন তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্য। অধ্যাত্মপথের দিশা

দেখিয়ে শ্রীমা তাঁদের ঠাকুরের ফল মিষ্টি হালুয়া প্রভৃতি ভালো প্রসাদগুলি খেতে দিয়ে নিজের বেতো পা দুটি বারান্দায় ছড়িয়ে, কোঁচড়ে মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা নিয়ে বসতেন। তিনি যে 'জন্ম জন্মান্তরের মা'। এত অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রীমা তাঁর কোনো আত্মীয়কে বলেছিলেন, 'ওগো, আমার ছেলেপুলের কিছু জ্বালা নেই, আমার একশো ছেলে যদি আসে, আমি সকলকেই আঁটতে পারি।' কখনো কখনো অনুচ্চস্বরে তাঁকে বলতে শোনা যেত 'ছেলেরা তোরা আয়।' কেউ হয়তো বহুপথ অতিক্রম করে জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। দেখলেন সামনেই ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধা, 'মায়ের বাড়ি কোথা? মায়ের কাছে যাব!' সন্তানের মুখে এ প্রশ্ন শুনে করুণাময়ীর চোখ দুটি নরম হয়েছে স্নেহে। মৃদুকণ্ঠে জানিয়েছেন তাঁর যথার্থ পরিচয়, 'বাছা, আমিই মা!'

তেইশ

চৈতন্যদায়িনী সারদা

পদ্মবিনোদের কাহিনীর প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে আসতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কল্পতরু হয়েছিলেন শ্রীমায়ের জীবনে কি এইরকম আশীর্বাদ বিতরণের মহাক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল? নিশ্চয়ই, শ্রীমাও শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ছিলেন চৈতন্যদায়িনী এক মহাশক্তি।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছিলেন। দেহরক্ষার আগে নিজের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তিনি একদিন সকলকে আশীর্বাদ করে বলে উঠেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' এই ঘটনার কয়েকমাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ চলে গেলেন। ধরাধামে তাঁর লীলাখেলার একটি পর্যায় শেষ হল, সূচনা হল আরেকটি পর্যায়ের। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চৈতন্য বিতরণের কার্যভার সম্পূর্ণ করে গেলেন সারদা মায়ের উপর।

এই দায়িত্বভার সমর্পিত হয়েছিল নীরবেই। কাশীপুরে এক মধ্যাহ্নে হঠাৎই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে উদ্দেশ করে বলে উঠেছিলেন, 'দেখো গো, কলকাতার লোকগুলি পোকার মতো কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখো।' শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর প্রায় কুড়ি বছর ধরে সারদামণি মা এই ভার পালন করেছেন : এই ভার গ্রহণ করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মতো প্রতিদিনই হয়ে উঠেছিলেন কল্পতরু।

'চৈতন্য হোক' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে উচ্চারণের আগে উচ্চারণ করেছিলেন নটী বিনোদিনীর কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপর বিগ্রহ সারদার জীবনেও আমরা সেইরকম একটি ঘটনা লক্ষ করি। সারদামঠের প্রথম অধ্যক্ষ প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা আমাদের এই স্মৃতিচিত্রটি উপহার দিয়েছেন। তাঁর কথায়, একদিন মা সারদা অনান্য কয়েকজন ভক্ত মহিলার সঙ্গে গিয়েছেন থিয়েটার দেখতে। অভিনেত্রী তারাসুন্দরী তখন রামানুজ পালা অভিনয় করছেন। তাঁর সুন্দর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলেন শ্রীমা। অভিনয়ের পরে তারাসুন্দরী প্রণাম করলে তিনি তাঁকে বলে উঠলেন, 'তোমার চৈতন্য হোক।'

শ্রীমায়ের জীবনে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মতো কোনো নির্দিষ্ট 'কল্পতরু দিবস' দেখতে পাই না সত্যি, কিন্তু সমস্ত জীবন তিনি মানুষকে অভয়দান করে গিয়েছেন, তার মধ্যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। সারদার জীবন মহিমান্বিত কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী হিসাবে নয়, তিনি নিজেকে এক অতুলনীয় মাতা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীমার জীবনের প্রথম ও শেষ কথা হল মাতৃত্ব।

আকাশ বাতাস জুড়ে আমরা এই মাতৃত্বকে পরিব্যাপ্ত হতে দেখি। তিনি 'মাতৃরূপী কল্পতরু।' দক্ষিণেশ্বরে এক নষ্টা নারীর হাতে তিনি নির্দ্বিধায় তুলে দিয়েছিলেন প্রিয়তম পতির ভাতের থালা। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবাদ করলে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'আমায় মা বলে কেউ ডাকলে, আমি তাকে ফেরাতে পারব না।'— মাতৃরূপী কল্পতরুর এই ছিল প্রথম প্রকাশ। জীবনে তিনি দিতে এসেছিলেন, দেবীরূপে, মানবীরূপে। তাঁর জীবনে কেবল ছিল

দান, গ্রহণ নয়। কল্পতরুর কাছ থেকে চাইতে হয়, পুরাণে যে কল্পবৃক্ষের কথা আমরা জানি তাঁর কাছে গিয়ে চাইলে তবে মনস্কামনা পূরণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়েও বহু মানুষ, বহু কিছু চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার মাপকাঠি ছিল বড় বেশি, কিন্তু মা সারদা 'গণ্ডিভাঙা মা।' তাঁর কাছ থেকে চাইতে হয় না, তিনি নিজেই সন্তানের প্রয়োজন বুঝে ছুটে আসেন। তিনি কেবল নিত্য কল্পতরু নন, প্রতিটি মুহূর্তে কল্পতরু, প্রতিটিক্ষণে তিনি দেওয়ার জন্য ব্যগ্র।

স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণির এই কল্পতরু রূপটি কী করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা একটি ঘটনার মাধ্যমে বুঝতে পারি। কালীপদ ঘোষ নামে এক গৃহীভক্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের, প্রথম জীবনে কালীপদ ঘোষ ছিলেন মদ্যপ। কিছুটা বেহিসেবি জীবনের অধিকারী। এই ধরনের স্বামীকে নিয়ে নিত্য সংসার জীবনে অতিষ্ঠ কালীপদ ঘোষের পত্নী একদিন দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হলেন। তিনি শুনেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে এক সাধু আছেন, তাঁর কাছ থেকে যদি ওষুধ পাওয়া যায়। সে ওষুধে স্বামীকে সংসারমুখী করতে পারবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আবেদন শুনে বুঝলেন, ভুল সন্ন্যাসীর কাছে এসে পড়েছেন মহিলা। তবু তাঁর হৃদয়ে কোথায় যেন এক মমতার সৃষ্টি হল। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন, 'বাছা, আমি কিছু জানি না। ওই নহবতে এক রমণী থাকেন তিনি তোমায় কিছু ওষুধ বলে দিতে পারবেন।' নহবতে তখন সারদামণি থাকতেন, সমাধান লাভের আশায় মহিলাটি তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পাঠিয়েছেন শুনে অবাক হলেন সারদামণি, 'না বাবা, আমি তো কিছু জানি না, তুমি ওঁর কাছেই যাও, উনিই পরমহংসদেব।' মহিলা ফিরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আবার পাঠালেন নহবতের দিকে। এইভাবে কয়েকবার ঘোরাফেরা করলেন মহিলাটি। অবশেষে তাঁর দুঃখ দেখে সারদার দয়া হল। যে দায়িত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ সমর্পণ করতে চাইছিলেন সেই দায়িত্ব যেন নীরবে স্বীকার করলেন। ভদ্রমহিলার হাতে তুলে দিলেন একটি বেলপাতা। বললেন, 'যাও মা, এই বেলপাতাটি নিয়ে যাও। এটিতেই তোমার সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।' আনন্দে ফিরে এলেন মহিলা! পরবর্তীকালে তাঁর বিপথগামী স্বামীই শ্রীরামকৃষ্ণের একজন উল্লেখযোগ্য গৃহী শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্তবগাথায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'অবতার বরিষ্ঠ' বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীমা সম্বন্ধে স্তবটি রচনা করেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। এখানে তিনি লজ্জাপট্টাবৃতা সারদাকে 'যুগধর্মপাত্রী' বলে চিহ্নিত করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে নিরক্ষর এই যুগধর্মপাত্রীর প্রকাশভঙ্গি কেমন ছিল তার ছোট্ট একটি ছবি আমরা দেখতে পারি। শ্রীমাকে দর্শন করেছেন এমন একটি ভক্ত তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'আমি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই সেদিন আমার শরীর ছিল খুবই অসুস্থ। ..... কোনোরূপে বাগবাজার মায়ের বাড়িতে ঢুকিয়াই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে সিঁড়ির পাশে একটি লম্বা ঘরের দরজায় মাকে পাইলাম। স্নান করিতে চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই একটু হাসিয়া বলিলেন, 'কোথা থেকে এসেছ বাছা, কেন এসেছ?' বলিলাম, 'মা'কে দর্শন করতে এসেছি।' অমনি মা বলিলেন, 'বাছা, আমিই মা।' কেবল সেদিন এই সন্তানটিকে নয়, জগতের সকলের কাছে বারংবার তিনি এই পরিচয়টি তুলে ধরেছেন।

আমাদের জীবনে বহু চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু চাহিদা আধ্যাত্মিক, কিছু জাগতিক। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের চারপাশে আধ্যাত্মিক রথী মহারথীদের ভিড় বেশি। নরেনকে স্পর্শ করে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উপলব্ধি করাচ্ছেন। কোনো ভক্ত তাঁর কাছে জ্ঞান লাভ করতে চাইছেন, কেউ বা নির্বিকল্প সমাধির জন্য আকুতি জানাচ্ছেন। এ ছাড়া কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদনের মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা, তাঁর অবস্থিতি ছিল জাগতিক চাহিদার বহুদূরে। তবু কল্পতরুর দিন তাঁর কাছে কেউ স্বাস্থ্য চেয়েছিলেন, কেউ চেয়েছিলেন অর্থ। কিন্তু সারদামণির জীবনে সেইসব মানুষেরই সমাগম হত বেশি, যাঁরা জাগতিক চাহিদা নিয়ে জাগতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে, হতাশা নিয়ে ছুটে আসতেন এবং 'আমি যে মা, আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে তবে আমাকেই তো ধুয়ে মুছে কোলে তুলে নিতে হবে।' এই বাণীতে আশ্বস্ত করে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করতেন সারদা। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে আমরা এক মহিলার স্মৃতিচারণ পাই, তিনি বলছেন যে একদিন তিনি মায়ের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন দুই বিবাহিত মহিলা মায়ের কাছে কিসের জন্য যেন আকুতি জানাচ্ছেন। তিনি অসচেতনভাবে সেখানে গিয়ে পড়লেন ও বুঝতে পারলেন, সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন মহিলারা। এবং সত্যি সত্যি কিছুদিন পর দুই মহিলার মধ্যে একজনকে সন্তানবতী হতে দেখেছিলেন তিনি।

উদ্বোধনের বই প্যাক করার কাজ করতেন চন্দ্রমোহন দত্ত। তাঁর পরিবারের সকলেই ছিলেন মায়ের খুবই প্রিয়। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রমোহন দত্তের স্ত্রীর একটি স্মৃতিকথা পাই। তার মধ্যে তিনি এক অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন, 'একদিন উনুনে জল চাপানো আছে। ডাল কিছুটা শুকিয়ে যাওয়ায় ঘটিতে করে জল নিয়ে কড়াতে ঢালার সময় হাত ফসকে ঘটিটা কড়ার মধ্যে পড়ে গেল। কড়ার গরম ডাল চলকে আমার গায়ে হাতে লাগল। ভীষণ জ্বালা—সহ্যের বাইরে। যন্ত্রণায় চিৎকার করছি। আমার স্বামী ঘরে ছিলেন। ওই চিৎকারে বেরিয়ে এসে আমার অবস্থা দেখে ছুটে মায়ের কাছে গেলেন। মাকে সব বলাতে মা একবাটি সরষের তেল নিয়ে ঠাকুরের নাম জপ করে দিলেন। বললেন, "এটা এক্ষুনি নিয়ে গেয়ে পোড়া জায়গাগুলোতে লাগিয়ে দাও।" উনি এসে তাই করলেন। কী বলব, অবাক কাণ্ড, কয়েক মিনিটের মধ্যেই অত জ্বালা যন্ত্রণা কোথায় চলে গেল!'

এইরকমই আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল জয়রামবাটীতে। সেবার বর্ষায় জল বৃষ্টি হল না। চারিদিকে জলের জন্য হাহাকার। চাষিদের খেত শুকিয়ে কাঠ। গ্রামবাসীরা প্রকৃতির খেয়ালে ক্রমশই ভীত হয়ে উঠলেন, এবারে বুঝি খেত ফসলহীন হয়ে যায়, অনাহারে মরতে হবে তাঁদের। কয়েকজন অবশেষে উপস্থিত হলেন সারদার কাছে, বাংলার লোক সংস্কৃতি থেকে, লোকজীবন থেকে উঠে আসা এই লোকজননীর কাছে আবেদন জানালেন তাঁরা, 'এবার না খেয়ে মরতে হবে।' তার পরদিন কয়েকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে খেতে ফসলের অবস্থা বুঝতে ছুটলেন মা সারদা। বিকেলের মধ্যে নেমে এল আকাশ জুড়ে বৃষ্টি, সেবার এমন ফসল হল যা অন্যবারে হয় না।

কোনো এক নাছোড়বান্দা ভক্তের প্রশ্ন ছিল, 'মা তুমি কে?' মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'লোকে বলে কালী।' কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এক ভক্তকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি মায়ের কাছে গিয়েছিলে, মা তোমায় কী বললেন?' ভক্তটি জানালেন, 'মা কোনো কথা বলেননি,

কেবল একবার তাকিয়েছিলেন।' একথা শুনে শ্রীম আনন্দে বলে উঠলেন, 'সদানন্দে সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।'—যিনি দৃষ্টিপাতেই মানবের কল্যাণ করতে পারেন তাঁর কাছে চাওয়া কী? বাস্তবিকই সকলেই যে কিছু কামনা নিয়ে আসতেন তা নয়, মাতৃচরিত্রের গভীরতায়, ভালোবাসায় বাঁধা পড়তেন অনেকে। মা তাঁদের প্রয়োজন আপনা থেকেই মিটিয়ে দিতেন। শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবী তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, যখন তিনি জয়রামবাটীতে দীক্ষা নিতে যান, তখন তাঁর হাতে হিস্টিরিয়া রোগ প্রতিকারের জন্য একটি রুপোর তাবিজ ছিল। কেউ সেই রোগের কথা মনে করিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেত। একদিন জয়রামবাটীতে মায়ের সামনে এক ভক্ত মহিলা তাবিজ পরার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মা তাঁকে বকে উঠলেন। বললেন, 'কোনো রোগের জন্য পরে থাকবে, এ নিয়ে প্রশ্ন করা কেন!' তারপর ব্রজেশ্বরী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ থেকে তোমার আর তাবিজের প্রয়োজন নেই, এই রোগ আপনা আপনিই সেরে যাবে।' সত্যিই ব্রজেশ্বরী দেবীর আর কোনো তাবিজের প্রয়োজন হয়নি।

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, ১৩২৬ সালে পৌষ সংক্রান্তির সময় তিনি জয়রামবাটীতে পৌঁছোলেন। পথে যেতে যেতে 'মায়ের কাছে পিঠা খাব'— এই সাধটি তাঁর হয়েছিল, কিন্তু লজ্জায় তা কারও কাছে প্রকাশ করেননি। দুপুরে আহারের সময় দেখলেন তাঁর পাতে পিঠে দেওয়া হয়েছে। পিঠেগুলি দেখামাত্রই তাঁর মনে হল, মা কতগুলো শুকনো পিঠে পাঠালেন কেন? একটু দুধ কি সঙ্গে জুটল না? ভাবনা মাত্রই তিনি শুনলেন মা পরিবেশককে উদ্দেশ করে বলছেন, 'ছেলেদের শুকনো পিঠে দিয়েছ কেন? শিগগির দুধ পাঠিয়ে দাও।'

মাতৃরূপ কল্পবৃক্ষটি মাতৃসাধুরসে এতটাই পরিপুষ্ট ছিল যে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগত, আমাদের ঘরেও তো একজন গর্ভধারিণী মা রয়েছেন, কিন্তু শ্রীমার মতো ভালোবাসতে পারে কজন? তরুণ ব্রহ্মচারী জয়রামবাটী গিয়েছেন, মা তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হওয়ার পথ বলে দিয়েছেন, তার পরমুহূর্তে সেই সন্তানের জন্য গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে একটু দুধের খোঁজে ফিরেছেন, কারণ তাঁর ছেলের চা খাওয়ার অভ্যেস! সারদা নিজেই বলেছেন, 'এই জগতে কার উপর আমার সন্তানভাব নেই তা আমি জানি না।' কোনো এক ভক্ত নানা কারণে ভীত হয়ে মাকে জানালে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'বাবা, আমার সন্তানের ক্ষতি করবে এমন সাধ্য বিধাতারও নেই।' এই আশীর্বাদের রক্ষাকবচ তিনি সকলকে পরিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'বাবা, যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, তাদের সকলকে বলে দিয়ো আমার আশীর্বাদ সকলের জন্য রইল।'

একদিন সকালে এক ব্রাহ্মণ যুবক জয়রামবাটীতে উপস্থিত হলেন। মাকে প্রণাম করে বললেন, 'মা, এতদিন ছাত্রজীবনে বেশ নিশ্চিন্ত ও আনন্দে ছিলাম। কিন্তু এখন সামনে জাগতিক সুখ-দুঃখের তরঙ্গ—সব দেখেশুনে আমার মন খুব ভীত। আমার পক্ষে কোন পথ কল্যাণকর হবে, আমি স্থির করতে পারছি না।' অনেকক্ষণ নিবিষ্ট মনে সমস্ত কথা শুনে শ্রীশ্রীমা বললেন, 'বাবা ভয় কী?' সুখ-দুঃখ পূর্ণ এ জগৎ, তোমাদের কোনো ভয় নেই। বাবা, জীবনের সকল সময় সকল অবস্থায় মনে রেখো—আমার একজন মা আছেন।' মাতৃরূপা কল্পতরু বৃক্ষের কাছ থেকে এই হল চরম অভয়বাণী।

চব্বিশ

রাধারাণী

শ্রীমতী রাধারানি ও তাঁর গর্ভধারিণী পাগলি মামি শ্রীশ্রীমায়ের অসাধারণত্বকে জানতেন না, এমন নয়। অন্তরের অন্তস্তলে নিকটজনের মধ্যেও পৃথক বৈশিষ্ট্যটিকে খুঁজে পেতেন তাঁরা। তবু স্বভাবের বশে শ্রীমায়ের প্রতি এক বিচিত্র মানসিকতা প্রকাশ পেত। একদিন উদ্বোধনে বসে আছেন শ্রীমা, অসাবধানবশত পাগলি মামির পায়ে শ্রীমার করস্পর্শ হয়েছে। অমনি সুরবালা দেবী অস্থির হয়ে উঠলেন, 'কেন তুমি আমার পায়ে হাত দিলে? আমার কী হবে গো!' তাঁর অস্থিরতা দেখে জনৈক সেবক বললেন, 'মা, দেখেছ, এদিকে পাগলি তোমাকে এত গালাগাল করে, মারতে আসে, কিন্তু তোমার হাত তার পায়ে লেগেছে বলে তো খুব ভয়।' শ্রীমা এর উত্তরে বললেন, 'বাবা, রাবণ কি জানত না যে রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, সীতা আদ্যাশক্তি জগন্মাতা—তবুও ওই করতে এসেছিল! ও (পাগলি) কি আমাকে জানে না! সব জানে, তবু এই করতে এসেছে!'

সুরবালা দেবীর কথা পৃথক, তাঁর উন্মাদ রোগের কারণ ছিল। কিন্তু রাধারানির মায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা আমাদের দুঃখের কারণ হয়। রাধারানিকে অবলম্বন করেই শ্রীমা ভক্তসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন, তবু রাধারানি এই আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিলেন না। কেন্দ্র থেকে সর্বদাই পৃথক ছিলেন। অনেক কাল পরের কথা, শ্রীমা তখন এই ধরাধামে নেই, ১৩৪৭ সাল। শ্রীমায়ের অদর্শনের পর রাধুর স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। অবহেলিত রাধারানির স্থান জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের ব্যবহৃত ঘরখানি। কিছুদিন থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগতে ভুগতে কাবু রাধারানিকে নিবেদিতা স্কুল বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। উদ্বোধন পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বামী আত্মবোধানন্দজি ডাক্তার দেখালে ডাক্তার জানালেন, রোগটি টি. বি। তখন কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম ছিল। সেবাশ্রম অর্থাৎ প্রথম হাসপাতাল। রাধুদির টি. বি হয়েছে জেনে সকলে তাঁকে কাশী সেবাশ্রমে নিয়ে যাওয়াই সঠিক বিবেচনা করলেন। একে সেবাশ্রম অপরদিকে বারাণসীধাম। হিন্দুর বিশ্বাস কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তিলাভ হয়। জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে নিস্তার লাভ করে মানুষ। শ্রীমায়ের একান্ত সেবক বরদা মহারাজ সেবিকাসহ রাধুদিকে কাশীতে নিয়ে উপস্থিত হলেন। সেবাশ্রমে এক্সরে করে দেখা গেল দুটি ফুসফুসই বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছে—প্রতিদিন ১০২° জ্বর ও কাশি। জীবনের কোনো আশা নেই।

রাধুদির সেবা-শুশ্রূষার সবরকম ব্যবস্থা করে বরদা মহারাজ ফিরে আসছেন। রাধুদির কাছে বিদায় নিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'রাধু, আমি আজ কলকাতা ফিরছি। তুমি নিশ্চিন্তভাবে থাকো, সুস্থ হয়ে জয়রামবাটী যাবে। প্রিয় মহারাজ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও দেখাশুনা করছেন। কোনো চিন্তা কোরো না। পরে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।' বরদা মহারাজ যখন

এই কথা বলছেন তখন রাধুর জ্বর বাড়ছে, ঘরে বরদা মহারাজ, প্রিয় মহারাজ ও সেবিকা। বরদা মহারাজের কথা শুনে রাধু ক্ষীণকণ্ঠে কিন্তু একটু ঝাঁজালো সুরে বলতে লাগল, 'আহা, হা! বলি গোপালদা, তোমার কী বুদ্ধি গো! আমার কী অসুখ হয়েছে তা আমি জানি, তোমরা যতই গোপন করো না কেন, আমার যক্ষ্মা হয়েছে—এ রোগে বুঝি আবার কেউ বাঁচে নাকি? তাই তুমি বলছ—'ভালো হয়ে জয়রামবাটী যাবি।'....তুমি সব জেনেশুনে বাজে কথা বলছ। তুমি কাশীতে রেখে যাচ্ছ, কারণ কাশীতে মরলে আমার মুক্তি হবে। এতদিন মায়ের কাছে থেকে এই বুদ্ধি হল তোমার? যিনি জন্মাবধি আমার সব ভার নিয়ে সকল ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর সেই ঘরখানিও আমার ব্যবহারের জন্য জীবনস্বত্ব করে গেছেন, আমি তাঁর চিরআশ্রিত। তিনি কী আমার 'মুক্তি'র ব্যবস্থা করেননি? আমি যদি আস্তাকুঁড়েও পড়ে মরি, আমার মুক্তি তাঁর কৃপায় আমার হাতের মুঠোয় (হাত মুঠ করে), সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না দাদা। আমার মৃত্যুর যে-স্থান মা ব্যবস্থা করে গেছেন, সেখানেই মরব। তোমাদের ভাবতে হবে না।' বরদা মহারাজ তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'রাধুর সেই দৃঢ় বিশ্বাসের দৃপ্ত ঘোষণা আজও আমার কানে ধ্বনিত হইতেছে।' সকলের অনুরোধে রাধু অল্প কয়েকদিন কাশীতে থেকে জয়রামবাটী ফিরে আসেন এবং কয়েকমাস পর শ্রীমায়ের নতুন বাড়িতে তাঁর ঘরটিতেই দেহত্যাগ করেন। সেদিনটি ছিল ১৯৪০-এর, ২৩শে নভেম্বর।

সারদামাকে শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছিলেন রাধারানি হলেন যোগমায়া। অর্থাৎ যাঁকে কেন্দ্র করে বা আশ্রয় করে নতুন সাধন পদ্ধতি লোকসমক্ষে তুলে ধরা হয়। শ্রীমার ক্ষেত্রেও রাধারানি হয়েছেন লীলার মাধ্যম। সাধারণ মানুষ যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে তখন তারা দেখেছে, ভাইঝির প্রতি অনুরাগী এক গ্রাম্য বিধবাকে। যিনি আর পাঁচজন সংসারীর মতোই। কিন্তু তাঁর এই আপাতরূপের আবরণে ছিল প্রকৃত রূপটি। যা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল না। যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা জেনেছিলেন, একটি ভাবান্দোলন গড়ে উঠছে। একটি নতুন নারী আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছে নীরবে। গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যেই এ আন্দোলন আজ সীমাবদ্ধ হলেও কালের প্রবাহে তা বৃহৎ রূপ ধারণ করবে।

শ্রীমা তাঁর ভাইঝিদের কেবলমাত্র আদর দিয়েই রাখতেন, তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে বুঝতে দিতেন না—তা নয়। যে জীবনাদর্শ তিনি জগতের জন্য রেখে গিয়েছেন, সেই জীবনাদর্শ তিনি আত্মীয়াদের মধ্যেও সংক্রামিত কবতে চেয়েছেন। কিন্তু যোগ্য আধার না হওয়াতে, সেই আদর্শ অনুসারী হয়ে উঠতে পারেনি কেউ। একদিন মনসা নামে একটি ছেলে শ্রীমায়ের কাছে এসেছে। তার ইচ্ছা মায়ের কাছে সন্ন্যাস ও দীক্ষা গ্রহণ। শ্রীমা সানন্দে তাকে সন্ন্যাস দিলেন। আনন্দিত মনসা গান ধরেছেন,

'আর কিছু নাই সংসারের মাঝে
কেবল শ্যামা সার রে।'

—শ্রীমা গান শুনে খুব আনন্দিত। এমন সময় মহিলাদের মধ্যে কেউ মন্তব্য করলেন, 'ঠাকুরঝি ওই ছেলেটিকে আজ সাধু করে দিলে।' ভাইঝি মাকুদি সেই কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলেন, 'তাই বটে। পিসিমার যেমন কাজ! অমন সব ভালো ভালো ছেলেদের সাধু করে দিচ্ছেন! বাপ-মা কত কষ্টে মানুষ করে মুখ চেয়ে আছে, তাঁদের কত আশা! সেসব চুরমার

হয়ে গেল। এখন উনি হয় হৃষীকেশে গিয়ে ভিক্ষা করে খাবেন, না হয় রোগীর সেবায় গু-মুত ঘাঁটবেন! বে-থা করা—সেও তো একটা সংসার-ধর্ম। পিসিমা, তুমি যদি ওরকম সাধু করে দাও, মহামায়া তোমার উপর চটে যাবেন। সাধু হতে হয় নিজেরা হোক গে। তোমার নিমিত্ত হতে যাওয়া কেন?'

মাকুদির কথা শুনে শ্রীমা বললেন, 'মাকু, ওরা সব দেবশিশু, সংসারে ফুলের মতো পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের আর কী আছে, বল দেখি? সংসারে যে কী সুখ, তা তো সব দেখছিস। স্বামী-সুখও দেখলি। এখনও লজ্জা হয় না, আবার স্বামীর কাছে যাস? এতদিন আমার কাছে থেকে কী দেখলি? এত আকর্ষণ, এত পশুভাব কেন? কী সুখ পাচ্ছিস? ফের যদি স্বামীর কাছে যাবি, দূর করে দেবো। পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না? এখনো কি ভাইবোনের মতো থাকতে পারবিনি? খালি শুয়োরের মতো থাকতে চাস! তোদের সংসারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে গেল।'—শ্রীমা এই কথাগুলি নরমভাবে না বলে যেন একটু উষ্ণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন। সকলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইল। শ্রীমা বলে চললেন, 'মাকু ভগবানকে ডাকুক আর না ডাকুক যে বে না করে, সে তো অর্ধমুক্ত। তার যে সময়ে একটু ভগবানে মন হবে, সেই সময়েই সে হু হু করে এগুতে থাকবে।' (মাতৃসান্নিধ্যে, পৃ. ১৫৮)।

সংসারকে সাধনার অন্তরায় কতখানি মনে করতেন তার একটি ছবি এঁকেছেন স্বামী সারদেশানন্দ। তিনি বলছেন, "সংসারের বোঝা, দায় মা কিরূপ ভয়াবহ মনে করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। জয়রামবাটীর উত্তর দিকে আমোদর নদ পার হইলে বিখ্যাত দেশড়া গ্রাম। সেখানে যথার্থ ঘোষ নামে এক সম্পত্তিশালী গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে কিছুকাল কোন ডাক্তারের কম্পাউন্ডার ছিলেন, পরে স্বগ্রামে বাস করিয়া ডাক্তারি করিতেন। তখনকার দিনে ম্যালেরিয়া কবলিত পাড়াগাঁয়ে কুইনাইন মিকচার, জোলাপের ঔষধ, টনিক, আর ফোড়া-ঘায়ের ঔষধ জানিলেই মস্ত ডাক্তার। যথার্থবাবু ডাক্তারিতে বেশ রোজগার করিয়াছিলেন, চাষবাস, জমিজমা ভালোই ছিল।

......তাঁহার নিজের কোন সন্তান ছিল না, তাঁহার স্ত্রী নিজের একটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে মানুষ করেন এবং সে বড় ও যোগ্য হইয়া সংসারের সব ভার গ্রহণ করে। যথার্থবাবু যোগ্য পালিত পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দেই কাল কাটাইতেছিলেন।

......হঠাৎ একদিন ভোরবেলা আসিয়াই সটান বাড়িতে ঢুকিয়া মায়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।.....দরজার সম্মুখে নতমস্তকে প্রণামান্তর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,'—মারা গিয়েছে গত পরশু।' মায়ের হাতের ঝাড়ু পড়িয়া গেল।" বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলে চলেন, "স্ত্রী শোকে উন্মাদপ্রায়। নিজের পেটের সন্তান নাই, ভাইপোকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, বিবাহ দিয়াছে। ছেলেটিও যোগ্য হইয়াছিল, সব কাজ গুছাইয়া খুব ভালোভাবে সংসার চালাইতেছিল, তিনি নিজেও তাহার উপর সব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে কাল কাটাইতেছিলেন, কোন ভাবনা চিন্তা ছিল না। হঠাৎ অসুখ হইয়া জোয়ান ছেলে মারা গেল,

এখন তাঁহার উপর আবার সকল বোঝা, সংসারের দায় পড়িল।.....বৃদ্ধ হা-হুতাশ করিয়া বলিলেন, 'যা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, সেই সংসার আবার ঘাড়ে পড়ল।'

"যথার্থবাবু অনেকটা শোকের জ্বালা কমাইয়া হালকা হৃদয়ে প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। .....খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, 'বুড়ো বয়সে যথার্থের ঘাড়ে সংসার পড়ল! একটি সন্তান দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আরও এক-দু'বার একটু থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বুড়ো বয়সে যথার্থের ঘাড়ে সংসার পড়ল!' সংসারচাপে মায়ের এই গভীর নিরাশাব্যঞ্জক ভাব ও বৃদ্ধের উপর সহানুভূতি দেখিয়া সন্তানটির মনে প্রশ্ন হইল, পুত্রের মৃত্যুশোক অপেক্ষাও সংসারের বোঝা বহন করা কি কঠিন? অল্প বয়স তাঁহার, সংসারের বোঝা কী—কিছুই বুঝিতে পারেন নাই বটে, তবে মায়ের চিন্তা দেখিয়া মনে হইয়াছিল—উহা নিশ্চয়ই দুঃসহ।"

পঁচিশ

চিরসীমন্তিনী মা সারদা

শ্রীমা ছিলেন চিরসীমন্তিনী। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পরে যখন তিনি বৈধব্যের রীতি অনুযায়ী সমস্ত অলংকার খুলে ফেলতে যাচ্ছেন তখন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি কি মরেছি যে, তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ? সেই থেকে শ্রীমা হাতে বালা ও সরু লালপাড়ের কাপড় পরতেন। মা তিনি, চরম নির্ভয়ের স্থল, তাই তাঁর ওই রূপই আমাদের কাছে দীপশিখার মতো প্রজ্বলিত হয়ে থাকে।

শ্রীমায়ের মা শ্যামাসুন্দরীর খুব আক্ষেপ ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'এমন পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম! আহা! ঘর সংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হল না 'মা' বলাও শুনলে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আক্ষেপ শুনে বলেছিলেন, 'শাশুড়ি ঠাকরুন, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন, 'মা' ডাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠবে।'

'মা' ডাকের জ্বালায় অস্থির শ্রীমা কোনোকালেই হননি। একদিন পূজনীয়া যোগীন মা শ্রীমাকে বললেন, শ্রীমা ঠাকুরের একান্ত অনুগত হয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কথা মেনে চলেন না—এর কারণ কী? মা একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তা যোগেন, মানুষ কী সব কথাই মেনে চলতে পারে? তা বাপু, যাই বলো কেউ মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।'

শ্রীমায়ের এই মাতৃসত্তার আবরণ উন্মোচন করেছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ। একদিন তিনি শ্রীমার কাছে জানতে চাইলেন, 'তুমি কীরকম মা?' মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।' ভক্তচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'সত্য জননী'র স্নেহের পরিচয় জীবনে নানাভাবে পেয়েছেন। জয়রামবাটী গিয়েছেন তিনি। একদিন দেখলেন, মা সাবান, বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে চলেছেন। রাত্রে শোয়ার সময় গিরিশ ঘোষ দেখলেন বিছানার চাদর ধপধপ করছে। এ কাজ যে মায়ের তা তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না। আবার মা'র অপার স্নেহের কথা স্মরণ করে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠল।

জয়রামবাটীতে খাওয়ার পর ভক্তেরা শালপাতা উঠিয়ে স্থান পরিষ্কার করতে গেলে শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'থাক, লোক আছে।' তারপর ওই কাজটি তিনি নিজেই সম্পন্ন করতেন। মা'র আত্মীয়রা সকল বর্ণের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে চাইতেন না, অনুযোগ করে বলতেন, তুমি বামুনের মেয়ে, গুরু, ওরা তোমার শিষ্য; তুমি ওদের এঁটো নাও কেন? মা উত্তর দিতেন, আমি যে মা গো, মায়ে ছেলের করবে না কে করবে? কোনো যুবক তবু এঁটো বাসন ধুতে গেলে মা তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখো, মা'র কোলে ছেলে নোংরা করে, আমি তোমার কী

কত্তে পেরেছি বাছা?' শ্রীমাকে একদিন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে দেখে নলিনীদি বলেছিলেন, 'মাগো ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছ?' মা শুনে বললেন, 'সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?'

স্বামী অব্যয়ানন্দ শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি মঠের সাধুদের সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকেন না কেন? মা উত্তর দেন, আমি মা কিনা, সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে। বিশ্বেশ্বরানন্দ প্রশ্ন করেন, আপনি আমাদের কীভাবে দেখেন? মা উত্তর দেন, নারায়ণভাবে দেখি। বিশ্বেশ্বরানন্দ বললেন, আমরা আপনার সন্তান, নারায়ণভাবে দেখলে তো সন্তানভাবে দেখা হয় না। মা বললেন, নারায়ণভাবেও দেখি, সন্তানভাবেও দেখি।

শৌর্যেন্দ্র মজুমদার আবাল্য চা-পানে এমনই অভ্যস্ত ছিলেন যে, সকালে চা না খেয়ে কোনো কাজ করতে পারতেন না। দীক্ষাগ্রহণের পর নিজেব অসহায় অবস্থা চিন্তা করে বললেন, মা, আমার যে ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়া অভ্যাস, কী হবে? শ্রীমা স্মিতমুখে উত্তর দিলেন, বাবা, মা কি কখনো সৎমা হয়? তোমার যেমন খুশি আগে খেয়ে নিয়ে তারপরে জপ-ধ্যান করবে।

শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিয়ে কোনো ছেলে হয়তো বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, আর খানিক পরেই জলঝড় আরম্ভ হল। মা মহাভাবিত হয়ে বলছেন, তাই তো, ছেলেটি আমার যাচ্ছে গো, এতক্ষণে বোধহয় অমুক জায়গায় গেছে; সেখানে নিশ্চয়ই কোনো আশ্রয় আছে! বিভূতিবাবু একবার জয়রামবাটী থেকে কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন, রাস্তায় জলকাদা; তার উপর দ্বারকেশ্বর নদও আছে। পরের রবিবার যখন তিনি আবার এসেছেন, তখন মা তাঁকে বললেন, বিভূতি তুমি তো চলে গেলে; জল হচ্ছিল, আমি ভাবছিলুম, বিভূতি আমার—এতক্ষণ বড় নদী—পেরুল।

শ্রীমায়ের মাতৃত্বময়ী রূপের মধ্য থেকে ক্ষণিকের জন্য অলৌকিক দেবী ভাব প্রকাশিত হয়ে পড়েছে বারংবার। স্বামী মহাদেবানন্দের স্মৃতিকথাটি এইরকম, মহাদেবানন্দ বলেন, শ্রাবণ মাসে, অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। কিছু তরিতরকারি নিয়ে কোয়ালপাড়া মঠ থেকে জয়রামবাটী যাওয়ামাত্র শ্রীমা আমাকে বললেন, এসেচ? বেশ হয়েচে। অনেকদিন থেকে কেউ আসেনি, বাজার-টাজার হয়নি, আজ থেকে, বাজার করে দিয়ে যেয়ো! বিকালে হল্‌দিপুকুরে কেরোসিন আটা চিনি ঘি ময়দা মিছরি ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিস কিনে আনতে গেলাম। সমস্ত মিলে প্রায় এক মন হবে। দোকানদার বলল, আপনি পারবেন না, লোক ডেকেছি। মা কুলি নিতে বলেননি, তাই কুলি নেওয়া সঙ্গত নয় বিবেচনা করে বললাম. কুলির দরকার হবেনি, আমিই পারব, আপনি ঝুড়িটা আমার মাথায় তুলে দিন। ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কিছুটা রাস্তা যেতে না যেতে বোঝা ভীষণ ভারি বোধ হল ও মাথা জ্বালা করতে লাগল। উপরে বৃষ্টি—এক হাতে ঝুড়ির উপর ছাতা ধরে রেখেছি; পিছল পথ—সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে। মনে মনে নিজেই নিজেকে বলছি, পা পিছলালে চলবে না, এ তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে। পথের মধ্যে গরুরগাড়ি যাওয়ার একটু নিচু রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। কোনরকমে সেই রাস্তাটি যেই অতিক্রম করেছি আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল বোঝা একেবারে হাল্‌কা। কী যে হল ঠিক বুঝতে না পেরে মিনিট খানেক দাঁড়ালাম তারপর অক্লেশে মা'র বাড়িতে চলে এলাম।

বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখি, মা নিজের ঘরের বারান্দায় একবার পশ্চিম থেকে পূর্বে, আবার পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছোটাছুটি করছেন। সমস্ত মুখখানা লাল, চোখ দুটি যেন কপালে উঠেছে।

আর আপন মনে বলছেন, 'আমি কেন একটা কুলি নিতে বললুম না?' বোঝা নামানো হলে মা বললেন, 'একটা কুলি নিতে হয়। আমি বলিনি, তাতে কী হয়েছে? এমন করে আসতে হয়?'

শ্রীমায়ের মাতৃত্বসুধায় এমন পাবনী শক্তি ছিল যা মানুষের অন্তর্নিহিত শুভ সত্তাকে জাগরিত করে দিত। মনে আনত আশা ও শুভ ভাবের তীব্র আন্দোলন। তবু এই মাতৃত্ব নিরপেক্ষ ছিল, সতী, অসতী, সাধু অসাধু, সকলেরই তিনি মা। পূর্ণচন্দ্র ভৌমিকের স্মৃতিকথাটি এইরকম, '১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহের সুদূরপল্লী হইতে জয়রামবাটী যাত্রা করি। তিনদিনের রাস্তা, কিন্তু একের পর অন্য আমার সঙ্গী জুটিতে লাগিল, তাহারাই রান্না করিয়া খাওয়াইল। জয়রামবাটীতে যখন পৌঁছিলাম, শ্রীশ্রীমা দুঃখ করিয়া বলিলেন, এই কাঠফাটা রোদে অত পথ এলে অসুখ হতে পারে।

'কামারপুকুর হইতে দেশে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলাম; কিন্তু আরামবাগ ছাড়াইয়া যাওয়ার পর কোন কারণবশতঃ মার কাছে ফিরিয়া যাইতে মন ব্যাকুল হইল ও পরদিন আবার জয়রামবাটী অভিমুখে চলিলাম। প্রায় একটার সময় জয়রামবাটীতে পৌঁছিবামাত্র উপস্থিত ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, তুমি মাকে বড়ই কষ্ট দিয়েচ, তুমি রোদে রোদে আসবে বলে মা আগে থেকেই বলচেন তাঁর শরীর রোদের তাপে জ্বলে যাচ্ছে। কেহ কেহ আমাকে বাতাস করিতে ও খাইতে বসিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথা শিরোধার্য করিয়া বসিবামাত্র পতিতপাবনী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভয় কী, তোমার চিন্তা নাই, খাও—তুমি শান্তি পাবে। আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। বিকালে মা ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া অনেক কথা কহিলেন; হৃদয় শান্ত হইয়া মনে অপার আনন্দ আসিল। শেষরাত্রে উঠিয়া যাত্রা করিব শুনিয়া বলিলেন, যাওয়ার সময় দেখা কোরো। আমি রাত্রি তিনটায় উঠিয়া মনে করিলাম মাকে আর কষ্ট দিব না, কিন্তু দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখি, মা আমাকে চরণধুলি দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন!"

সন্ন্যাসীদের কাছে মা নিজেই ছিলেন পরম আশ্রয়স্বরূপা। সেখানে জপ, ধ্যান, তপস্যা তুচ্ছ হয়ে যেত। স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ বলেছিলেন তিনি মঠে খুব কাজকর্ম করতেন বলে ঠাকুরের সন্তান ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের স্নেহভাজন ছিলেন। এর ফলে তাঁর মনে অভিমান অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তিনি ঠিক করেন মঠের বাইরে কিছুদিন তপস্যায় কাটাইব। মঠে প্রাচীন সন্ন্যাসীরা মত দিলেন না। শ্রীশ্রীমার অনুমতি নিলে তাঁরা আর অমত করবেন না মনে করে ব্রজেশ্বরানন্দজি গেলেন শ্রীমায়ের কাছে। গিয়ে বললেন, 'মা, আমার একটি কথা আছে। স্নেহমাখা কণ্ঠে মা বললেন, 'কী? বলো বাবা।' 'মা, আমি কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি—আবার আসব। মঠে থেকে আমার মন বিগড়ে যাচ্ছে, মহারাজদের ভালোবাসা পেয়ে আমি আর সাধুদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না, এক এক সময়ে তাঁদের যা তা বলে ফেলি।'

'কোথায় যাবে বাবা? সঙ্গে টাকা পয়সা আছে?' 'না; গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে কাশীর দিকে চলে যাব।' 'কার্তিক মাস—যমের চারদোয়ার খোলা, লোকে বলে। আমি তো মা, আমি কী করে বলি বাবা, তুমি যাও? আবার শুনচি তোমার হাতে টাকা পয়সা নেই, খিদে পেলে কে খেতে দেবে বাবা?' মা অনুমতি দিলেন না। ব্রজেশ্বরানন্দজিরও আর যাওয়া হল না।

ছাব্বিশ

কোয়ালপাড়ার বনে রাধুর ছেলের জন্ম হল বলে শ্রীমা তাঁর নাম রাখলেন বনবিহারী। ১৩২৬ সালের ২৪শে বৈশাখ রাধুর পুত্রের জন্ম। রাধুর মতোই বনবিহারী বা 'বনু' শ্রীমায়ের অতি আদরের হয়ে উঠল। প্রতিদিন সকালে বনুর ঘুম ভাঙাবার জন্য শ্রীমা সুর করে গাইতেন,

"উঠ লালজি, ভোর ভয়ো
সুর-নর-মুনি-হিতকারী।
স্নান করো, দান দেহু
গো-গজ-কনক-সুপারি॥"

সন্তান জন্মগ্রহণের আগে থেকেই রাধুর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। সন্তান জন্মগ্রহণের পরও এই স্বভাবের ব্যতিক্রম হল না। সন্তান জন্মগ্রহণের পর প্রায় সাত-আট মাস যাবৎ রাধু এত দুর্বল ছিল দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারত না। হামাগুড়ি দিয়ে চলত। এমনকী কাপড়ও পরতে পারত না। তাই তার থাকবার জায়গাটি কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখতে হত। ইতিমধ্যেই সে আফিম খাওয়ার অভ্যাস করেছে। শ্রীমা তার আফিমের মাত্রা কমাতে চান কিন্তু রাধু তা পাবার জন্য শ্রীমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করে। একদিন শ্রীমা তরকারি কুটতে বসেছেন, রাধু আফিমের জন্য পাশে এসে বসেছে। শ্রীমা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বিরক্তভাবে বলছেন, 'রাধী আর কেন? উঠে দাঁড়া না; তোকে নিয়ে আর পারিনে। তোর জন্য আমার ধর্ম, কর্ম, অর্থ সব গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে জোগাই বল তো?'—এইরকম দুই একটি কথা বলতেই রাধু অধৈর্য হয়ে উঠল, সামনেই তরকারি রাখার চুবড়িতে ছিল বেগুন। সেই ঝুড়ি থেকে একটা বড় বেগুন নিয়ে শ্রীমার পিঠে সজোরে ছুঁড়ে মারল। দুম করে শব্দ হতেই শ্রীমা যন্ত্রণায় বেঁকে গেলেন, পিঠের জায়গাটাও বেশ কিছুটা ফুলে উঠল। ক্ষমারূপী তপস্বিনী শ্রীমা তৎক্ষণাৎ যুক্ত হস্তে ঠাকুরকে জানালেন, 'ঠাকুর, ওর অপরাধ নিয়ো না, ও অবোধ!' এই বলে নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে রাধুর মাথায় দিলেন এবং তাকে বললেন, 'রাধী, এ শরীরকে ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) কোনোদিন একটু শাসনবাক্য বলেননি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস। তুই কী বুঝবি আমার স্থান কোথায়? তোদের নিয়ে পড়ে আছি বলে তোরা কি মনে করিস বল দেখি। রাধী, আমি যদি রুষ্ট হই, ত্রিভুবনে তোর আশ্রয় নেই।'

রাধারাণিরও অসুখ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমাও সংসার ভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। খিট্‌খিটে রাধারানির ব্যবহারে উত্যক্ত শ্রীমা, প্রায়শই বলে ওঠেন 'এই রাধীর উপর আমার একটুও মন নেই। রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে বিতৃষ্ণা হয়েছে। জোর করে মন টেনে রাখি। বলি, ঠাকুর, রাধীর উপর একটু মন দাও, নইলে ওকে কে দেখবে? এমন রোগও আর দেখিনি, জন্মান্তরীণ রোগ নিয়ে মরে ছিল—প্রায়শ্চিত্ত করেনি।'

শ্রীমা রাধারানিকে সৎশিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। পড়াশুনা শেখাবার জন্য নিবেদিতা স্কুলেও পাঠাতেন তিনি। কিন্তু রাধারানি সেই শিক্ষা সঠিকভাবে ধারণ করতে পারেনি। দিন দিন তার মধ্যে নিজ গর্ভধারিণীর স্বভাব প্রকট হয়ে উঠছিল। তার স্বামী মন্মথর প্রতি অত্যন্ত আসক্তিও শ্রীমার বিরক্তির কারণ হয়েছিল, শ্রীমা দুঃখের সঙ্গে রাধারানিকে বলতেন, 'রাধী, তুই সিঙ্গির দুধ খেয়েও শেয়ালই রইলি। আমি যে তোকে এত করে মানুষ করলুম, আমার ভাব কিছুই নিলিনি, তোর মায়ের ভাবই সব নিলি?'—শ্রীমায়ের এসব বাক্যে রাধারানি মোটেই বিচলিত হত না বা তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত না। সে সমান তালেই শ্রীমায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে যেত। একবার শ্রীমা বিষ্ণুপুর থেকে গরুরগাড়িতে করে দেশে যাচ্ছেন, কোতুলপুরের কাছে গাড়ি এলে রাধু শ্রীমাকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগল, 'তুই সর, তুই সর, তুই গাড়ি থেকে নেমে যা।' শ্রীমা যথাসম্ভব গাড়ির পিছন দিকে সরতে সরতে বলতে লাগলেন, 'আমি যদি যাব, তবে তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে?'

কেবল রাধারানি নয়, তাঁর গর্ভধারিণী পাগলি মামির দুর্ব্যবহারও চরমে উঠল। সুরবালার ধারণা ছিল শ্রীমা ঔষুধ ইত্যাদির মাধ্যমে রাধারানিকে বশ করে তার কাছে থেকে সরিয়ে রাখছেন। অথবা শ্রীমা রাধুর জন্য কিছু না রেখে সমস্ত অর্থ আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করছেন। তাই তার ভাবনা, পরে রাধুর কী হবে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি শ্রীমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। শ্রীমা তাকে সাবধান করে দিয়ে বলতেন, তুই আমাকে সামান্য লোক মনে করিসনি। তুই যে আমাকে অত বাপান্ত মা-অন্ত করে গাল দিচ্ছিস, আমি তোর অপরাধ নিই না; ভাবি দুটো শব্দ বই তো নয়। আমি যদি তোর অপরাধ নিই, তাহলে কি তোর রক্ষা আছে? আমি যে কদিন বেঁচে আছি, তোরই ভালো। তোর মেয়ে তোরই হবে। যে কদিন মানুষ না হয়, সে কদিনই আমি। নতুবা আমার কী মায়া? এক্ষুনি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মতো কবে একদিন উবে যাব, টেরও পাবিনি।' শ্রীমার এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ সুর বদলালেন সুরবালা, 'আমি তোমাকে বাপান্ত করে করে গাল দিয়েছি? আমি বাপান্ত করিনি, অমনি বলেছি। তুমি যাকে দাও, সব যে দিয়ে ফেলো।"

শ্রীশ্রীমায়ের কথা গ্রন্থে সরযুবালা দেবীর একটি অতি মূল্যবান ও দীর্ঘ স্মৃতিকথা পাওয়া যায়। তার মধ্যে রাধুর প্রতি শ্রীমায়ের ভালোবাসা ও পরবর্তীকালে রাধুর ব্যবহারের পরিবর্তন সম্বন্ধে সুন্দর তিনটি ছবি উপস্থাপিত করা হয়েছে। লেখিকা বলছেন, "আজ সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি, মা শুয়ে আছেন ও রাধু তাঁর পাশে ভিন্ন পাটিতে শুয়ে গল্প বলবার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে দেখেই মা বললেন, 'একটি গল্প বল তো, মা।' আমি মুশকিলে পড়ে গেলুম, মায়ের কাছে কী গল্প বলি! তারপর সেদিন মীরাবাই পড়ে গিয়েছিলুম সেই গল্প বললুম। মীরার 'বিন্ প্রেমসে নহি মিলে নন্দলালা' এই দোঁহাটি বলতেই মা বললেন, 'আহা, আহা! তাইতো, প্রেমভক্তি না হলে হয় না।' রাধুর কিন্তু এ গল্পটা বড় মনঃপূত হল না, শেষে সরলা এসে দুয়োরানি সুয়োরানির গল্প বলতে সে খুশি হল। সরলাকে মা খুব ভালোবাসেন, তিনি এখন গোলাপ-মার সেবায় নিযুক্তা। সেজন্য একটু পরেই চলে গেলেন। রাধু বলছে, 'আমার পা কামড়াচ্ছে।' তাই আমি খানিক টিপে দিতে লাগলুম। রাধুর কিন্তু আমার টেপা পছন্দ হল না, বললে, 'খুব জোরে দাও।' মা তাই শুনে বললেন, 'ঠাকুর আমার

গা টিপে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন—এমনি করে টেপো।' ঐকথা বলে মা আমাকে বললেন, 'দাও তো, মা, তোমার হাতখানা।' আমি এগিয়ে দিতেই আমার হাত টিপে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে এমনি করে টেপো।' আমি তেমনি করে খানিকক্ষণ টিপতেই রাধু ঘুমিয়ে পড়লো।''

সরযূবালা দেবীর দ্বিতীয় স্মৃতিকথার স্থানটিও কলকাতার উদ্বোধন বা মায়ের বাটীতে। মা তখন অসুস্থা। ক্রমাগত জ্বরে ভুগছেন। এইসময় একদিন সরযূবালা তাঁকে দেখতে গিয়েছেন। মা তাঁকে বলছেন, 'আজ দুদিন জ্বর হয়নি একটু ভালো আছি, মা। আর, মা, এই রাধুর জন্যই আমার সব গেল—দেহ, ধর্ম, কর্ম, অর্থ, যা কিছু বলো। ছেলেটাকে তো মেরেই ফেলবার জো করেছে। এই এখানে এসে সরলার হাতে দিয়ে তবে রক্ষে। আর কাঞ্জিলাল দেখছে। কাঞ্জিলাল বলেইছে, 'এ রাধুর কাছে থাকলে আমি চিকিৎসা করতে পারব না।' ঠাকুরের যে কী ইচ্ছে—ওকে আবার ছেলে দেওয়া কেন—যে নিজের দেহেরই যত্ন জানে না। আবার তো নূতন রোগ করে বসেছে। এ কী হল, মা? যা হোক গে, আমি আর ওদের নিয়ে পারিনে। বাড়িতে কী অত্যাচারই করত! 'আমাকে কি ওরা গ্রাহ্য করত?' এমন সময় খবর এল ডাক্তার কাঞ্জিলাল এসেছেন, শ্রীমাকে দেখতে। মহিলারা তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে চলে গেলেন। ডাক্তারবাবু মাকে দেখছেন এমন সময় রাধু এসে বললে, 'আমার হাতটা দেখো তো। নীচে লোহার থামে লেগে ফুলেছে, ছড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত বেরিয়েছে।' বউ তার ওপর একটা ময়লা ন্যাকড়া রেড়ির তেলে ভিজিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'শিগগির খুলে ফেলো, সাবান দিয়ে ধুয়ে দাও। অমন ন্যাকড়া দিয়েও বাঁধতে হয়? এখনি বিষিয়ে উঠবে। কলকাতার হাওয়ার সঙ্গে বিষ চলে।' এই বলে ডাক্তারবাবু উঠে গেলেন। শ্রীমা তখন দুঃখ করে বলছেন! 'আহা, বাছার আমার কতই লেগেছে! মরে যাই। আহা, ও জনমদুঃখী আমার। শরীরে কী আর আছে! আহা, কাঞ্জিলালকে একটু ওষুধ দিতে বলো। ভালো করে দাও গো।'

রাধারাণীর প্রতি শ্রীমায়ের এই বিরক্তি ও সহানুভূতি প্রকাশ পেল তা কোনোটিই শ্রীমায়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করত না। স্মৃতিকথাতে আমরা দেখি, এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীমা গভীর অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে ডুবে গিয়েছেন, একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন, কোনো কোনো দিন গভীর রাত্রে ধ্যানে একটা ধ্বনি শুনতে পাই—বেশিরভাগই শুনি যেন শরীরে ডানদিক হতে উঠছে। কখনো (মন একটু নামলে পর) বাঁদিক হতেও হচ্ছে শুনি।' একথা শুনে শ্রীমা বললেন, 'হ্যাঁ ডানদিক হতেই হয। বাঁ দিক দেহভাবের। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে এইসব অনুভব হয়—ডানদিক হতে যেটি হয়, এই ঠিক। শেষে মনই গুরু হয়। মন স্থির করে দু'মিনিট ডাকতে পারাও ভালো।'—এই কথোপকথন থেকে বোঝা যায়; রাধারানি ও পাগলি মামির অসহ্য অত্যাচার শ্রীমায়ের অন্তরকে স্পর্শ করত না। তবে পাগলি মামির ক্ষেত্রে সর্বংসহা শ্রীমা একবার বিচলিত হয়েছিলেন। স্বামী ঈশানানন্দ সেই ঘটনাটির আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন, একদিন হঠাৎ পাগলি মামির মনে হল, অনেকক্ষণ জামাই মন্মথকে দেখছি না। নিশ্চয় মন্মথ জলে ডুবে গিয়েছে! প্রথমে তিনি বাঁড়ুজ্যেদের পুকুরে নেমে মন্মথকে খুঁজলেন। তারপর ভিজে কাপড়ে সিংহবাহিনীর মন্দিরে গিয়ে দেবীর কাছে মাথা ঠুকে কপাল ফুলিয়ে ফেললেন, এরপর হাজির হলেন শ্রীমায়ের কাছে, 'ঠাকুরঝি গো, জামাই আমার বাঁড়ুজ্যে

পুকুরে জলে ডুবে গেছে গো। কী উপায় হবে গো?' মা হঠাৎ শুনে চমকিয়ে উঠে বলে উঠলেন, 'ও হরি, ও বরদা, শিগগির এসো। পাগলি কী বলছে শোনো।' চিৎকার ও গন্ডগোল শুনে সকলে ছুটে এল। কিন্তু তাদের মধ্যেই একজন বললে, 'মন্মথ বেনেদের দোকানে তাস খেলছে দেখে এলুম।' মা বললেন 'শিগগির ডেকে নিয়ে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে মন্মথকে ডেকে আনা হল। মন্মথকে দেখে পাগলি-মামি অপ্রস্তুত হয়ে দুঃখে ও রাগে ঘরে চলে গেলেন। কিন্তু মনে মনে রেগে উঠলেন শ্রীমায়ের উপর।

এরপর কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন বিকেলে শ্রীমা ঘরের বারান্দায় বসে কুটনো কুটছেন, এমন সময় হঠাৎ ছোটমামি বাড়ির ভিতর এসে মায়ের সামনে উঠনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তুমিই তো রাধুকে আফিং খাইয়ে পঙ্গু করে বশ করে রেখেছ। আমার নাতি, আমার মেয়েকে আমার কাছে পর্যন্ত যেতে দাওনি।' পাগলির অভিযোগ শুনে শ্রীমা বললেন, 'নিয়ে যা না তোর মেয়েকে, ওই তো পড়ে আছে। আমি লুকিয়ে রেখেছি নাকি?' এইরকম দুচারটি কথা হতে না হতেই পাগলি মামির পাগলামো চরমে উঠল। তিনি শ্রীমাকে মারবার জন্য কাছের রক থেকে একখানি জ্বালানি কাঠ নিয়ে এসে শ্রীমাকে মারতে গেলেন। শ্রীমা তখন চিৎকার করে বলতে লাগলেন 'ওগো, কে আছ গো। ও বরদা, পাগলি আমায় মেরে ফেললে, শিগগির এসো।' মার এই চিৎকার শুনে বরদা মহারাজ ছুটে এসে দেখেন পাগলি মামি কাঠটি উঁচু করে তুলে মায়ের মাথায় ফেলেন আর কী? তিনি তৎক্ষণাৎ কাঠটি হাত থেকে নিয়ে পাগলি মামিকে বললেন, 'ফের যদি এ বাড়ির দরজায় পা বাড়াও, তবে তুমি আছ কি আমি আছি, গুরুর খাতির থাকবে না জেনে রেখো।' এ সময় শ্রীমাও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে জোর গলায় বলে ফেললেন, 'পাগলি, কী করতে বসেছিলি? ঐ হাত তোর খসে পড়বে।'—এই অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ মাত্রই মা জিব কেটে শিউরে উঠলেন। ঠাকুরের পটের দিকে চেয়ে করুণস্বরে বললেন, 'ঠাকুর এ কী করলাম! এখন উপায় কী হবে? আমার মুখ দিয়ে কোনোদিন তো কারু ওপর কখনো অভিসম্পাত বাক্য বের হয়নি; শেষটায় তাও হল। আর কেন?' শ্রীমার অপার করুণা ও চোখে জল দেখে সকলেই স্তম্ভিত হল। শ্রীশ্রীমায়ের শরীর ত্যাগের কিছুদিন পরই দেখা গেল, ছোট মামির গলিত কুষ্ঠ হয়ে হাতের আঙুল খসে পড়েছে, এর কিছুদিন পরেই পাগলি মামি দেহত্যাগ করলেন।

সাতাশ

মা একাধারে দেবী ও মানবী

কেবল ভক্তজননীরূপে নয় জ্ঞানদায়িনী ও গুরুরূপে শ্রীমায়ের ভূমিকা আজ জনমনে সাড়া ফেলে। একাধারে তিনি দেবী ও মানবী। কোন রূপ তাঁর প্রকৃত রূপ? শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে স্বয়ং জীবনীকার রোঁমা রোলা একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কে ছিলেন, তিনি কি, 'দেবমানব' (Godman) নাকি 'মানব দেবতা' (Man God)। তিনি দেবতারূপেই এসেছিলেন নাকি তাঁর মধ্যে মানবের চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। 'নর'কেই পূজা করা হয়েছে 'নরোত্তম'রূপে। যুক্তিবাদের যুগে মানবের দেবায়ন সত্যিই বিতর্কের ক্ষেত্র। তবু আমরা তথ্যনিষ্ঠ। তাই দেখি বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাঁর দেবীরূপ। তবে তাঁর মানবীরূপ থেকে তা পৃথক করা যায় না। কারণ শ্রীমায়ের জীবনের ঘটনাবলি ছিল এমন, কোনো ভক্ত এসেছেন শ্রীমা তাঁকে দীক্ষাপ্রদানের সময় তাঁরই ইষ্টদেবীকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। ভক্ত পেয়েছে আধ্যাত্মিক জীবনের চরম সম্পদ। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরেই দেখা গেছে শ্রীমা তাঁর পায়ের বাত নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভক্তকে ঠাকুরের প্রসাদের ভালো ফল সুজি হালুয়া খেতে দিয়েছেন আর নিজে পা ছড়িয়ে বসেছেন, আঁচলে সামান্য মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা নিয়ে। তাঁর জীবনে হাজার ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে যে স্থির অচঞ্চল ধ্রুবতারা স্বরূপ আত্মনিমগ্নতা ছিল সেই আত্মনিমগ্নতার উৎসভূমি হল তাঁর দেবীরূপ। আর মানবী রূপ তাঁরই বাহ্যিক লীলা প্রকাশ। তাঁর জীবনে যেসব ভক্তের আনাগোনা হয়েছে বা রামকৃষ্ণ ভাবনাকে পরিপুষ্ট করার জন্য তাঁর যে ভূমিকা সেই ভূমিকা আমাদের জানায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সার্থক উত্তরাধিকারী বা তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ এক এবং অভেদ।

শ্রীমা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে'। শ্রীমায়ের মানবী রূপের মধ্যে থেকেই প্রকাশিত হত দেবী রূপটি। এই দেবী রূপকে লক্ষ করেই স্বামী প্রেমানন্দজি বলেছিলেন, 'রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ করে কাঙালিনি সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, ভক্তদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন।'

সাধন জীবন সম্বন্ধে শ্রীমা ছিলেন অত্যন্ত আপসহীন। দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলিতে তিনি রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতেন। জনৈক ভক্তকে বলেছিলেন, ''জপ-টপ কী জানো? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়।' আরেকদিন বলেছিলেন 'জপধ্যান সব যথাসময়ে আলস্য ত্যাগ করে করতে হয়। 'রোজ পনেরো, বিশ হাজার জপ করতে পারো, তাহলে হয়। আগে করুক না, না হয়, তখন বলবে। তবে একটু মন দিয়ে করতে হয়। তা তো নয়, কেউ করবে না, কেবল বলে—কেন হয় না?'

''কাজকর্ম করবে বই কী, কাজে মন ভালো থাকে। তবে জপ, ধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্তত সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে

একটু বসলে সমস্ত দিন ভালোমন্দ কী করলাম না করলাম, তার বিচার আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়, পরে জপ করতে করতে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়। ....কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপধ্যান না করলে কী করছ না করছ বুঝবে কী করে?'

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীমা যখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন, তখন জনৈক ভক্ত দীক্ষার পর শ্রীমাকে প্রশ্ন করলেন, 'মা উপায় কী? ঘরের কুলজিতে ছোট একটি ঘড়ি ছিল, মা তা দেখিয়ে বললেন, ঐ ঘড়ি যেমন টিকটিক করছে, ঠিক তেমনি নাম করে যাও, তাতেই সব হবে, আর কিছু করতে হবে না।

এক সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা কর্মবিপাকে নীচ জীবন যাপন করলেও সৌভাগ্যক্রমে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। একদিন উদ্বোধনে তিনি শ্রীমাকে বললেন, 'মা আমার উপায় কী হবে? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্য নই।' শ্রীমা তাঁর চোখে অনুতাপের অশ্রু দেখে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'এসো মা, ঘরে এসো। পাপ কী তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছে, এসো, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কী?' শ্রীমার এই অভয়দাত্রী রূপ আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে। বুকে আনে বল। কখনো কখনো তিনি সন্তানকে অভয় দিয়ে বলতেন, 'ভয় কী, বাবা, সর্বদাই জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কী? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাব। সে যা খুশি করো না কেন, যেভাবে খুশি চলো না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো.....তাদের খেলা খেলবেই।'

শ্রীমা জপধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ বৃদ্ধির কথাও বলতেন। কতবার তিনি বলেছেন, 'মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয়, মা, ভক্তিই সব। 'এত জপ করলামই বলো, আর এত কাজ করলামই বলো, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কী সাধ্য। হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবে তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।' আরেক ভক্তকে বলেছিলেন, 'জপ-তপের দ্বারা কর্মকাল কেটে যায়, কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। রাখালেরা কৃষ্ণকে জপ-ধ্যান করে পেয়েছিল, না তারা আয় রে, নে রে, খা রে, করে পেয়েছিল?'

ঈশ্বরের কাছে কী করে প্রার্থনা করতে হয় শ্রীমা তাঁর নিজের জীবনকাহিনী শুনিয়ে আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। মা বলছেন, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম। কোনো হুঁশ থাকত না। একদিন জোছনা রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছি। চারিদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর যে সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারিনি—অন্যদিন জুতোর শব্দে টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে। তখন আমার অন্যরকম চেহারা—গয়না পরা, লালপেড়ে শাড়ি। গা থেকে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই। ছেলে যোগেন সেদিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ওই অবস্থায় দেখেছিল। সেসব কী দিনই গিয়েছে, মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি,

'তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।' জপধ্যান করতে করতে দেখবে—কী শান্তি প্রাণে আসবে। আহা! তখন কী মনই ছিল আমার। বৃন্দে (ঝি) একদিন আমার সামনে একটি কাঁসি গড়িয়ে (ঠেলা মেরে) দিলে, আমার বুকের মধ্যে যেন এসে লাগল (মা নবতে ধ্যানস্থ ছিলেন, তাই শব্দটা যেন বজ্রের মতো লেগেছিল—কেঁদে ফেলেছিলেন)। সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি—তবে তো মনে দীন ভাব আসবে।' শ্রীমা গৌরীমার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'দেখো, মা, চড় খেয়ে রামনাম অনেকেই বলে, কিন্তু শৈশব হতে ফুলের মতো মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিতে পারে, সেই ধন্য।' গৈরিকধারী সন্ন্যাসিনী একবার উদ্বোধনে শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁকে বললেন, 'আমাদের গুরু বলেন—মূর্তিপূজা কিছু নয়, সূর্যের ও অগ্নির উপাসনা করো। শ্রীমা এ কথার উত্তরে বলেছিলেন তিনি যদি সর্বজ্ঞ হতেন....তা হলে ঐ কথা বলতেন না। সেই আদিকাল হতে কত লোকে মূর্তি উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আসছে, সেটা কিছু নয়? আমাদের ঠাকুরের ওরূপ সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না। ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কী জানো—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল, নানা রকমের পাখি এসে বসে, হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখির বোল বলি, একটাই পাখির বোল আর অন্যগুলো পাখির বোল নয়, এরূপ বলি না।'

কর্মফল প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছিলেন, 'কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। জপ তপ করলে কর্ম অনেকটা খণ্ডন হয়। যেমন সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়ে দেবীর আরাধনা করেছিল বলে লক্ষ পাঁঠায় মিলে তাঁকে এক কোপে কাটল। তার আর পৃথক লক্ষ বার জন্ম নিতে হল না। দেবীর আরাধনা করেছিল কিনা। ভগবানের নামে কমে যায়।'

'নাটাইতে লাল নীল সুতো গোটায়। গোটাবার সময় যেমন লাল নীল সুতো ক্রমে ক্রমে জড়ায়, আবার খোলবার সময়ও সেইসব লাল নীল সুতো পরপর খুলবে। তবে দুটোতে প্রভেদ অনেক—একটায় কর্মবন্ধন জড়াচ্ছে, আরেকটায় কর্মবন্ধন খুলছে, দেখতে কিন্তু একরকম।'

একদিন উদ্বোধনে পূজায় বসে স্বামী বাসুদেবানন্দের হাত থেকে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ পড়ে গিয়ে গড়গড় করে গড়িয়ে গেলেন। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী পার্ষদ নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী উদ্বোধনে এসে স্বামী বাসুদেবানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, কাল তুমি মহাদেব স্নান করাবার সময় হাত থেকে ফেলে দিয়েছ?, 'স্বামী বাসুদেবানন্দ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, মা আপনি জানলেন কেমন করে? প্রশ্ন শুনে নিস্তারিণী দেবী বললেন, 'কাল স্বপ্নে দেখি, একটি পাঁচ বছরের ধবধবে ছেলে, মাথায় ছোট ছোট জটা, ন্যাংটা, নাচতে নাচতে এসে বলছে, আমায় ফেলে দিয়েছে। এই কথোপকথনের সময় মা সামনে পা ছড়িয়ে বসে কার সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু সব শুনছেন। হঠাৎ নিস্তারিণী দেবীর দিকে তাকিয়ে শ্রীমা বললেন, 'ছোট ছেলেরা অমন কত পড়ে খেলতে গিয়ে।' তারপর হেসে বাণেশ্বরের দিকে

তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বাবা অষ্টমূর্তিতে জগৎ ছেয়ে রয়েছ, ও অতটুকু ছেলে তোমায় ধরে রাখবে কেমন করে?' ভীত বাসুদেবানন্দ বুঝলেন, 'শিবঃ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরুঃ রুষ্টে ন কশ্চন।'

উদ্বোধনে একবার নীচে খুব হট্টগোল হচ্ছে। তাতে গোলাপ-মা শ্রীমাকে অনুযোগ করলেন, 'তোমার ছেলেদের ওপর কোনো শাসন নেই। পরমহংস মশাই ছেলেদের কেমন শাসনে রাখতেন। কারুর একচুল এদিক ওদিক হবার জো ছিল না।' মা বললেন, কী জানিস মা, আমি কারুর কিছু খারাপই দেখতে পাইনে, তা শাসন কবব কী? আমি যে মা! আমি শাসন করব কী করে? আমি ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার ঝরিষ্কার করে নিই। এরা ঠাকুরের ছেলে শাসন করব বললেই হল। তিনি কেমন সব ঠিক করে নেন। তাঁর আপনভোলা ভালোবাসায় সব সোজা হয়ে যায়। আমাদের প্রেমের ঠাকুর, তাতে কোনো কঠোর, রূঢ় ভাব নেই। যখন লোক বলে— 'আচ্ছা, এর ফল ভগবান দেবেন, আমি কিন্তু তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—কাউকেও হিংসা কোরো না, ভগবানকেও বিচার করতে বোলো না। বরং যাতে অত্যাচারীর ভালো হয় তার সম্বন্ধে প্রার্থনা কোরো। ভগবানের বিচার নিক্তিধরা, এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু তাঁর দয়ারও আবার শেষ নেই।'

জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে একবার বললেন, 'মা, তোমাকে লোকে ভগবতী বলে।' শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'লোকে বলবে কী, আমিই বলছি। আবার অন্য এক ভক্ত শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেকে ভগবান বলেন। আপনি কী? শ্রীমা উত্তর দিলেন, তিনি যদি ভগবান হন, আমি তবে ভগবতী।

একবার জনৈক ভক্ত শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর তো স্বয়ং ভগবান। তবে মা কী? শরৎ মহারাজ বললেন, ভগবান কি তাহলে একটি ঘুঁটে কুড়োনির মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ঠাকুরের নিজের কথা, আমি কি লাউশাক-খাকি, পুঁইশাক-খাকিকে বে করেছি?

একবার দুর্গাপুজার সময় ব্রহ্মচারীদের কুটনো কুটতে দেখে শ্রীমা বললেন, ছেলেরাও বেশ কুটনো কুটতে পারে। স্বামী জগদানন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ বললেন, কুটনো কুটেই হোক, বাটনা বেটেই হোক, আর জপ ধ্যান করেই হোক—ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা লাভই আমাদের উদ্দেশ্য। শ্রীমা সহাস্যে বললেন, তা তো ঠিক বাবা।

শিরোমণিপুরের বাসিন্দা রসন আলী খাঁ মায়ের স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'মা মানুষ নন, বড় পির-দরবেশ হবেন। আমি একবার লাউ নিয়ে মায়ের বাড়ি গেছি। গিয়ে দেখি, নতুন বাড়িতে মা পুজোয় বসেছেন। আমি মায়ের বাড়িতে হামেশাই যাতায়াত করতাম বলে আমার কোনো আড়ষ্টতা ছিল না। আমি গিয়ে ডাক দিলাম, মা লাউ এনেছি। আমার ডাক শুনে একজন মেয়েলোক এসে বলল, একটু বসো, মা পুজোয় বসেছেন। আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম যে, মা পুজোর আসনে বসে আছেন। আমি উঠোনের এককোণে লাউ ও লাউ শাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মায়ের পুজোর আসনের দিকে তাকিয়ে দেখি, মা সে আসনে নেই, আর মায়ের বসে থাকা দেহটা যেন আসন থেকে দুহাত ওপরে। মা ঠিক সেইভাবেই বসে আছেন, আসনটা নীচে পড়ে রয়েছে। মা শূন্যে বসে জপ করছেন। আমি মনে মনে ভাবছি, ভুল দেখছি না তো! চোখ মুছে আবার তাকিয়ে দেখি সেই দৃশ্য। বোকার মতো তাড়াতাড়ি মহারাজদের

যেই ডাকতে যাচ্ছি, দেখি আর কিছু নেই। তারপর মা আসন থেকে উঠে আসতে তাঁকে প্রণাম করলাম। কিন্তু প্রণাম করতে ভয় হচ্ছিল খুব। মা আমাকে মুড়ি গুড়, মাথার তেল দিতে বললেন, একজন মহিলাকে। সে সব নিয়ে চলে এলাম, কিন্তু মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুদাদা ছিলেন শ্রীমায়ের অনুগত। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর একবার মা কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী আসছিলেন, সঙ্গে শিবুদাদা। জয়রামবাটীর প্রায় কাছে মাঠের মধ্যে এসে শিবুদাদার হঠাৎ কী মনে হওয়ায় তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। মা বললেন, ও কী রে শিবু, এগিয়ে আয়। শিবুদাদা বললেন, একটি কথা বলতে পারো, তাহলে আসতে পারি। মা—কী কথা? শিবুদাদা—তুমি কে বলতে পারো? মা—আমি কে? আমি তো খুড়ি। শিবুদাদা—তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না। এদিকে বেলা শেষ হয়ে এসেছে। মা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, দেখ্ দেখি, আমি আবার কে রে? আমি মানুষ, তোর খুড়ি। শিবুদাদা তেজভরে উত্তর দিলেন, বেশ তো, তুমি যাও না। শিবুদাদাকে না যেতে দেখে অবশেষে মা বললেন, লোকে বলে কালী। শিবুদাদা—কালী তো? ঠিক? মা—হাঁ, শিবুদাদা। তবে চলো।

ভক্ত নগেন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, দ্বিতীয়বার যখন শ্রীশ্রীমার কাছে যাই, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। তার দীক্ষার পর, সে মেয়ে কোলে, আর আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে মাকে দর্শন করছি—দেখলাম মা এলোকেশী, উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মূর্তি, ত্রিনয়না—ভ্রূমধ্যে লম্বা তৃতীয় চক্ষু। নীচে এসে মনে হল, যা দেখেছি তা কী ধাঁধা?

এমন সময় গৌরী মা হঠাৎ এসে আমার হাত ধরে বললেন, চলো, মাকে দেখে আসি। উপরে গিয়ে দেখি, যথা পূর্বং তথা পরং—মা ত্রিনয়না। তখনও দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। প্রণাম করে নীচে নেমে আসতে আসতে ফিরে ফিরে দেখতে লাগলাম, ত্রিনয়না মা অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর শ্রীমা তীর্থদর্শন শেষ করে যখন কামারপুকুরে বাস করছেন তখন তাঁর কাছে বাসনাবালা নন্দী থাকতেন। কামারপুকুরবাসী এই রমণী মায়ের বাড়িতে বাসন মাজতেন, ঘরদোর পরিষ্কার করতেন। একদিন মায়ের পায়ে বাতের তেল মালিশ করতে করতে কখন যেন বাসনাবালা ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখলেন চারিদিক আলোয় আলো। এত আলো তিনি জীবনে দেখেননি। যেন আলোয় ভাসছে সারা ঘর। সে আলোর মধ্যে বসে আছেন জীবন্ত মা জগদ্ধাত্রী। কিন্তু দেবীমূর্তি দেখলেও মাকে কোথাও দেখতে পেলেন না বাসনাবালা। আবার ঘরের ভিতর ফিরে গেলেন, দেখলেন মা যেমন শুয়ে ছিলেন তেমনি শুয়ে আছেন। এক কোণে টিমটিম করে হ্যারিকেন জ্বলছে। মা উঠে বললেন, 'তুই দেখেছিস তো?' যা দেখেছেন সবই বর্ণনা করলেন বাসনাবালা। মা মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন, 'যা দেখেছিস সব সত্যি। আমিই জগদ্ধাত্রী, আমিই দুর্গা, আমিই লক্ষ্মী, আমিই সরস্বতী, আমিই কালী।' বাসনাবালা জানিয়েছেন, মায়ের পায়ের তলায় পদ্মফুলের মতো একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল যা দেবী-দেহে থাকাই সম্ভব ও স্বাভাবিক।

আঠাশ

সৎ-এরও মা অসৎ-এরও মা

"মহিমা তোমার ঢাকিয়া রাখিত বেশ,
পল্লীর বধূ বলিয়া জানিত দেশ।
অতি দুর্লভ, সুলভ হইয়া থাকে,
মহাকাল দেন পরে চিনাইয়া তাকে।
গৃহ-অঙ্গনে তোমার আসন পাতা।
চিনিতে দাওনি তুমি যে জগন্মাতা।
বিশ্ব জুড়িয়া উঠিছে জয়ধ্বনি,
বিশ্বজননী তুমি গো সারদামণি।"

কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

জয়রামবাটীর মতো এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করে একটি গ্রাম্য বালিকা। জগতের কাছে নিজের একটি পরিচয়কে পৌঁছে দিলেন। বক্তৃতায় মুখর হয়ে নয়, জীবনযাপনের নীরব মাধ্যমকে ভিত্তি করে। অনায়াসে তাঁর মুখে ধ্বনিত হয়েছে 'আমি যে মা।' মায়ের বহু সন্তানের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন একজন। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল সারদামায়ের সঙ্গে তাই গতিবিধি ছিল অবাধ। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে নানা ধরনের মানুষকে দেখার সুযোগ পেতেন সত্যেন্দ্রনাথ। দেখতেন কোনো বৃদ্ধ মানুষের বালকসুলভ আচরণ। কখনও বিচিত্র আবেগে চোখের জল ফেলে প্রণাম নিবেদন। বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র ভাব দেখে মাঝে মাঝে বিরক্ত হতেন তিনি, কখনো কখনো হাসিও পেত। একান্তে হয়তো মন্তব্য করেছেন কখনো, একদিন তারই এক টুকরো কানে গেল শ্রীমায়ের। ব্যথিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, লোকের যে কত ব্যথা তুই কী করে বুঝবি? তুই তো মা নস্?

না, 'মা' নই আমরা। আমরা জীবদেহের তত্ত্ব অনুযায়ী মাতৃত্বকে নিরূপণ করি। সীমাবদ্ধ থাকি আমার নিজের সন্তানটুকুকে নিয়ে। পাশের বাড়ির মেয়েটির যদি একটু ভালো হয় তবে সন্তানের চিন্তায় আর ঈর্ষার কামড়ে আমাদের ঘুম ছুটে যায়। মাতৃত্বের এই কি রূপ? স্বার্থপরতা সীমাবদ্ধতাই এর শেষ কথা? মাতৃত্ব শব্দটি দেহগত নয়, এটি হল মানবিক বিস্তারের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। যেন সুউচ্চ হিমালয়ের মধ্যে নিভৃত নীরব এক বিস্তীর্ণ শান্ত অঞ্চল ফুলে পরিপূর্ণ। যার সৌরভে দিগন্তব্যাপী এক মাদকতা, আমি সকলের মা। পাতানো মা নই। সত্যিকারের মা। 'আমি সৎ-এরও মা, অসৎ-এরও মা'। শ্বেতশুভ্র কাপড়ে ঘেরা এই কোলটিতে সকলের আশ্রয় রয়েছে। রয়েছে শান্তি সুধার পারাবার। পাখির নীড়ের মতো নিবিড় নিরাপত্তার সঙ্গে রয়েছে মুক্ত বিহঙ্গমের ডানা মেলে দেওয়ার সুতীব্র আহ্বান। পুরাণের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা মা যশোদার কাহিনী পাই, পুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে তাঁর অপূর্বলীলা, আর

সারদামঙ্গলের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই মাতৃত্বেরই তীব্র উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছে। কেবল একটি সন্তানকে নিয়ে নয়, জগতের প্রতিটি জীবের প্রতি সন্তান-স্নেহকে কেন্দ্র করে। একদিন এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসেছে কাঙালের ঠাকুর কাঙালের তরে।'—সত্যিই বাছারা আমার কাঙাল। একবার 'মা বলে ডাকলে কি থাকা যায়।' আবার কখনো বলছেন, "বারবার আসা—এর কি নিস্তার নেই। যেখানে শিব, সেখানেই শক্তি—শিবশক্তি একত্তরে (একত্রে), বারবার সেই শিব, সেই শক্তি। নিস্তার নেই। তবু তো লোকে বোঝে না—কত কষ্ট ঠাকুর করছেন, তাদের জন্যে। কী সব তপিস্যে—তপিস্যের দরকার কী? তবু তপিস্যে—খালি লোকের জন্যে। লোক কী পারবে? তাদের তেজ কই, শক্তি কই? তাই তো ঠাকুরকে সব করতে হয়।"

নামকরা অভিনেত্রী তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নটী-বিনোদিনীর কৃপালাভ ও গিরিশ ঘোষের শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনা তৎকালের নাট্যজগৎকে অনেকটাই ভাবমুখী করে তুলেছিল। জীবনরূপ আগ্নেয়গিরির উত্তাপ থেকে শান্তিসুধা আহরণের জন্য তাঁরা অনেকে উপস্থিত হতেন সারদামায়ের কাছে। শান্তিসুধা আহরণের জন্য অতি সংকোচে তাঁরা তাঁদের ভক্তিবিনম্র শ্রদ্ধার ডালি নিবেদন করতেন সারদার পায়ে। তিনকড়ি আর তারা সুন্দরী শ্রীমায়ের কাছে এসে কখনো শ্রীমাকে স্পর্শ করে প্রণাম করতেন না। তাঁদের ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করতেও দেখা যেত না। তাঁদের খাওয়াতে খাওয়াতে হাতে পান তুলে দিতেন শ্রীমা। পানটিকেও তাঁরা আলগোছে ধরতেন। তাঁরা চলে গেলে শ্রীমা বললেন, 'এদেরই ঠিকঠিক ভক্তি। যেটুকু ভগবানকে ডাকে, সেটুকু একমনে ডাকে। আহা।' একদিন তিনকড়ি মায়ের বাড়িতে এসেছেন, সুমিষ্ট গলার গানের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ, তাই ভক্তেরা ধরলেন, একটি গান শোনাতে হবে। জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে শান্তির প্রলেপ মিশিয়ে অপূর্ব আকুলতা ঝরে পরে তিনকড়ির গলায়—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
আমি যেখানে যাই, সে যায় পাছে, বলতে হয় না জোর করে
মুখখানি সে যতনে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়।
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কতই রাখে আদরে।
আমি জানতে এলেন তাই, কে বলে রে আপন রতন নাই।
সত্যি মিথ্যে দেখ না এসে—কচ্ছে কথা সোহাগ-ভরে॥"

সন্তানের জন্য কেবল পারমার্থিক নয়। জাগতিক প্রয়োজনের নিবৃত্তির চেষ্টায় সারদা সদা উন্মুখ ছিলেন। সে প্রচেষ্টায় এক একটি স্মৃতিকথা যেন এক একটি খণ্ডচিত্র। যেমন উপেন্দ্রনাথ মাইতির স্মৃতিতে ধরা এই কাহিনী, একবার উপেন্দ্রনাথ পৌষমাসে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হয়েছেন। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন এসে দেখলেন মা চৌকিতে চাল কোটায় ব্যস্ত।

বৃদ্ধা মায়ের হাতে যদি ঢেঁকিব মুষলটি পড়ে যায়, তাই মা নিজেই ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন। আবার নিজেই চালের গুঁড়ো তুলে নিচ্ছেন। তাঁকে সাহায্য করবার কেউ নেই। তিনি আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'আপনি কেন মা করবেন? মুষলটা যে হাতে পড়ে যেতে পারে।' শ্রীমা সেই কথায় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি থামো। আমার সমস্ত অভ্যেস আছে।' খানিক পরে

উপেন্দ্রনাথ দেখলেন ধুচুনিতে ডাল নিয়ে মা পুকুরে কচ্‌লিয়ে কচ্‌লিয়ে ধুচ্ছেন। 'এত ডাল কী হবে মা।' হেসে বললেন, 'দেখতে পাবে।' স্নান আর পুজা শেষ করে পিঠে ভাজতে বসলেন। সারাদিন ধরে চলল সেই পিঠে তৈরির কাজ। আগুনের তাপে মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, সন্ধের সময় সমস্ত উদ্‌যোগ শেষ হল। রাত্রের খাওয়ার সময় উপেন্দ্রনাথ দেখলেন, মা সরুচাকলি, সিদ্ধ ও ভাজা নানারকমের পুলি, রসবড়া, পাটিসাপটা ও পায়েস এনে দিলেন। রসনায় সন্তানকে পরিতৃপ্ত করে জননী বললেন, অনেক করেছি, রেখে দিইছি কাল আবার খাবে। বাসি হলে মজে। মনে হয় এ কোন্ মা, এ তো আমাদের ঘরের মায়ের মতোই। তবু তিনি তা নন। তাঁদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন, কারণ গর্ভধারিণী আমাদের দেহকে গঠন করেন, আর সারদেশ্বরী আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে গঠন করেন, যে জীবন নিত্য, অনিত্যতার ধারাপথে যা হারিয়ে যায় না। চিরকাল যা থাকে, যা চিরন্তন।

এ প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের এক সেবকের স্মৃতিকথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্মৃতিকথাটি এমন, শ্রীমা তাঁহার কোনো এক সেবককে বস্ত্রাদি দিতে চাহিলে তিনি উহা না লইয়া বলিতেন: 'মা, আমার আছে—আপনাকে দিতে হবে না।' কিছুদিন ওইভাবে কাটিবার পর একদিন শ্রীমা ঐ সেবককে বলেন 'তোমায় বলতে হবে, কেন তুমি নাও না।—যাকে যতগুলো কাপড় দিই, সে কখনো "না" বলে না; আর তোমায় একখানা দিতে গেলেও নাও না কেন?' সেবক উত্তর দেন : 'ভক্তেরা আপনাকে নিজের ব্যবহারের জন্যই দেন—সে জিনিস কী নিতে পারি? তারপর, এখানে আপনি পেয়ে থাকেন, দেশে তো আর পান না; সেখানে গিয়ে তো যাকে তাকে বিলিয়ে দেন। শেষে একখানাও প্যাঁটরায় থাকে না দেখেছি। আমায় ক্ষমা করুন। আমি নিতে পারব না। 'শ্রীমা জিজ্ঞাসা করলেন; তুমি আমায় কি ভাবো? সেবক উত্তর করলেন 'আমার মা।' শ্রীমা রাগিয়া বলিলেন 'বোকা ছেলে। তোমার কী একটুও বুদ্ধি নেই—মা কি কখনো ছেলেকে না-দিয়ে খেতে-পরতে পারে? মা'র ভাঁড়ার কী ছেলের বেলা খালি থাকে? আজ বলে দিচ্ছি, যখনি যা দরকার হবে, আমার কাছে চেয়ে নেবে—তাতে আমি খুশি হব।' ইহা বলিয়া শ্রীমা প্যাঁটরা হইতে একখানি কাপড় বাহির করিয়া নিজের শরীরে একবার জড়াইয়া প্রসাদী কাপড়খানি (সেবককে) দিলেন এবং একখানি মূল্যবান গায়ের কাপড়, যাহা প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এস. এন. ব্যানার্জির মাতা দিয়াছিলেন, সেখানিও একবার নিজের গায়ে দিয়া প্রসাদী করিয়া দিলেন। সেবক দুইটি মাথায় ঠেকাইয়া লইয়া চলিয়া আসিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া এতাবৎকাল সযত্নে রক্ষিত ঠাকুরের একখানি পরিধেয় বস্ত্র দিলেন। সেবক নিজভাবের প্রতিকূল কার্যেই হউক অথবা শ্রীমার অপার স্নেহরাশিতে মুগ্ধ হইয়াই হউক, কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীমা তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন, 'মা'র ওপরও ছেলের জোর আছে, বাবা,—যা দরকার হবে, চেয়ে নেবে।' সেবক নীচে আসিয়া ঠাকুরের পরা কাপড়খানির পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে কি না ভাবিয়া শরৎ মহারাজের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিলেন। অপর দুখানি বস্ত্র নিজে লইলেন।

"শ্রীমার অত বলা সত্ত্বেও তিনি মুখ ফুটিয়া পরে কখনো কিছু চাহেন নাই। শ্রীমা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় যে একখানি কাপড় দিতেন, তাহাই লইতেন। বহুকাল পরে একবার আমরা সেই সেবকের দেখা পাই। ইতিমধ্যে মহ ঝঞ্ঝাবাতে,

নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া তাঁহাকে মহাদুঃখে হাবুডুবু খাইতে হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে যখন দেখা, তখন তিনি অনাহারে দিন কাটাইতেছেন এবং শ্রীমার শরীরও নাই। বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিতেছেন 'মা যখন তোমায় অত করে বলেছেন, তখন তাঁর কাছে চাও না।' তিনি উত্তর দিয়াছেন! 'চাইলেই পাই—খুব বিশ্বাস আছে, কিন্তু চাইব না। চুষিকাঠি দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান—তা হবে না।'

অনেক সময় লক্ষ করা যেত, শ্রীমা ত্যাগী শিষ্য অপেক্ষা গৃহী সন্তানকে বেশি স্নেহ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'এরা (ত্যাগীরা) সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ধ্যান-জপ নিয়ে আছে—নিজের চেষ্টায়ই উঠবে, আর ওরা (গৃহীরা) কচি ছেলের মতো আমার পানে চেয়ে পড়ে আছে—কাজেই আমায় দেখতে হয়।'

কতরকমের সেবক ও সন্তানের সমাবেশ ছিল মায়ের চারপাশে। দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট ঘরে বাস করে শ্রীমায়ের পায়ে বাতের সূত্রপাত হয়। নানাপ্রকার ডাক্তারি কবিরাজি কোনোরকমের ওষুধেও তা নিরাময় হয়নি। একসময় তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ও তাঁর শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে দেখে জনৈক সন্তান তাঁকে বললেন, 'মা, অনুমতি দিন, আপনার শরীরের রোগ আমি নিজের শরীরে টেনে নিই।' শ্রীমা জানতেন অপরের রোগ নিজে গ্রহণ করার বিদ্যা এক নেপালি মাঈ-এর কাছ থেকে সেবকটি শিখেছিলেন। তাই সেবকটি তাঁর রোগ নিজ শরীরে গ্রহণে উদ্যত হতেই শ্রীমা তাঁকে বললেন, 'না, না বাবা, কোরো না। তুমি জানো না—ওটা এ শরীরে (নিজ শরীর দেখিয়ে) যে কষ্ট দিচ্ছে, তোমার শরীরে গেলে ঢের বেশি কষ্ট আমায় দেবে—গোদের ওপর বিষফোড়া হবে।—আমি যে মা।'

উনত্রিশ

আমরা adjustment বা মানিয়ে নেওয়ার কথা সর্বদাই বলি। ব্যক্তি জীবনে এই মানিয়ে চলার মধ্যেই তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়। একটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে নিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটিকে একটি নির্দিষ্ট তানে বেঁধে রাখে। এ এক বিস্ময়কর ক্ষমতা। পরিস্থিতির তারতম্য সেই ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনো তারতম্যের সৃষ্টি করে না। শ্রীমা হলেন সেই বিস্ময়কর এক ব্যক্তিত্ব যিনি সব পরিবেশে ও পরিস্থিতিতেই সমান স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটী। বাগবাজার মায়ের বাড়ি থেকে জয়রামবাটী সবক্ষেত্রেই তিনি যেখানে যেমন সেখানে তেমন নীতিকে প্রয়োগ করেছেন। এক ধর্মআন্দোলনের পুরোধা পুরুষের স্ত্রীরূপে সন্ন্যাসী ও ভক্তদের দীক্ষাদান ও আধ্যাত্মিক প্রেরণাদান তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। এতে আমরা দিব্য জীবনের ঝলক খুঁজে পেলেও বৈচিত্র্যের ঝলকে চমকিত হই। কিন্তু বিস্ময়ে আমাদের মন স্তব্ধ হয়ে যায় যখন দেখি তৎকালের জাতপাতের সমাজে জয়রামবাটীর মতো গণ্ডগ্রামে এক ব্রাহ্মণের বিধবা কীভাবে প্রতিবেশী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করলেন। এঁরা সকলেই খুব সাধারণ মানুষ এঁদের কাছে সারদাদেবীকে কেউ বা খুড়ি, কেউ পিসিমা, কেউ বা মা-ঠাকরুন বলে জানেন। নিজের ঘরের মা-পিসিমার থেকে তিনি পৃথক কিছু নন, তবু তিনি পৃথক। ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যে, ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষমতায়।

শিরোমণিপুরের কুখ্যাত ডাকাত আমজাদের প্রসঙ্গ আমরা আগেই করেছি। "শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে" গ্রন্থে শিরোমণিপুরের আরেক বাসিন্দা রসন আলী খাঁ'র একটি স্মৃতি কথা পাওয়া যায়। এর মধ্যে তিনি একটি চমৎকার চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন,—

"শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরে তখন তুঁতের চাষ হতো। ইংরেজরা জমিদারদের মাধ্যমে দাদন দিয়ে চাষীদের তুঁত চাষে বাধ্য করত। জমিতে অন্য ফসল ফলানোর সুযোগ তারা পেত না। জমিদার আর ইংরেজদের ভয়ে এই দুই গ্রামের লোকেদের দিন কাটাতে হতো। দুটি গ্রামে মুসলমানদের বাসই ছিল বেশি। চাষবাস ঠিকমত করতে না পারায় তাদের অভাব লেগেই থাকত। শিহড়, জিবটা, জয়রামবাটী, ফুলুই, শ্যামবাজার এলাকার ধনী ও মধ্যবিত্ত—কারোর মনেই মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা রেখাপাত করেনি। কেবল মা-ই পরম মমতায় আমাদের দুঃখে সমব্যথী হতেন। জাতপাত, ধর্মটর্মের ভেদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি আমাদের জন্যও তাঁর কোল পেতে দিয়েছিলেন।

"মায়ের যখন নতুন বাড়ি হয় তখন শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী এসেছিলেন। ঐ সময় তিনি শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরেও এসেছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। বিশেষ করে মায়ের নতুন বাড়িই শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের লোকদের মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। তখন জাতপাত নিয়ে খুব সংকীর্ণতা ছিল ওই অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে। হিন্দুরা মুসলমানদের ঘরে ঢুকতে দিত না। মায়ের নতুন বাড়ি হওয়ার সময় মুসলমান

মজুরদের কাজে লাগানোর জন্য জয়রামবাটীর গোঁড়া বামুনরা অনেক কথা বলেছিল। ওরা মাকে 'ম্লেচ্ছ' বলতেও দ্বিধা করেনি। মায়ের আত্মীয়রাও মাকে বাড়ি তৈরির কাজে আমাদের লাগাতে নিষেধ করেছিল। মা লোকের সামনে মাথায় কাপড় ঢাকা না দিয়ে বেরতেন না। খুবই আস্তে আস্তে কথা বলতেন, কিন্তু যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেন। এ ব্যাপারে কোন আপসের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। গ্রামের লোকদের চাপে দু-একদিন মায়ের ঘরের কাজ বন্ধ ছিল। পরে শুনেছি—মা বলেছিলেন, কেবল আমাদের দিয়েই কাজ করাবেন। শেষপর্যন্ত মায়ের জেদ ও সঙ্কল্পের কাছে গ্রামের গোঁড়াদের নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তারপর থেকে মায়ের বাড়িতে আমাদের খুব যাতায়াত হতে লাগল।

রসন আলী খাঁ-এর স্মৃতিকথা শ্রীমা সারদার অলৌকিক রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই রসন আলী খাঁ শ্রীমায়ের বাস্তববাদী এক চরিত্রের দিকটিকেও দেখিয়েছেন। রসন আলী খাঁ জানিয়েছেন শিরোমণিপুর আর শিহড় অঞ্চলে খুব খেজুর গাছ ছিল। খেজুরের রস ও তার থেকে গুড় তৈরি করা অনেক মুসলমান পরিবারের পেশা ছিল। শ্রীমা খেজুরের জিরেন রস ও খেজুর গুড় খেতে খুব ভালোবাসতেন। রসন আলী খাঁ খেজুড়গুড় নিয়ে গেলে মা পয়সা দিতেন, তিনি পয়সা নিতে না চাইলে শ্রীমা বলতেন, 'বাবা, পয়সা নিতে হয়। ওটা যে পরিশ্রমের জিনিস।' কেবল পয়সা নয়, তার উপর মা প্রচুর প্রসাদ, মুড়ি, মুড়কি দিতেন। এই স্নেহ ছিল উপরি পাওনা।

ধর্মসমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে সাধন করে দেখিয়েছিলেন; শ্রীমা তাকে পালন করে দেখালেন। রসন আলী খাঁ স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, 'শিরোমণিপুরের দুদু ফকির ও সেলিম ফকিরও মায়ের বাড়িতে যেত। নবান্নের সময় তারা চামর দুলিয়ে ভিক্ষে করত। শ্রীমা তাদের খুব ভালোবাসতেন ও ভক্তি করতেন। শিরোমণিপুরের পিরের দরগায় তিনি বাতাসা ও সিন্নি মানত করতেন। হামেদি-চাচা ও মফেতি-চাচা : 'মায়ের কী ভক্তি! আমাদের পাল-পরবে মা সিন্নি মানত করে, বাতাসা দেয়।' মফেতি-চাচা মাকে জিজ্ঞেস করেছিল 'মা, মুসলমানদের পরবে আপনি সিন্নি-বাতাসা পাঠান কেন? আপনারা তো হিন্দু?'

"মা বলতেন 'বাবা! ঠাকুর কি আলাদা হয়? সবই এক। তোমরা তো জানো বাবা, তোমাদের ঠাকুর ইসলামধর্মও সাধনা করেছিলেন। সে সময়ে নামাজ পড়তেন মুসলমানদের মতোই। সবই এক বাবা! নামেই শুধু ভিন্ন।'

মুসলমান পুরুষের মতোই মুসলমান মেয়েরাও শ্রীমায়ের কাছে যেতেন। প্রৌঢ়া সাবিনাবিবি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। আম-কাঁঠালের সময় আম-কাঁঠাল ও আনাজপাতি নিয়ে জয়রামবাটীতে বিক্রি করতে যেতেন। মা তাঁকে বলতেন, 'খুড়ি'। আবার কেউ কেউ এঁদের মধ্যে ছিলেন 'বিবি বউ'।

শ্রীমা সারদার প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য গোপালচন্দ্র মণ্ডলের স্মৃতিকথার মাধ্যমেও শ্রীমায়ের দেবী ও মানবী রূপের দ্বৈত সত্তা পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীমায়ের বাড়ির পাশের পুকুরটির নাম পুণ্যিপুকুর। এই পুণ্যিপুকুরের পাড়েই গোপালচন্দ্র মণ্ডলের বাড়ি। তাঁর কাছে শ্রীমা সারদাদেবী হলেন, 'পিসিমা।' বাবা ভূষণ মণ্ডল শ্রীমাকে 'দিদি' বলে ডাকতেন। ভূষণ মণ্ডলের স্ত্রীকে শ্রীমা 'বউ' বলে ডাকতেন। একটি গ্রাম্য পরিবারের সাধারণ চিত্র, খুব ছোট

ছোট ঘটনার উল্লেখ করেছেন গোপালচন্দ্র মণ্ডল; তিনি বলেছেন, 'আমাদের বাড়িতে তার (শ্রীমায়ের) যাতায়াত ছিল খুব বেশি। খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলের দিকে এক-একবার আসতেন। মা-ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করতেন। কখনো এমন ঘটত, হঠাৎ সন্ধ্যার সময় কলকাতা থেকে চার-পাঁচজন ভক্ত এসে গেছে। পিসিমা এসে মাকে বললেন 'ও বউ, আনাজপত্তর কিছু থাকলে দাও, চারজন ছেলে এসেছে অনেক দূর থেকে।' মা তাড়াতাড়ি আলু, ঝিঙে, কুমড়ো যা থাকত দিতেন। মনে আছে, একবার আমি সন্ধ্যার সময় একা লাউগাছ থেকে লাউ কেটে এনে তাঁকে দিয়েছিলাম। সামান্য জিনিসকে অসামান্য করেই তিনি যেমন ভাইদের সংসার আলো করে রাখতেন, তেমনি কোনো ভক্তকেই বুঝতে দিতেন না যে, সংসারে কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য আছে!"

শ্রীমায়ের বাড়িতে চারটে গরু ছিল, এদের নাম মহন্ত, মহারাজ, লক্ষ্মীকান্ত, ইন্দ্ররাজ। গরুগুলিকে সেবা যত্নের জন্য দীনু নামে একটি রাখাল নিযুক্ত ছিল। দীনু জলখাবার খেয়ে বেলা নয়টা নাগাদ মাঠে গরু নিয়ে চরাতে যেত। ফিরতো বেলা একটা নাগাদ। শ্রীমা দীনুর জন্য অপেক্ষা করতেন। সকলের খাওয়া হয়ে গেলেও তিনি খেতেন না। একদিন দীনুর আসতে খুব দেরি হল। দীনু মাঠে অন্যান্য রাখালদের সঙ্গে গুলি খেলছে। এদিকে মা তার খাবার নিয়ে বসে আছেন। বেলা দেখতে দেখতে তিনটে পেরিয়ে গেল। সকলের অনুরোধে শ্রীমা খেতে বসলেন। সামনে দীনুর খাবার ঢাকা দেওয়া। শ্রীমা সবে খাওয়া আরম্ভ করেছেন এমন সময় দীনুর প্রবেশ, দীনুকে দেখে শ্রীমা বললেন, 'কী রে বাবা, এত দেরি করলি? দেখ না, ওরা জোর করে আমায় খেতে বসাল। আমি তোর খাবার বেড়ে রেখেছি। তুই চান করে ঢাকা তুলে খাবার নিয়ে নে।' দীনু তাড়াতাড়ি স্নান করে খেতে বসল, শ্রীমাও খাচ্ছেন। এদিকে দীনুর খাওয়া প্রায় শেষ। শ্রীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা দীনু, আর দুটো ভাত নিবি?' দীনু ইতস্তত করতে লাগল কারণ, শ্রীমা তখন খাচ্ছেন, অপর কেউ নেই যে এসে ভাত দেবে। ব্যাপার বুঝে শ্রীমা দীনুকে বললেন, 'বাবা, থালাটা কাছে আন তো।' দীনু থালাটা কাছে আনল শ্রীমা তাঁর থালা থেকে কিছু ভাত দীনুকে তুলে দিলেন। দীনু খেয়ে উঠে গেল। এরপর সেদিনটা কেটে গেল। পরদিন, শ্রীমাকে দীনু প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?' শ্রীমা বললেন, 'বল না বাবা, কী বলবি।' দীনু বলল, 'আচ্ছা মা, তোমাদের কী আলাদা করে রান্না হয়? আমাদের ভাত কি আলাদা?

শ্রীমা—সে কী বাবা? ও কথা কেন বলছিস?

দীনু—তবে কাল তোমার পাতের ভাত অত সুন্দর লাগল কেন? অমন ভাত তো মা, জীবনে কখনো খাইনি।

শ্রীমা—না বাবা, একই হাঁড়িতে ভাত হয়। যে-হাঁড়ির ভাত তোকে দিয়েছি সেই হাঁড়ির ভাত তো আমিও নিয়েছি!—এই ঘটনার উল্লেখ করে গোপালচন্দ্র মণ্ডল লিখছেন, 'পিসিমা চেপে গেলেন তাঁর দৈবী-ঐশ্বর্যের কথা। তাঁর প্রসাদী অন্ন যে অমৃতে পরিণত হয়েছে তা দীনু বুঝবে কী করে! দীনু মহাভাগ্যবান—সে পেয়েছিল তাঁর মহাপ্রসাদ।'

এই অলৌকিক দেবী কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই গোপালচন্দ্র শ্রীমার একটি মানবী রূপ তুলে ধরেছেন, যে মানবীরূপে তিনি একটি গ্রাম্য বধূ। গ্রামের যাত্রা, পালাগানের মধ্যে

থেকেই সংগ্রহ করেন জীবনযাত্রার মূল সুরটি। এ প্রসঙ্গে সরাসরি তাঁর স্মৃতিকথাটিই শোনা যাক। তিনি বলছেন, 'পিসিমা যাত্রা দেখতে খুব ভালোবাসতেন। তখনকার দিনে গ্রামে এখনকার মতো রেডিয়ো বা সিনেমার প্রথা ছিল না। ফলে গ্রামে কোনো পালা-পার্বণকে কেন্দ্র করে বাউলগান, তরজা, যাত্রা, রামায়ণ গান, চব্বিশ প্রহরে ভাগবত কথকতার জন্য গাইতে আসত নদীয়ার নারায়ণপুরের দল, পশ্চিমের রামডিয়ার দল ও বরণডাঙার দল। জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামে শীতলা মায়ের পুজো হত। তখন হত চব্বিশ প্রহর ও যাত্রা। আশ্বিন-কার্তিক মাসে সিংহবাহিনীতলায় রামায়ণগান ও যাত্রা হত। রামায়ণ গান গাইতে আসতেন পুকুরিয়ার বাঁকু ঘোষাল ও ভুরসুবোর সতীশ আচার্য। তারা পিসিমাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। দু'রকমের যাত্রা হত—কৃষ্ণযাত্রা আর সাধারণ যাত্রা। কৃষ্ণযাত্রা গাইতে আসতেন শিহড়ের রাম ছুতোরের দল এবং বেজো—সন্তোষপুরের নলিনী মণ্ডল ও অনুকূল মণ্ডলের দল। জগদ্ধাত্রী-পুজার সময় অনেকবার কৃষ্ণযাত্রা হতে দেখেছি। যতদূর স্মরণ হয়, তখন সাধারণ পালাগুলি হত প্রহ্লাদচরিত, ধ্রুবচরিত, নিমাই সন্ন্যাস, নবাব সিরাজদৌল্লা ইত্যাদি। হ্যাজাক জ্বেলে যাত্রা হত। সাধারণ যাত্রার জন্য কুমুড়সে-কানপুরের দল। রামজীবনপুরের দল, বগহড়ির দল জয়রামবাটীতে যাত্রা করে গেছে। বাউলগান ও তরজা হত জগদ্ধাত্রী পূজার সময়। বাউল গান গাইতে আসতেন ক্ষুদিরাম গোজ ও সাতবেড়ের পাঁচু রায়, মুইদাড়ার মৃগেন্দ্র ধাড়া প্রভৃতি। মনসাতলায় মাঝে মাঝে মনসার পাঁচালি গান ও মনসার ভাসানের গান হত। দলের নাম মনে নেই, তবে লোকে বলত বেঙ্গাই-এর পাঁচালি দল। পিসিমা এই সমস্ত খুব আনন্দ করে শুনতেন। ছোটবেলায় অনেকবারই পিসিমাকে যাত্রা, রামায়ণ গান, বাউল গান, তরজা প্রভৃতি শুনতে দেখেছি। ওইসময় জলের ঘটি ও পানের ডিবা তাঁর সঙ্গে থাকত। গোটা অনুষ্ঠান দেখে তবে বাড়ি ফিরতেন। তখনকার দিনে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান শুরু হত বেশ রাতেই। শেষ হত শেষরাতে। রাত জেগে যাত্রা দেখেও তিনি ঠিক ভোরবেলা উঠতেন, নিত্যপুজা ও সংসারের কাজ সারতেন।'

আমরা মানিয়ে চলার কথা বলছিলাম। শ্রীমায়ের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কী দেবীরূপে কী মানবীরূপে—কী লৌকিক ক্ষেত্রে, কী অলৌকিক ক্ষেত্রে, কোনোরূপেই, কোনো ক্ষেত্রেই তিনি বেমানান নন। তাঁর প্রতিটি চলাফেরা আদান-প্রদান সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুন্দর।

ত্রিশ

জীবনদর্শন ও শ্রীমা

গ্রাম্যজীবনের বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে শ্রীমা নানাভাবে সম্মুখীন হয়েছেন। যে মেয়েকে 'পাগলের স্ত্রী' রূপে সমবেদনা জানানো হত সেই মেয়ের হঠাৎ ভক্ত ও দেবীজ্ঞানে পুজা লাভ সাধারণের চক্ষে অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তাই কোনো কোনো বৃদ্ধা গ্রামবাসীর মুখে শোনা যেত, 'সারদা ঠাকরুনের কী কপালের জোর; খ্যাপা জামায়ের জন্যে কেমন ভাগ্যি। দেখো না কত লোক আসছে, জিনিসপত্র দিচ্ছে, টাকা পয়সা দিয়ে প্রণাম করছে। কেন রে বাবু, যদি বামুনের মেয়ে বলে প্রণাম করিস, আমরাও তো বামুনের মেয়ে, আমাদেরও ঐসব দে না, টাকা দিয়ে প্রণাম কর না। তা নয়, সারদা ঠাকুরুনকে যেন কী দেখেছে আর কি।' শ্রীমার বৈষয়িক উন্নতির দিকে একদলের দৃষ্টি ছিল। তারা সদলবলে শিষ্যদের কাছ থেকে সারদা কী কী পাচ্ছেন তা দেখতে ও জানতে উৎসুক হয়ে উপস্থিত হতেন জয়রামবাটীর গৃহাঙ্গনে। শ্রীমাও প্রত্যেককে কিছু ফল, কিছু মিষ্টান্ন, কিছু তরকারি দিয়ে বিদায় করতেন। একদিন এঁদের মধ্যেই এক বৃদ্ধা ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হুঁ, হুঁ—আজ এইসব জিনিস আমার ঘরকে আসত।' কেন? 'বৃদ্ধার বক্তব্য অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তারই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল বলেই তার বাবা বিয়ে দেননি। উপস্থিত সকলে বয়সের হিসাব করে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের বিবাহের সময় তার জন্মই হয়নি। শ্রীমা কিন্তু মোটেই এসব কথায় উত্তেজিত হতেন না উপরন্তু হাসতে হাসতে বলতেন, 'হাঁ হাঁ, বটে বটে, তোর সঙ্গেই বিয়ে হত। কিছু তরকারী নিয়ে যা। ' এই বলে কিছু ফল ও তরকারি দিয়ে হাসতে লাগলেন। তবু অনুদার মানুষ উদারতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এক বৃদ্ধা গ্রামবাসী বলেছিলেন, 'পাগলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সংসার-সুখ হয়নি। এখন শিষ্যশিষ্যা নিয়ে কিছুটা সুখের মুখ দেখছে।'

গ্রাম্য অনুদাতার জন্য শ্রীমাকে অনেকসময় অর্থদণ্ড পর্যন্ত দিতে হয়েছে। শ্রীমায়ের কাছে যে ভক্তকুল সমবেত হত তাদের মধ্যে জাতিগত কোনো তারতম্য ছিল না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ একত্র অন্ন গ্রহণ করতেন অনায়াসে। সকলেই মায়ের সন্তান। কিন্তু শ্রীমা তাঁর সন্তানদের মধ্যে জাতিগত প্রভেদ না মানলেও গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই অজুহাতে অশান্তির সৃষ্টি করতেন। একবার জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রী পুজায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী পরমেশ্বরানন্দ। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার পর শ্রীমা পুজার নৈবেদ্যাদি যার যার প্রাপ্য, প্রত্যেককে দিতে বললেন। এসময় মণ্ডপ হতে ভোগ ইত্যাদি নামিয়ে আনা হচ্ছে। জনৈক সাধুকে, (পূর্বাশ্রমে জাতিতে ব্রাহ্মণ) সুজির পায়েস আনবার জন্য শ্রীশ্রীমা আদেশ করলেন। সাধুটি নামিয়ে আনলে পিতৃবংশের গুরু (যিনি অন্নধারক) ঐ সুজি গ্রহণ করবেন না বললেন। কারণ ঐ সাধু ব্রাহ্মণ হলেও উপবীত পরিত্যাগ করেছেন। তা শুনে শ্রীশ্রীমা

বললেন, "ওদের হাতে খাবি কেন, ওদের হাতে খেলে যে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে!' কালীমামা তাড়াতাড়ি বলছেন, 'দিদি চুপ কর, গুরুদেব!' মা বললেন, 'হলেনই বা গুরুদেব।'

"এর মধ্যে শ্রীশ্রীমা একটু সরবৎ ও সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করলেন, আমাকেও দিলেন। পরে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হবে। কাকে কোথায় বসানো হবে, কে কীরকম লোক সব জানিয়ে দিতে লাগলেন। এ সময়ে বিশেষ গোলযোগ সৃষ্টি হল। প্রায় প্রতি বৎসরই এ উপলক্ষে গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি নানারকম সামাজিক জটলা পাকিয়ে বিব্রত করতে থাকেন। যথা—নানা জাতের শিষ্য সব আসে, বামুন হলেও কারও কারও গলায় পৈতে নেই, এরা সব ছোঁয়ানাড়া করে, ইত্যাদি কারণে তাঁরা কেউ খাবেন না বলে নানারকমে হাঙ্গামার সৃষ্টি করেন। এবারও ঐরূপ করে শ্রীশ্রীমার নিকট হতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা বললেন, 'কিছু টাকা চাই, তা বল্লেই তো হয়। আমাকে এত কষ্ট দিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা কেন? আমি সহ্য করে যাচ্ছি, আমার ছেলেরা কেউ এসব সহ্য করবে না, এটা তোরা জানবি।"

উৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীমাকে তবু বহু অর্থদণ্ড দিতে হত। শ্রীমা অর্থ দিতেন কিন্তু চলতেন নিজের মতোই। সমাজের তুচ্ছ বাছবিচার তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারত না। সংকীর্ণ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যেই বিশ্বমায়ের আঁচল বিছিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। একজন ব্রাহ্মণ বিধবার পক্ষে এই নীরব প্রতিবাদ খুব সহজ ছিল না। কিন্তু শ্রীমা দৃঢ়ভাবে তা পালন করেছেন যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মাতৃত্ব শব্দটির ব্যঞ্জনা বৃহৎ ছিল শ্রীমায়ের কাছে। অন্যের জন্য নিজেকে বিস্তারের মধ্যেই 'মাতৃত্ব' শব্দটির ব্যাপকত্ব নিহিত রয়েছে। তুচ্ছ সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীমাও বহুবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন। তখন মিনার্ভা থিয়েটারে 'রামানুজ' পালার অভিনয় হচ্ছিল। এই পালায় একটি দৃশ্য ছিল, রামানুজকে তার গুরু দীক্ষাদানের সময় বলছেন, এই মন্ত্র তুমি কাউকে বলবে না। যে এই মন্ত্র শুনবে সেই মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু তোমাকে নরক ভোগ করতে হবে।' সকলের কল্যাণের ইচ্ছায় মহাপ্রাণ রামানুজ গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করেও সেই মন্ত্র উচ্চঃস্বরে শোনাতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে শ্রীমা সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। এই পালায় রামানুজ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তারাসুন্দরী। শ্রীমা তারাসুন্দরীকে প্রকৃত রামানুজ জ্ঞানে কোলে বসিয়ে চুম্বন করেছিলেন।

শ্রীমায়ের বিশেষত্ব ছিল তাঁর উপদেশে। এত কাব্যিক উপদেশ তাঁর মুখ থেকে নির্গত হত যা আজ আমরা পড়লে মুগ্ধ হই। স্বামী পরমেশ্বরানন্দ ছিলেন শ্রীমায়ের সেবক তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমি (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) জয়রামবাটীতে যখন একা ছিলাম, তখন একসময় শ্রীশ্রীমা জনৈক ব্রহ্মচারীকে আমার নিকট রেখে বলেছিলেন—"এ তোমার নিকট থাকবে, তোমার কাজে সাহায্য করবে। তোমার শরীর খারাপ—একলাটি থাকো ও দেখাশুনা করবে।" তদবধি ঐ ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাস হলেও জয়রামবাটীতেই আছে। এবং... সেবকটির স্বভাব ঠিক মেয়েছেলের মতো। অধিকাংশ কাজগুলি নিজেই সম্পন্ন করছে। শ্রীশ্রীমা বলতেন, মেয়েছেলের মতো কীরকম কাজগুলি করে।' অন্যান্য মেয়েরা যারা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট থাকত কেউ লজ্জা সংকোচ করত না। [এই ব্রহ্মচারীর] একটু চঞ্চলতা

ছিল, বাড়ির ভেতর সেবা শুশ্রূষা বা বিশেষ কোনো কাজ করতে করতে বাইরে কোনো কিছু হচ্ছে শুনলেই সব ফেলে রেখে ছুটে আসত। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রীশ্রীমার ভক্ত সন্তান অনেকে আসলে নানারকম গান বাজনা কীর্তনাদি চলত। আর অনেকরকম কৌতুক তামাশা দেখাবার জন্য প্রায়ই এরা উপস্থিত হত। সর্বদাই যেন একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত। ঐ সেবকটি তখন যেকোনো অবস্থায় থাকুক, যেকোনো কাজ করুক না কেন, সব ফেলে রেখে ওখানে উপস্থিত হত। একদিন শ্রীশ্রীমা তাকে বললেন, 'ঠাকুর এসেছেন, ঐ রকম কত কী হবে, কত নতুন নতুন কাণ্ড ঘটবে। তাঁর সেবার কাজ ফেলে রেখে ছুটে যাও কেন? বাজিকর বাজি করে, দেখে অপরে মুগ্ধ ও অবাক হয়ে যায়, কিন্তু তার বাড়ির মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে কাঁথা সেলাই করে, তারা আপনার কাজ নিয়ে থাকে, মুগ্ধ হয় না। তোমরা ওরকম হবে কেন? স্থিরভাবে কাজগুলি করবে। ওরকম করে আসতে নেই।"

দর্শনের ছাত্রী ছিলেন না সারদা। কিন্তু দার্শনিক ছিলেন বই কী! কারণ জগৎসংসার পারাবারের রহস্য ও দার্শনিক তত্ত্ব অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন যা শাস্ত্রকে অনুসরণ করে। নিজের জীবন দিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। কোনো প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'কেউ কেউ জীবদুঃখে কাতর হয়ে এসেছে, দেখো কেমন ত্যাগী! একটু-আধটু বাসনা আছে। জীবের প্রতি দুঃখ-বোধ থাকলেই জীবাদৃষ্ট গ্রহণ করতে হবেই—তাই জন্ম। কিন্তু জেনো সংসার সমুদ্র অথৈ, কত হাতি এতে তলিয়ে গেল! খুব সাবধানে থাকতে হয়। গুরু কে? যিনি জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জানেন। তবে, এবার যারা ঠাকুরের কৃপার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়েছে, তাদের শেষ জন্ম; তাদের আর ভয় নেই। ঠাকুরই কেমন কৌশল করে মায়ামুক্ত করে দেবেন; তিনি ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙেন। তাঁর কৃপায় মুক্ত হলে জীব নির্মল আকাশে পাখির মতো আনন্দে তাঁর মহিমা-গান করে করে বেড়ায়। ...শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকের বিশ্রামই হল ধ্যান। ....সেবার পরিশ্রমের মূল্য সেখানে বুঝতে পারবে।' এখানে শ্রীমা একটি অসাধারণ শব্দ ব্যবহার করছেন। এই শব্দটি হল 'জীবাদৃষ্ট'। মানুষের প্রতি, জীবের প্রতি অনুকম্পাবশত জন্মগ্রহণ। সাধারণত শাস্ত্র মতানুসারে মানুষ তার নিজস্ব কামনা বাসনার জন্য জন্মগ্রহণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো সময় বলেছিলেন, একটা সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। কামনা বাসনা থেকে মানুষ এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে এগিয়ে চলে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কামনা বাসনা বশবর্তী হলেও বহু মানুষ জন্মগ্রহণ করেন মানুষের কল্যাণ কামনায়। মানুষের এই কল্যাণ কামনা থেকেই 'জীবাদৃষ্ট' সৃষ্টি হয় এবং তার থেকেই আরেকবার জন্মগ্রহণ করে মানুষ। তবে এ দৃষ্টিভঙ্গি বিরল।

একটি সাধারণ ঘটনা থেকে গভীর প্রসঙ্গে চলে যেতেন শ্রীমা। ১৯১৮ খ্রিঃ শ্রীমা উদ্বোধনে রয়েছেন। উদ্বোধনের গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা 'ধারাপাত' 'প্রথমভাগ' 'গোলোকধাম' 'ঘোড়দৌড়' খেলার ছক হেঁকে যাচ্ছে। রাধু ফেরিওয়ালাকে ডেকে একটি 'গোলোকধামে'র ছক কিনেছে। এক ভক্ত মহিলা গোলোকধামের ছকটি খুঁটিনাটি করে দেখে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, এইরকম সব লোক আছে নাকি।' শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'আছে বই কী; যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ এইসব ভানুমতীর খেলা আছে। ঈশ্বরদর্শন হলে এসব ছায়ার মতো মিশে যায়। তখন এক ঈশ্বরই সত্য, আর সব মিথ্যা।'

—এইসব জায়গায় লোকে যায় কী করে?

—স্থূল দেহের পাত হলে সূক্ষ্ম শরীরের কর্মের সংস্কার অনুযায়ী ঐসব ভালো-মন্দ লোকগতি হয়। তাতে অজ্ঞানী জীব সূক্ষ্ম শরীরের গতিটাই নিজের গতি বলে মনে করে। দেখো না, মন স্বপ্ন দেখে, তখন এই বাহ্য বাস্তব জগৎ ভুল হয়ে গিয়ে স্বপ্ন জগৎটাই সত্য বলে মনে হয়।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সংস্কার যদি ক্ষয় হয়, তবে আবার জন্ম হয় কেন?'

মা বললেন, 'সংস্কার কী সোজা গা? অনন্ত জীবনের অনন্ত সংস্কার তোলা রয়েছে। একদল গেল তো আর একদল আসে, রক্তবীজের বংশ।'

—তাহলে এর হাত থেকে রেহাই কী করে পাওয়া যাবে।

—সব বাসনা ত্যাগ করে যারা সচ্চিদানন্দ চায়, তারাই মুক্ত হয়ে গেল। বাসনাই এই সংস্কারগুলোকে জাগিয়ে তোলে।

—এখন সচ্চিদানন্দে মতি হয় কী করে বলে দিন।

—তিনি যখন আকর্ষণ করেন তখনই কৃষ্ণে মতি হয়।

—তিনি আমাদের টানছেন না কেন?

—তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁর লীলা কোনো আইন-কানুনের বশ নয়। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন! তাঁর ইচ্ছা হলে মায়া আর জীবকে বন্ধন করে না। ঠাকুর বলতেন, তাঁর ছেলেমানুষের স্বভাব। যে চায় না তাকে দিয়ে দিলে; যে চায় তাকে দিলে না!

—তাহলে আমাদের কর্তব্য কী?

—তাঁর কৃপা প্রতীক্ষা করে থাকা। তাঁর আদেশ পালন করা। তিনি তো যুগে যুগে এসে জীবকে কত উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু পালন করে কে? এই তো চোখের সামনে ঠাকুরের ত্যাগ বৈরাগ্য, সাধনভজন, উপদেশ দেখলে, শুনলে। এখন কর্তব্য তো তোমার নিজের মুঠোর মধ্যে। বলছেন, একটাও করলে ভেসে যাবে।

১৯১৮ সালের পুজোর আগে একজন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মা, মনের মধ্যে অসৎ চিন্তা ওঠে কেন?' মা উত্তর দিলেন, 'সাধারণ মনের স্বভাবই হল নীচের দিকে যাওয়া। মানুষ কত মনের জোর সম্বল করে বাঁধ দিয়ে রাখে, আবার বাঁধ ভেঙে কখন কখন জল বেরিয়ে পড়ে। তবুও বরাবর চেষ্টা রাখতে হয়। কিন্তু জানবে সাধুসঙ্গ সৎ চর্চায় মন খুব ঊর্ধ্বমুখী হয়, সাধুদের কৃপায় অতি নীচ লোকেরও মনের গতি ফিরে যায়, দেখো বৃন্দাবনের সেই সোনাখোঁজা সাধুর মহাপুরুষের কৃপায় দিব্যজ্ঞান হয়ে গেল, পরশ পাথর পেয়েও ফেলে দিলে। সাধুর বেশ ধরে এক ব্যাধ পাখি ধরতে গিয়ে পাখিদের সরল নির্ভয় ভাব দেখল, তাতে নিজেরই বৈরাগ্য উদয় হল, সে ব্যাধবৃত্তি ছেড়ে দিলে। সেইজন্য সৎসঙ্গ সময় পেলেই করবে, সাধুসঙ্গ না পেলে সৎ গ্রন্থ পড়বে, মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। দেখো জলের গতি স্বভাবত নীচের দিকে, কিন্তু সূর্যের আলো পেয়ে সেই জল আবার আকাশে ওঠে, পাহাড়ের মাথায় বরফ হয়ে যায়, আবার বৃষ্টি, ঝরনা, নদী হয়ে জীবের কত কল্যাণ করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ছোট ছোট গল্পের আকারে বিবৃত হয়েছিল, শ্রীমায়ের ক্ষেত্রে আমরা সেইরকম উপস্থাপনা দেখি না। কিন্তু ছোট ছোট উপদেশে যে কাব্যিক সুষমা ফুটে উঠেছে তা ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে বিরল।

একত্রিশ

'ও কি যে সে, ও যে আমার শক্তি!'—শ্রীমা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিই তাঁর মহৎ জীবনকে উন্মোচিত করে দেয়। শ্রীমা কে? কী তাঁর যথার্থ স্বরূপ? শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। অনেকের মনের মধ্যে একটি ধারণা প্রোথিত রয়েছে, চন্দ্র যেমন সূর্যের প্রতিফলিত গৌরব নিয়ে গৌরবান্বিত, শ্রীমাও যেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভায় উজ্জ্বল হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরব প্রতিফলিত হয়েছে সারদা চন্দ্রিমায়। এই বক্তব্য একেবারে মিথ্যে নয়, রাম মুখুজ্জের কন্যা সারদা যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন তাঁর আরাধ্য দেবতা, গুরু, শিক্ষক ও ভালোবাসার জন মিলেমিশে একজনের মধ্যেই ঘনীভূত হয়েছিল—তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল তাঁকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। তিনি যেন রামকৃষ্ণ ভাবনাকে পত্নীর ভালোবাসা ও শিষ্যের বিশ্বস্ততা দিয়ে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিয়েছিলেন, এবং একসময় তিনি আরাধ্য দেবতার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। যিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনিই সারদা। দুই পৃথক স্থূল শরীরে একই ভাবশরীর বিরাজমান।

ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যে সতীত্বের ধারণা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। একনিষ্ঠ নীরব ভালোবাসায় ঐশ্বর্যবান হয়েছেন বহু নারী। সেটাই তাদের ত্যাগ ও তপস্যার ক্ষেত্র। কিন্তু সতীত্বের নিবিড় ভাবঘন ক্ষেত্র থেকে স্বামীর কর্মকে পরিচালিত করার প্রয়াস। কর্ম ও ভাবের এই সমন্বয় সারদার জীবনে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে। এই জীবন সহজে লোক গোচরে আসেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরাও অনেক সময় ভুল বুঝেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবতরঙ্গের উন্মাদনার পথে সারদার মৌনতা মুখর হয়ে ওঠেনি কখনো। কিন্তু ইতিহাস তার নীরবতার দুয়ারে আঘাত হানবেই কারণ যুগ যত এগিয়ে যাবে, সমাজের জটিলতা, মলিনতা, সামাজিক নৈরাশ্য ও অন্ধকার তত গাঢ় হবে। এই অন্ধকারের মধ্যে সারদা-চন্দ্রিমার স্নিগ্ধতাই আমাদের জুড়োবার ঠাঁই হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা সূর্যের তাপের থেকে তিনি যেন বেশি আমাদের আকর্ষণ করেন। জগৎ তাই আজ বিরল মাতৃত্বের কাছে নত। তাঁকে জানবার ইচ্ছায় ব্যাকুল। তাই আমাদের বারংবার যেতে হবে সেই গঙ্গোত্রীর উৎস সন্ধানে; যে উৎসমুখ থেকে নির্গত মাতৃসুধায় স্নাত হব আমরা। জয়রামবাটীতে শ্রীমা ভক্ত ভগবানের সংসার পেতেছেন। এই সংসার সাধারণ সংসারের মতো নয়। এখানে রয়েছে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আবার রয়েছেন গৃহী ভক্তরাও। সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমায়ের পিতৃগৃহের আত্মীয় পরিজন। গৃহী ও সন্ন্যাসী এই দুই বিপরীত মেরুর কেবল সমন্বিত ধারা নয়, এই দুই অবস্থার ঊর্ধ্বে বিরাজ করছেন শ্রীমা। শ্রীমায়ের জীবনযাত্রা ছিল সাধারণ ঘটনার চারিপাশে অসাধারণ ঘটনার বর্ণমালা দিয়ে ঢাকা। সকলেরই তিনি মা। তাই সন্ন্যাসীদের তিনি নাম ধরে ডাকতে পারতেন না। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, 'আমি মা কিনা, সন্ন্যাস নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে। 'একদিন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমাদের কীভাবে দেখেন?' মা উত্তর দিলেন,

'নারায়ণভাবে দেখি'। সন্ন্যাসী আবার প্রশ্ন করলেন, 'আমরা আপনার সন্তান। নারায়ণভাবে দেখলে তো সন্তানভাবে দেখা হয় না।' উত্তরে মা বললেন, 'নারায়ণভাবেও দেখি, সন্তানভাবেও দেখি।' ঈশ্বর তাঁর কাছে এখন সন্তানরূপে বিরাজিত, না সন্তানকে তিনি ঈশ্বরময়রূপে নিরীক্ষণে রত? এক ভক্ত তাঁর এই মাতৃরূপটির উন্মোচন করতে চেয়ে একদিন বললেন, 'আমি জানতে চাই, তোমাকে যে মা বলে ডাকি, তুমি আপন মা কিনা?' মা উত্তর দিলেন, 'আপনার মা নয় তো কী? আপনারই মা।' ভক্ত আবার বললেন, 'তুমি তো বললে, আমি যে ভালো বুঝতে পাচ্ছি না, গর্ভধারিণী মাকে যেমন আপনা হতেই মা বলে জানি, এমন তোমাকে মনে হয় কই?' কথাটি শুনে মা আক্ষেপের স্বরে বললেন, 'আহা, তাই তো?' পরক্ষণেই বললেন, 'তিনিই মা-বাপ, বাছা, তিনিই মা-বাপ হয়েছেন।' গর্ভধারিণী না হয়েও, গর্ভধারিণীর ভালোবাসাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন শ্রীমা। জনৈক বিভূতিবাবু শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভধারিণী মাতা রোহিণীবালা ঘোষও শ্রীমায়ের শিষ্যা। একদিন বিভূতিবাবুকে শ্রীমায়ের কাছে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখে রোহিণীবালা অবাক বিস্ময়ে বললেন, 'বিভুতি তো এখানে বেশ খায়। আমার এখানে মাত্র এত কটি খায়।' শ্রীমা রোহিণীবালার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়োনি (দৃষ্টি দিয়ো না)। আমি ভিখারী রমণী; আমার ছেলেদের আমি যা খেতে দিই, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।'

শ্রীমায়ের মাতৃস্নেহ কেবল লোক দেখানো বস্তু ছিল না। তিনি সতের ও মা অসতেরও মা। যথার্থই তাঁর মাতৃত্বসুধা ছিল গণ্ডি ভাঙা। তিনি সন্তানদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে। 'শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত বলরাম বসু শ্রীমায়ের এই রূপকে বিবৃত করেছেন এই ভাষায়, শ্রীমা ছিলেন 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'। ভক্তদের মধ্যে ভালো মন্দের মেলমেশ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাঁদের নিয়ে আনন্দে লীলাখেলা করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অতি উন্নত। অসতের স্পর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর অপাপবিদ্ধ শরীর তা গ্রহণে অস্বীকার করত। কিন্তু শ্রীমার নিজের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যকে ব্যবহার করেছেন সকলের জন্য, বিতরণ করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে, নেমে এসেছেন সাধারণ ভূমিতে। এরজন্য ব্যবহারিক জীবনের বহু মালিন্যেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। এক সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী বরদাকে বলেছিলেন, 'গ-রা আজ সকালে আমাকে প্রণাম করতে এসে—র সম্বন্ধে নানান কটাক্ষ করে বললেন সে হৃষীকেশে নাকি সাধুদের সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে। আরও নিন্দার কথা তাঁর নামে বলে আবার বলল, 'আপনাদের এত সঙ্গ ও সেবা করে তাঁর এইসব কুমতি হচ্ছে কেন? আমি আর কারও দোষ দেখতে শুনতে পারিনে, বাবা। প্রারব্ধ কর্ম যার যা আছে—যেখানে ফালটি যেত, সেখানে ছুঁচটি তো যাবে! আমার কাছে—র দোষের কথা বললে! তখন এরা সব কোথায় ছিল? সে আমার কত সেবা করেছে। আমি তখন ভাইদের ঘরে ধান সিদ্ধ করি, সংসারের সব কাজ করি—বউরা সব ছোট। সে শীত বর্ষা গ্রাহ্য না করে সকাল থেকে গায়ে কালি মেখে আমার সঙ্গে বড় বড় ধানের হাঁড়ি নামাত। এখন তো অনেকে ভক্ত হয়ে আসে; তখন আমার কে

ছিল? আমরা কী সেগুলো সব ভুলে যাব? তা দেখো, লোকেরই বা দোষ কী? আমারও আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে, 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারিনে; বলে কত প্রার্থনা করে তবে দোষ দেখাটা গেছে। বৃন্দাবনে যখন থাকতুম, বাঁকেবিহারীকে দর্শন করে বলতুম, তোমার রূপটি বাঁকা, মনটি সোজা—আমার মনের বাঁকটি সোজা করে দাও। দেখো, মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ করো, অমনি তার মুখটি বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষই দেখে, গুণটি ক'জন দেখে? গুণটি দেখা চাই।'—সংসারে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সহাবস্থানের মূল রহস্যটি যেন উন্মোচিত করে দিচ্ছেন শ্রীমা। ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে মিশেছে শিক্ষা পদ্ধতি। সে পদ্ধতি মানুষকে সুস্থ পরিবার গঠনে সহায়তা করতে পারে।

মাতৃত্ববোধ তুচ্ছতাকে ভাসিয়ে দিয়ে বিস্তারিত করে জীবনকে। শ্রীমায়ের মাতৃত্বের কোনো সীমারেখা ছিল না, এ প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবী গ্রন্থে বলা হয়েছে, "শ্রীমায়ের স্নেহপীযূষধারা শুধু ভক্তদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; উহা সমস্ত জাগতিক সম্বন্ধাদির বাঁধ অতিক্রমপূর্বক শতধা প্রবাহিত হইয়া সকলের হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাইত। রাধুর খুড়শ্বশুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখাইতে বসিয়া শ্রীমা নিঃসংকোচে বলিয়া যাইতেছেন, 'লেখো বাবাজীবন', রাধুর মা অমনি বাধা দিলেন, 'সে কী গো? সে যে তোমার বেয়াই!' মা তেমনি অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, 'তা হোক, সে আমাকে' মা বলে আনন্দ পায়। আমিও তার কাছে তাই।' শ্রীমায়ের ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতী দেবী ও সুবাসিনী দেবীও তাঁহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।"

তখন ভারতবর্ষ জাতিভেদ প্রথার বিকৃত প্রয়োগে জর্জরিত। জয়রামবাটীও এর থেকে মুক্ত ছিল না। সমাজে একঘরে করে সামাজিক অবরোধ, সমাজের ভয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা এমনকী অর্থদণ্ড বিধানও অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্জের বিধবা কন্যা এই জাতিভেদের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের জন্য যখন পৃথক বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সন্ন্যাসীরা মুসলমানদের বাড়ির কাজে নিযুক্ত করলেন। গ্রামের লোকজন প্রথমে আপত্তি করলেও পরে তা মেনে নিল। কেবল তাই নয়, তাদের নিরীহ ব্যবহার দেখে বলত, মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল রে! একদিন এক তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা এনে শ্রীমাকে বললেন, 'মা এই কলা নেবে? 'মা সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে বললেন, 'খুব নেব বাবা, দাও।' এক স্ত্রী ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মা ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?' 'মা ভক্তটির কথার কোনো উত্তর দিলেন না। কলাগুলো তুলে রেখে মুসলমানকে মুড়ি-মিষ্টি দিলেন। সে খুশি হয়ে চলে যেতেই শ্রীমা গম্ভীরভাবে স্ত্রী ভক্তটিকে বললেন, 'কে ভালো, কে মন্দ, আমি জানি।... দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কী করে যে তাঁকে ভালো করতে হবে, তা জানে ক'জনে।'—শ্রীমায়ের এই মহাবাণী আজকের দৃষ্টিতে বিচার করলে হবে, পিছিয়ে যেতে হবে একশো বছর অতীতে। একজন ব্রাহ্মণের বিধবা হয়ে তাঁর এই বৈপ্লবিক কার্য আমাদের চমকিত করে।

কী দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, নিষ্ঠায় স্থির অবিচল। এ এক অসাধারণ মাতৃত্ব। যে মাতৃত্ব দুর্বল নয়, উদ্ধত নয়, তেজময়ী, সুধা পূর্ণ। তাই শ্রীমা সারদাদেবী গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'শ্রীমায়ের অপার স্নেহ জাতি বর্ণ, দোষ-গুণ সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না। যে তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িত, তিনি তাহার দোষ বা দুর্বলতাদি জানিয়াও তাহাকে অকাতরে স্নেহ করিতেন, ঔষধপথ্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন, তাহার শোকে দুঃখে প্রাণ ঢালা সহানুভূতি দেখাইতেন এবং অপরকেও ঐরূপ করিতে শিখাইতেন। তাঁহার সে অকৃত্রিম মাতৃত্বের প্রভাবে দুশ্চরিত্র লোকেরও স্বভাব পরিবর্তিত হইত, দস্যুও ভক্তে পরিণত হইত।' (পৃ. ২৮৮)।

বত্রিশ

ভক্ত ছাড়লেও মা তাঁকে ছাড়েন না

ভক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের পায়ের কাছে বসে আছেন। মনের মধ্যে ক্রমাগত দুই বিপরীত ভাবের উদয় হচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে, ইনি সাধারণ মেয়েমানুষ মাত্র। যখন ভগবতী-জ্ঞান হচ্ছে তখন ভক্তিবিশ্বাস বাড়ছে, আর যখন মানবী-জ্ঞান হচ্ছে তখন ভক্তিবিশ্বাস চলে যাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। ভাবলেন, মায়ের কাছে বসেই যখন এই অবস্থা তখন দূরে গেলে মাকে ভুলে যেতেও পারি। ভীত হয়ে তিনি বললেন, 'মা, তোমাকে একটা কথা বলব, রাগ করবে না বলো।' মা উত্তর দিলেন, 'তোর যা ইচ্ছে বল না, রাগ করব কেন?' তিনি তাঁর মনের অবস্থা খুলে বলতেই মা বললেন, 'আমি তো সাধারণ মেয়েমানুষই; তাতে কী হয়েছে, মা-জ্ঞান থাকলেই হল।' ভক্ত বললেন, 'যখন ভক্তিবিশ্বাসই থাকছে না, তখন মা-জ্ঞান যে বরাবর থাকবে তাই বা বলি কী করে?..... তোমাকে বলতে হবে, তুই ছাড়লেও আমি তোকে ছাড়ব না।' মা উত্তর দিলেন, 'তা কী হয়? তুই ডাকলেই পাবি।' ভক্ত বললেন, 'তোমাকে ডাকবই না হয়তো। তোমাকে বলতেই হবে।' মা আর সন্তানের এইরকম উক্তি-প্রত্যুক্তির পর হাসিমুখে মা অভয়বাণী শুনালেন, 'তুই ছাড়লেও আমি তোকে ছাড়ব না।'

মায়ের ধান ভাঙতে ভাঙতে গয়লাবউ বলল, 'ঠাকুরঝি, কত লোকে চব্বিশ প্রহর (অর্থাৎ তিনদিন ধরে অবিরাম হরিনাম সংকীর্তন) দিচ্ছে—তোমার কত ছেলেপুলে, তুমি চব্বিশ প্রহর দাও না।' মা এ কথায় হেসে বললেন, 'গয়লাবউ, এর পরে কত চব্বিশ প্রহর দেখবি এখন!' মা বলতেন, 'যা হয় না ধনে জনে, তা হয় ক্ষণের গুণে।'

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের কথা। জয়রামবাটী থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগে শরীর সারাবার জন্য শ্রীমা কলকাতায় এসেছেন। এই সময় মায়ের বাড়িতে উপস্থিত হলেন এক পার্শি যুবক। শ্রীমায়ের সাক্ষাৎলাভে ধন্য হয়ে সে বলল, 'মাইজি, কুছ মূলমন্ত্র দিজিয়ে জিসসে খুদা পহচানা যায়।' তখন ভক্তদের দর্শন বন্ধ, তবু মা দুর্বল শরীর নিয়ে যুবকটিকে দীক্ষা দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় যুবকটি হিন্দি ভাষায় বললেন, 'মাইজি, ম্যায় যা রহা হুঁ।' মা বললেন, 'যাই বলতে নেই বাবা, বলো আসি।' একজন সেবক মায়ের কথাগুলি যুবকটিকে অনুবাদ করে শোনালেন, Mother says, don't say 'I am going' say, 'I am coming.' যুবকটি তো শুনে হতবাক। ভাবলেন, আমি তো যাচ্ছি। মা কেন বলছেন, আসছি বলতে। এই পার্শি যুবক পরবর্তীকালে বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা ও চিত্র পরিচালক সোরাব মোদি। শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী নিরাময়ানন্দজিকে তিনি বলেছিলেন, এখন আমি বুঝতে পারছি—যা তখন আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল—আমি তাঁর কাছ থেকে 'চলে যেতে' চেয়েছিলাম, কিন্তু

শেষপর্যন্ত 'যেতে' আমি পারিনি। আমরা কেউই পারি না। মায়ের কাছে আমাদের ফিরে আসতে হবেই। আমার জীবনের অন্তিম উপলব্ধি আমি মায়ের কাছে ফিরে আসছি—I am coming to my Mother.

দীক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ভাষা কোনো অন্তরায় হত না। শ্রীমা যখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন, তখন ঐ অঞ্চলের ভক্তরা এসে বলত, 'মন্ত্রম্' 'উপদেশম্'। সেখানে দীক্ষা দানের সময় মনের অন্তস্তল থেকে যে মন্ত্র উঠত, তাই দীক্ষার্থীর যথার্থ মন্ত্র জেনে তা দান করতেন। তিনি বলতেন, 'কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়েই মন থেকে ওঠে, এই দাও। এই দাও'। আবার কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়ে মনে হয় যেন কিছুই জানিনে, কিছুই মনে আসে না। বসেই আছি। পরে অনেক ভাবতে ভাবতে তবে মন্ত্র দেখতে পাই। যে ভালো আধার তার বেলায় তক্ষুনি মন থেকে ওঠে।'

এ বছর অনাবৃষ্টিতে জয়রামবাটী ও চারপাশের গ্রামের শস্য জ্বলে যেতে আরম্ভ করল। নিরুপায় চাষিরা শ্রীমাকে বললেন, 'এবার মা আমাদের ছেলেপিলের বাঁচবার আশা নেই—সকলকে না খেয়ে মরতে হবে।' দুর্দশার কথা শুনে মা চললেন চাষিদের সঙ্গে খেত দেখতে। জ্বলে যাওয়া শস্য দেখে খুবই বিচলিত হলেন মা। চারদিকে চেয়ে আকুলস্বরে বললেন, 'হায় ঠাকুর, এ কী করলে! শেষটায় কী সব না খেয়ে মরবে?' সেই রাতেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। সেবারে এমন ফসল হল যে বহু বছর তেমনটি হয়নি।

মেয়েদের শিক্ষালাভ হোক—এ শ্রীমা খুব চাইতেন। বিদ্যার উপর তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। মাদ্রাজের দুইটি কুমারী নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ছিল, তাদের বয়স বিশ বাইশ বছর। তাদের কথা উল্লেখ করে মা বলেছিলেন, 'আহা, তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছরের হতে না হতেই বলে পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও! আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হত, তাহলে কি এত দুঃখ দুর্দশা হত?'

একদিন রাধু সামনের মিশনারি স্কুলে যাবে বলে খেয়ে-দেয়ে কাপড় পরে প্রস্তুত। এমন সময় গোলাপ মা এসে মাকে বললেন, 'বড় হয়েছে মেয়ে, এখন আবার স্কুলে যাওয়া কী?' এই বলে রাধুকে যেতে নিষেধ করলেন। রাধু কাঁদতে লাগল। এইসময় মা বললেন, 'কী আর বড় হয়েছে, যাক না। লেখাপড়া শিল্প এসব শিখতে পারলে কত উপকার হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে—এসব জানলে নিজের ও অন্যেরও কত উপকার করতে পারবে, কী বলো মা?' রাধুদি মায়ের কথায় স্কুলে গেলেন।

গৃহস্থ জীবনে সংযমের কথা বলতেন শ্রীমা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ঠাকুর বলতেন, দু-একটি ছেলে হওয়ার পর সংযমে থাকতে। ইন্দ্রিয় সংযম চাই। এই যে বিধবাদের এত ব্যবস্থা সব ইন্দ্রিয় সংযমের জন্যে। আবার অন্যত্র বলেছেন, 'ইংরেজরা নাকি বিষয় বুঝে ছেলের জন্ম দেয়—যে এই (সম্পত্তি) আছে এতে একটি ছেলে হলে বেশ চলবে এবং তাই হবার পর স্ত্রী-পুরুষ দুজনে বেশ আলাদা আপন আপন কাজ নিয়ে থাকে। আর আমাদের জাতের?'

মা ছিলেন অবগুণ্ঠনবতী। তিনি নারীদের সংযত জীবনের কথা বলে গিয়েছেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে ব্যবহার ও মেলামেশায় স্ত্রীলোককে ব্যবধান রক্ষা করে চলতে হয়। এমনি মন্দ

চরিত্রের স্ত্রীলোক থেকেও দূরে থাকতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ভাইপো রামলালকেও শ্রীমায়ের কাছে বেশি যেতে দিতেন না। এক বৃদ্ধা শেষ জীবনে হরিনাম করলেও পূর্বজীবনে ভালো চরিত্রের ছিলেন না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমাকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীমা অতিরূপবতী প্রথম বয়সে বিধবা এক শিষ্যাকে বলেছিলেন, 'দেখো আমাকে যেন ডুবিয়ো না। শিষ্যের পাপ গুরুকে ভুগতে হয়। কারো সঙ্গে মিশবে না, কোনো কিছুতেই থাকবে না। ঘড়ির কাঁটার মতন ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।....পুরুষ জাতকে কখনো বিশ্বাস কোরো না। অপরের কথা কী নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না। এমনকী স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ করে তোমার সামনে আসেন তাকেও বিশ্বাস কোরো না। আবার শিষ্যের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পুরুষ ভক্তকেও মা বলেছেন, 'মেয়েমানুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না, মেয়েমানুষ সব কত্তে পারে।'

চালচলনে ও আচরণে স্ত্রীলোকের নির্লজ্জভাব শ্রীশ্রীমা কোনোকালে সমর্থন করেননি। ভাইঝি নলিনীকে লোকসমক্ষে গঙ্গায় এক বুক জলে দাঁড়িয়ে জপ করতে দেখে এবং রাধুকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে বসতে দেখে তিনি তিরস্কার করেছিলেন। কোনো এক ভক্তের স্ত্রীকে বলেছিলেন, বউমা, নাই বা স্নান কত্তে গেলে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিবে গায়, পুরুষগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, যেন তাদের সমাধি হয়ে যায়।

তৎকালের বালবিধবারা কঠোর ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করতেন। শরীর ধ্বংসকারী কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না মা। তাঁকে কখনো নিরম্বু উপবাস করতে দেখা যায়নি। তিনি বলতেন, খেয়ে দেয়ে শরীরটা ঠান্ডা করে নিয়ে ভগবানকে ডাকো। না করবে চুরি, না করবে দারি, খাওয়াদাওয়ায় দোষ নেই।.....আত্মা যদি কোনো কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে দোষ হয়। অপরাধ হয়। আত্মা কাঁদে—আমাকে দিলে না বলে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—একনিষ্ঠ পতিপ্রেম ও অশেষ কষ্টের মধ্যেও যাঁরা স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরাগিণী—তাঁরা শ্রীমায়ের বিশেষ পছন্দের ছিলেন। জনৈক ভক্ত একসময় ঈশ্বর লাভের প্রেরণায় স্ত্রী সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ার চেষ্টা করেন। কিছুদিন পর তাঁর মনে হয় স্ত্রীর সর্বদা ঠেস দিয়ে থাকার ভাবটি দূর করা প্রয়োজন। এই কারণে একদিন তিনি স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, তুমি আমাকে চাও, না ভগবানকে চাও? স্ত্রী হঠাৎ এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। নিজের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি উপস্থিত হলেন জয়রামবাটী। শ্রীমায়ের কাছে সব কথা খুলে বলতেই শ্রীমা সস্নেহে বললেন, 'কেন মা, তুমি কেন বলতে পারোনি? তোমার বলা উচিত ছিল, আমি ভগবানকে চাই না, আমি তোমাকেই চাই।' অশ্রুমতী সেন নামে জনৈকা ভক্তমহিলাকে বলেছিলেন, 'স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থেকো; দুজনে যেখানেই থাকো সেখানেই রামরাজ্য।'

শ্রীমা সংগীত ভালোবাসতেন। নিজে আড়ালে নিম্নস্বরে গান গাইতেন। সূচিকর্মাদি শিল্পকর্মেও তার উৎসাহ ছিল। প্রফুল্লমুখী বসু কার্পেটে উলের মন্দির তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে ঠাকুর, মা'র ও স্বামীজির সাতখানা ফটো বসানো ছিল। মা কার্পেটটি হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, পূর্ববঙ্গের মেয়েরা বড় গুণী, বড় ভক্ত। কী চমৎকার সব তারা তৈরি করে—বড় ভক্ত, বড় গুণী! কলকাতার একটি ভক্ত মেয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে শ্রীমা বলেছিলেন, অমুকের বউ ঘড়িতে দম দিতে জানে।

ভারতীয় নারীদের জাগরণের কাজে ভগিনী নিবেদিতাকে এনেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু তৎকালে রক্ষণশীল সমাজে ইউরোপীয়ান মহিলার প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র কী হবে? নিশ্চয়ই শ্রীমায়ের স্নেহ এ স্বীকৃতি। তাই নিবেদিতাকে পাঠিয়েছেন শ্রীমায়ের কাছে। মা শুধু তাকে গ্রহণ করলেন না, তাদের সঙ্গে একত্রে খেলেন পর্যন্ত। মনে রাখতে হবে, এই ঘটনা ঘটেছিল সেই যুগে, যে যুগে বাগবাজারের পঙ্কজিনী বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদিতাকে মাছের কাঁটা বেছে দেওয়ার জন্য ও শাড়ি পরিয়ে দেওয়ার জন্য গঙ্গাস্নান নামক শাস্তিলাভ করেছিলেন।

একদিন নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন বাগবাজারে শ্রীমায়ের বাড়িতে এসেছেন। নিবেদিতা তখন দু-একটা বাংলা শব্দ আয়ত্ত করেছিলেন। সেই শব্দভাণ্ডারের সাহায্যেই জানালেন, মাতৃদেবী, আপনি হন আমাদিগের কালী। মা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, 'না বাপু, আমি কালীটালি হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।' কথাগুলি ইংরেজিতে নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনকে বুঝিয়ে দিলে তাঁরা বললেন, মাকে অত কষ্ট করতে হবে না, আমরাই তাঁকে জননীরূপে দেখব। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব। শ্রীমা শুনে বললেন, তা না হয় দেখা যাবে। শ্রীমার প্রতি নিবেদিতার ভক্তি প্রসঙ্গে শ্রীমা স্বয়ং বলেছেন, 'আহা, নিবেদিতার কী ভক্তিই ছিল। আমার জন্য সে কী করবে ভেবে পেত না। রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধুলো নিত। দেখতুম যেন পায়ে হাত দিয়েও সংকুচিত হচ্ছে।' নিবেদিতার মৃত্যু-সংবাদে শ্রীমা ব্যথিত হয়েছিলেন জনৈকা ভক্ত মহিলার কাছে অশ্রুভরা চোখে বলেছিলেন, 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জানো মা?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে মাতৃভাব শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য এক চিন্ময়ী মাতৃমূর্তিকে ধরায় এনেছিলেন। পৃথিবীতে সাধিকার জীবন-কাহিনী বিরল নয়, কিন্তু একাধারে মাতারূপে, গুরুরূপে ও সঙ্ঘজননীরূপে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন পৃথিবীতে তার তুলনা মেলা ভার। তিনি জগৎজননী। জগতে শান্তি রক্ষার জন্য একটি আদর্শ জীবনযাপন করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই। অস্তিত্ব থাকবে কিন্তু ব্যক্তিত্ব থাকবে না।' 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন।' 'যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন।' তাঁর জীবনের প্রায় শেষ লগ্নে পৃথিবীর সমস্ত সন্তানদের জন্য উচ্চারিত হয়েছিল এক উপদেশবাণী, 'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।'

তেত্রিশ

শ্রীমায়ের ফটো

নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীমায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি নিবিড় বাঁধনে বাঁধা ছিল। শ্রীমা যেদিন প্রথম বেলুড় মঠের নতুন কেনা জমিতে পা রাখলেন নিবেদিতা সেদিন উপস্থিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে শ্রীমায়ের কাছে নিবেদিত করেছিলেন। নিবেদিতা কী দেখেছিলেন শ্রীমায়ের পরিমণ্ডলের মধ্যে নিবেদিতা লিখলেন, 'চারিদিকে ঘণ্টা বাজছে, সুর ভেসে আসছে—এখন যে সন্ধ্যারতির কাল।....একে আমি বলি শান্তিলগ্ন।....সন্ধ্যাদীপ জ্বলছে....অন্তঃপুরের নারীরা প্রণত হয়েছেন বিগ্রহের সামনে, এই সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকেই সারদাদেবীর গৃহে ঠিকভাবে বলতে গেলে আশ্রমে, মহিলাদের অনেকে নিঃশব্দে জপমালা ঘুরিয়ে চলেছেন। (Letters of Sister Nivedita, Vol-1, P 134) আবার নিবেদিতার অন্য একটি চিঠিতে দেখি নিবেদিতা বিবেকানন্দের আরেক আমেরিকান শিষ্যা মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে শ্রীমায়ের খরচ, তার জন্য একটি বাসস্থান নির্মাণের বিষয় আলোচনা করছেন। (Letters of Sister Nivedita, Vol-1, PP 480, 495)

নিবেদিতার এই দুই পত্রাংশ পড়ে আমরা জানতে পারি শ্রীমাকে কেন্দ্র করে নারী মঠ গঠনের প্রস্তুতি ধীরে ধীরে চলছিল। চলছিল প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা। যা রূপ নিতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। নারী-আন্দোলনের জন্য নিবেদিতা এলেন এবং শ্রীমার স্বীকৃতি তাঁকে ভারতবর্ষের কাজে উৎসর্গীকৃত হওয়ার চাপরাশ এনে দিল। বিবেকানন্দ ১৮৯৮-এর মার্চ মাসে এক চিঠিতে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখলেন, 'শ্রীমা এখন এখানে। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তারপর কী কাণ্ড, ভাবতে পারো—মা তাঁদের সঙ্গে খেলেন পর্যন্ত! দারুণ ব্যাপার নয় কি?' আর নিবেদিতা ১৮৯৮-এর ২২শে মে লিখলেন, "শ্রীমা আচারবিচারে বরাবরই রক্ষণশীল। সেইসব কিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি বিদেশি মেয়ে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড, তার কাছে গেলেন। এঁদের সঙ্গে খেলেন পর্যন্ত। আমরা যেতেই ফল দেওয়া হল, তাঁকেও দেওয়া হল। সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ফল তিনি একসঙ্গে গ্রহণ করলেন!! এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।' (Letters of Sister Nivedita, Vol-1, P 10)

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে নিবেদিতার ভারত আগমনের পর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে নারী-জাগরণের কাজ দুটি ধারায় প্রবাহিত হল—একটি গৌরীমার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, অপরটি নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। এই দুটিরই প্রাণপ্রতিমা ছিলেন মা সারদা। নীরবে সকলের অগোচরে তিনি এই দুই ধারাকে প্রবাহিত করেছেন, পরিচালিত করেছেন।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ নভেম্বর বাগবাজারে ১৬ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতা তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন। শ্রীমা সারদাদেবীর পুজো করে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। নিবেদিতা স্কুলটির নাম রাখলেন 'রামকৃষ্ণ গার্লস স্কুল'। এই বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রীমা এসেছিলেন এবং উচ্চারিত হয়েছিল এক আশীর্বচন, 'আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।' শ্রীমায়ের আশীর্বচনকে উল্লেখ করে নিবেদিতা আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোনো মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না।'

নিবেদিতা শ্রীমায়ের বাগবাজারের বাড়িটিকে আশ্রম রূপেই দেখেছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Master as I saw him' গ্রন্থে এই আশ্রমের বর্ণনা দিয়েছেন এইরকমভাবে, "শ্রীমায়ের আবাসে দিনগুলি শান্তি ও মাধুর্যে ভরা। প্রত্যুষের অনেক আগেই সকলে একে-একে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করেন; বিছানার মাদুরের উপর থেকে চাদর ও বালিশ সরিয়ে, তার উপর স্থির হয়ে বসেন, মুখ ঘোরানো থাকে দেওয়ালের দিকে, হাতে-হাতে-ঘুরতে থাকে জপের মালা। তারপরে ঘর পরিষ্কারের ও স্নানাদির সময় আসে। পর্বের দিনে শ্রীমা এক সঙ্গিনীর সঙ্গে পালকিতে গঙ্গাস্নানে যান। তার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণ পড়েন। তারপরে নিজের ঘরে মা পুজায় বসেন। অল্পবয়সিরা প্রদীপ জ্বালায়, ধুপ-ধুনা দেয়; গঙ্গাজল, ফুল ও পুজার জোগাড় করে। এইসময়ে গোপালের মা-ও এসে নৈবেদ্য তৈরিতে সাহায্য করেন। তারপর দুপুরের আহার ও বিকালের বিশ্রাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঝি লণ্ঠন জ্বালিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের কথালাপের মধ্যে; সকলে উঠে পড়ে; পট বা বিগ্রহের সামনে আমরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করি; গোপালের মা-ও শ্রীমায়ের পদধূলি নিই; কিংবা বাধ্য মেয়ের মতো মায়ের সঙ্গে ছাতে উঠে গিয়ে; তুলসী তলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসি। বহু ভাগ্য তার, যে মায়ের পাশে তাঁর সান্ধ্যধ্যানের সময়ে বসবার অনুমতি পায়—মায়ের সব পুজার শুরু ও শেষ যে গুরুপ্রণামে—সেই প্রণাম করতে সে শেখে স্বয়ং মায়ের কাছ থেকে।"

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৮৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত নিবেদিতা গঠিত এই বিদ্যালয়ের কাজ ছিল পরীক্ষামূলক। এই পর্যায়ে নিবেদিতার কাছে প্রধান সমস্যা ছিল তৎকালে বাগবাজার অঞ্চলের রক্ষণশীল মানসিকতা এবং দ্বিতীয়ত অর্থ। এছাড়াও নিবেদিতা কোন পথে শিক্ষণক্রমকে নির্ধারিত করবেন এই সমস্যাও নিশ্চয়ই তাঁর চিন্তার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়েছিল। বর্তমানে যেমন মন্টেসরি স্কুল ও তার শিক্ষা পদ্ধতি সর্বজন পরিচিত, তৎকালে তা ছিল না। কিন্তু নিবেদিতার শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে নিজস্ব চিন্তা ছিল এবং তিনি পেস্তালজি ও মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছে বিদ্যালয় চালানোর কার্যক্রম নিয়ে একটি চিন্তা নিশ্চয়ই ছিল। বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালের জুন মাসে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে পাশ্চাত্যে যান। এইসময় The Project of Ramakrishna Girls' নামে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন, যা তাঁকে প্রশংসা এনে দেয়। নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির হাত ধরে রামকৃষ্ণ নারী আন্দোলনের স্তরগুলি বেশ

কয়েকটি ধাপ এগিয়েছিল। সারদা মায়ের জীবনে এই বিদ্যালয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নিবেদিতার কর্মবহুল জীবন তাঁকে এই ছোট্ট বিদ্যালয়ের পরিধি ছাড়িয়ে বহুস্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই বিদ্যালয়ের হাল ধরেছিলেন বিবেকানন্দের আরেক বিদেশি শিষ্যা। ক্রিস্টিন গ্রীনস্টিডেল এই বিদ্যালয় গঠনে সহায়তা করেন এবং তাঁর সঙ্গে সহকারী ছিলেন ভগিনী সুধীরা। সুধীরা বসু। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন এবং ব্রহ্মচারিণীরূপে জীবনযাপন করার সংকল্প গ্রহণ করেন। নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের হাত ধরেই সারদামঠ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয় এবং বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। আমরা শ্রীমায়ের জীবনে সেই পর্যায়কে ছেড়ে এসেছি যখন একদিকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ গঠিত হয়েছে অপরদিকে নারী আন্দোলনের জন্য গৌরীমা পরিচালিত শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সূচনা হয়েছে।

নারী আন্দোলনকে আরও বৃহৎ প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার জন্য বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে এনেছেন ভগিনী নিবেদিতাকে এবং স্থাপিত হয়েছে নারী আন্দোলনের শক্ত এক ভিত্তি।

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রীমায়ের জীবনেও এল এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি। ১৮৯৮-এর ৯ই ডিসেম্বর অর্থাৎ ১৩০৫-এর ২৪শে অগ্রহায়ণ নূতন জমিতে স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণের পূতাস্থিপূর্ণ 'আত্মারামের কৌটা' বহন করে আনলেন এবং বেদির উপর স্থাপন করে সূচনা করলেন মঠের।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কয়েক মাস পরেই (১৫ই চৈত্র) শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান ও শ্রীমায়ের দ্বিতীয় সেবক স্বামী যোগানন্দ দেহত্যাগ করলেন। গ্রহণী রোগে আক্রান্ত যোগানন্দ স্বামীর অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে লাগল। বিপিনবিহারী ঘোষ ও শশিভূষণ ঘোষ নামক প্রথিতযশা দুই ডাক্তার রোগীর উন্নতির চেষ্টা করলেও কোনো ফল হল না। শেষের দিনগুলি যখন আসন্ন তখন শ্রীমায়ের একজন সেবক একদিন শ্রীমার জন্য পূজার ফুল দিতে গিয়ে দেখেন শ্রীমা নিজের ঘরে পা ছড়িয়ে বসে আছেন—তাঁর গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে চোখের জলের ধারা। তাঁকে দেখেই অধীরভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আমার ছেলে যোগেনের কী হবে বাবা?' সেবক মাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন, কিন্তু মা বললেন, 'বাবা আমি যে দেখছি। ....ভোরবেলায় দেখলুম ঠাকুর নিতে এসেছেন।' একটি কথা বলেই মা কেঁদে ফেললেন। একটু পরে কান্নার বেগকে সংযত করে বলে উঠলেন, 'কাউকে বোলো না—বলতে নেই।'

এরপর এল সেই ১৫ই চৈত্র, অর্থাৎ ২৮ শে মার্চের দিনটি। এই দিনটির কথা 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থের বর্ণনায় এইরকমভাবে বিবৃত হয়েছে, '১৫ই চৈত্র দ্বিপ্রহর (২৮ শে মার্চ, ১৮৯৯) হইতে রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়িল। অপরাহ্ণ তিনটা দশ মিনিটে তাঁহার বদন মণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। অমনি শিয়রে উপস্থিত কৃষ্ণলাল মহারাজ কাঁদিয়া উঠিলেন, দ্বিতলে উপবিষ্টা শ্রীমাও তৎশ্রবণে ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লজ্জারূপিণী তাঁহাকে এইরূপ বিচলিত দেখিয়া সেবক দ্রুত উপরে গিয়া তাঁহার চরণ দুইখানি ধারণপূর্বক সান্ত্বনা দিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি বিরক্তি সহকারে বলিলেন, 'তুমি যাও, যাও। আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল—কে আমায় দেখবে? সব শেষ হইয়া গেল। পরদিন শ্রীমাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস-সহকারে বলিতে শোনা গেল, 'বাড়ির একখানি ইট খসল; এবার সব যাবে।'

"মা তাঁহার এই সন্তানকে কী দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহার উপর কতখানি ভরসা রাখিতেন, তাহা তাঁহার উত্তরকালীন বহু কথা ও কার্যে প্রকাশ পাইত। তিনি বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন, 'যোগেনের মতো কেউ ভালোবাসত না। আমার যোগেনকে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত, সে রেখে দিত; বলত, মা তীর্থে-তীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন। সর্বক্ষণ আমার কাছে থাকত। মেয়েদের কাছে থাকত বলে ওরা (ছেলেরা) সকলে তাকে ঠাট্টা করত। যোগেন আমাকে বলত, মা, তুমি আমাকে যোগা যোগা বলে ডাকবে। যোগেন যখন দেহ রাখলে, সে বললে, 'মা, আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঠাকুর।'....যোগেনকে (ঠাকুর) অর্জুন বলতেন।....শরৎ আর যোগেন—'এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।'

সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান যোগীন বা যোগানন্দ আত্মীয়-পরিজনের চাপ সৃষ্টির ফলে বিবাহবন্ধন স্বীকার করতে বাধ্য হন। বিবাহের পর তাঁর মনে হয়েছিল, কামিনীকাঞ্চন -ত্যাগী নিষ্পাপ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আর যাবেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'এখানকার (শ্রীরামকৃষ্ণের) কৃপা থাকলে তোর হাজারটা বিয়েতেও ভয় নেই'। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। সংসারের বাঁধন তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। কিন্তু তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন শ্রীমা তাঁর ধর্মপত্নীকে সেবার জন্য আনতে চাইলেন। এই সিদ্ধান্তে যোগানন্দ স্বামীর আপত্তি ছিল। তবু শ্রীমা তাঁর স্ত্রীকে ডেকে যোগানন্দজির কাছে আনেন এবং বলেন, 'একে উপদেশ দাও।' মায়ের আদেশ সত্ত্বেও যোগানন্দজি বললেন, 'সে সব তুমি বুঝবে।' জীবনের শেষ অধ্যায়ে কেন সন্ন্যাসী সন্তানের স্ত্রীকে তাঁর কাছে উপস্থিত করলেন—এ এক ভাবনার বিষয়। হয়তো, শ্রীরামকৃষ্ণের মহা আশীর্বাদ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, হয়তো, জগতের কাছে এই দৃষ্টান্তকে স্থাপনের জন্য। সাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি এই আচরণ করেছিলেন। অন্য কোনো সন্ন্যাসী সন্তানের ক্ষেত্রে তাঁর এরকম আদেশ শোনা যায় না।

স্বামী যোগানন্দের মৃত্যু শেলের মতো বেজেছিল তাঁর মনে। তিনি তাঁকে 'ভারী' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না। যোগেন ছিল, কৃষ্ণলালও আছে—ধীর স্থির—যোগেনের চেলা।'

"ছেলে—যোগেন আমার খুব সেবা করেছে; তেমনটি আর কেউ করতে পারবে না। পারে কেবল শরৎ। ছেলে-যোগেনের পর থেকেই শরৎ করছে। আমার ঝক্কি পোয়ানো বড় শক্ত, মা! শরৎ ছাড়া আমার ভার আর কেউ নিতে পারবে না।" স্বামী যোগানন্দের পর শ্রীমায়ের সেবার ভার গ্রহণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী সারদানন্দ। দীর্ঘ দ্বাদশ বছর তিনি মাতৃসেবার এক অভিনব অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিলেন।

চৌত্রিশ

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমা কোনো এক ভক্তকে বলেছিলেন, 'এ যুগের লোক কেমন দেখেছ, অবতারের ফটো তুলে রেখেছে!' যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র প্রসঙ্গে শ্রীমার এই বিস্মিত মন্তব্য কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে যাঁরা অবতাররূপে বন্দিত হয়েছেন তাঁদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া গেলেও কোনো আলোকচিত্র নেই যা প্রামাণিক বলে মনে করা যেতে পারে। রাম, কৃষ্ণ পৌরাণিক চরিত্র; বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রিস্টের মতো ঐতিহাসিক চরিত্রের রূপকল্পনা করেছেন শিল্পীরা। বাস্তবিক তাঁদের চেহারা কেমন ছিল তা নিয়ে এখনও বিতর্কের অবকাশ আছে। এক্ষেত্রে যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও চেহারা আমাদের কাছে প্রামাণিক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে কল্পনার কোনো অবকাশ নেই। অগ্নির দাহিকা শক্তির মতোই যুগপুরুষের সঙ্গে অবতীর্ণা তাঁদের শক্তিরূপিণী সহধর্মিণীদের কোনো আলোকচিত্র আমরা পাই না। সীতা বা রাধা দেখতে কেমন ছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপলাবণ্যে কী অসাধারণ দিব্যতা ছিল—এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। এদিক দিয়ে সারদাও শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই অনন্যা, তাঁকেও আমরা ক্যামেরায় বন্দী করেছি। তাঁরই মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ধ্বনিত হয়েছে, 'ঘট, পট সব সত্যি!' ছবিতে তিনিই অধিষ্ঠিতা। তাই আলোকচিত্র কেবল ঐতিহাসিক সত্য না হয়ে ধ্যানলব্ধ বিষয় হয়ে আধ্যাত্মিক ভাবনার ও উপাসনার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

শ্রীসারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র পাশাপাশি এখন বাংলা তথা ভারতের ঘরে ঘরে পূজিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অবতীর্ণা হয়েছিলেন শ্রীমা সারদা। যুগ সন্ধিক্ষণে সভ্যতা, বিশেষ করে নারী জাগরণের এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা। সে-আমলে বাংলার গ্রাম ও শহরের রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা যে বেশভূষা ধারণ করতেন তা আধুনিক বেশভূষার থেকে পৃথক। শ্রীমায়ের যেসব আলোকচিত্র আমরা দেখি তারমধ্যে তৎকালের গ্রাম বাংলার সরলতা, শালীনতা ও আভিজাত্য ফুটে উঠেছে। মাথায় ঘোমটা, চুলের গুচ্ছ ডান কাঁধ বেয়ে সামনের দিকে দৃশ্যমান। পরনে লাল নরুন-পাড় শাড়ি, হাত দুটি কোলের উপর। দিব্যমাতৃত্ব মাখা হাতে দুটি ডায়মন্ড কাটা বালা—শ্রীরামকৃষ্ণের করিয়ে দেওয়া। আসনে উপবিষ্ট সারদামণি অনন্য ও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। শান্ত, সমাহিত, অনন্তে প্রসারিত সেই দৃষ্টি। —সারদা মায়ের এই আলোকচিত্রটি সর্বাধিক প্রচারিত ও পূজিত আলোকচিত্র। সর্বজনপূজিত আলোকচিত্রটি যখন গৃহীত হয় তখন শ্রীমায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশ। আশ্চর্যজনকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনপূজিত উপবিষ্ট আলোকচিত্রও গৃহীত হয় তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। সে সময়ে মেয়েদের ফটো তোলানোর শখ একেবারেই ছিল না। তার পরিবর্তে আভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবে দেওয়ালে শোভা পেত বিরাট বিরাট অয়েলপেন্টিং। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা সারদার পিতৃগৃহে তোলা কোনো ফটোই নেই। জয়রামবাটী থেকে শ্রীমা

যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস। নহবতের সেই ছোট্ট ঘরে শ্রীমা যেভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করতেন সেখানে তাঁর আলোকচিত্রের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনের যে দোতলা বাড়িতে শ্রীশ্রীমা ভাড়া থাকতেন সেখানেই শ্রীমায়ের প্রথম আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়। এই আলোকচিত্রটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস সারা ওলি বুল ও মিস্ ম্যাক্‌লাউড। এ প্রসঙ্গে 'যুগজননী সারদা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা সংবরণের বারো বছর পরে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি শ্রীমায়ের অপরিসীম স্নেহ-কৃপালাভে ধন্যা মিসেস সারা ওলি বুলের কাছ থেকে শ্রীশ্রীমায়ের ফটো তোলার প্রথম প্রস্তাব আসে।.....১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস সারা ওলি বুল ও মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হন। এঁরাই প্রথম তিন বিদেশিনী, যাঁরা শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মিসেস বুলকে 'ধীরামাতা' নামে অভিহিত করতেন। মিসেস ওলি বুলের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, শ্রীশ্রীমায়ের একটি আলোকচিত্র প্রতিদিন স্মরণ-মনন ও অনুধ্যানের জন্য তাঁর দেশে (আমেরিকায়) নিয়ে যান। এই ফটো তোলার প্রস্তাবে প্রথমে শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কন্যাসম মিসেস বুলের আন্তরিক অনুরোধ তিনি এড়াতে পারেননি।" (পৃ ৪৫২)

মিসেস সারা ওলি বুলের অনুরোধে শ্রীমা ফটো তুলতে সম্মত হলেও তিনি এক্ষেত্রে একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবী গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলছেন, '১৩০৫ ১৮৯৮ সালে শ্রীযুক্ত ওলি বুল মায়ের ছবি তোলাতে চাহিলে স্টুডিওতে যাওয়া বা অপরিচিত ফটোগ্রাফারের সম্মুখে ঘোমটা খোলা ব্রীড়াশীলা মায়ের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তিনি প্রথমে অসম্মত হন। কিন্তু পরে ওলি বুলের আকুল মিনতিতে অগত্যা সাহেব ফটোগ্রাফার আনিতে বলিলেন। কারণ সাহেবদের দেশে মেয়েদের ফটো তোলা নিত্যকার ব্যাপার। সাহেব আসিতেই মা তাঁহার লজ্জাশীলতা কাটাইয়া ফটো তুলিতে বসিলেন।" (পৃ ৩৩৫)

শ্রীমায়ের আদেশ অনুসারে ১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একই দিনে, একই আসনে পর পর দুটি এক্সপোজার নেওয়া হয়। ফটোগ্রাফার ছিলেন মিস্টার হ্যারিংটন। এই বিশেষ ফটো দুটি তোলার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী গোলাপ-মা, নিবেদিতা, মিসেস বুল ও ক্যামেরাম্যান মিস্টার হ্যারিংটন। স্বামী অরূপানন্দ শ্রীমাকে তাঁর এই বিখ্যাত ফটো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা হল এইরকম—স্বামী অরূপানন্দ শ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, 'মা, এ ফটো কি ঠিক? উত্তরে মা বলেন, "হাঁ, এটি ঠিক। তবে পূর্বে আরও মোটা ছিলুম। যখন ছবি ওঠায় তখন যোগীনের খুব অসুখ। তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিছল। মন ভালো নয়, যোগীনের অসুখ বাড়ছে তো, কাঁদছি, আবার যোগীন ভালো থাকছে তো ভালো থাকছি। সারা মেম (Sara Bull) এসে এইটি ওঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।' তাই শেষে এই ছবি ওঠায়।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, ১৮৯৮, পৃ. ৩৩৯)।

পীযূষকান্তি রায়, যুগজননী সারদা গ্রন্থে শ্রীমায়ের ফটো প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ মহারাজ [জন্মসূত্রে আমেরিকান, পূর্বাশ্রমে জন ইয়েল, গবেষক ও সুলেখক, পরবর্তীকালে ফ্রান্সের গ্রেৎস-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত এবং ২২.৩..১৮৯৮ তারিখে গ্রেৎস কেন্দ্রে থাকাকালীন প্রয়াত] কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে, ফটো তোলার আগে শ্রীশ্রীমাকে একটি সুন্দর আসনে বসানো হয় ও তাঁর সামনে দু-চারটি ফুলের টবও রাখা হয়। নিবেদিতা ও মিসেস বুল শ্রীশ্রীমাকে আসনের ওপর বসিয়ে তাঁর ঘোমটা ও চুল ঠিকঠাক করে দেন। শ্রীশ্রীমা লজ্জায় অপরিচিত ও বিদেশি পুরুষ ফটোগ্রাফারের দিকে তাকাতে পারেননি। তিনি কিছুক্ষণ নতদৃষ্টিতে বসে থাকেন এবং সমাধিস্থা হয়ে পড়েন। এই অবস্থায়ই ক্যামেরাম্যান শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম ফটোটি তুলে নেন। এ কারণেই প্রথম ফটোতে শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি নীচের দিকে। এ ফটোটিকে বলা হয় 'নত-দৃষ্টি চিত্র' (Looking down pose)। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ তাঁর ঐ ভাষণে আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম ফটোটি নেওয়ার পর শ্রীশ্রীমা চোখ তুলে প্রশ্ন করেন শেষ হয়েছে কি? এ-সুযোগে সাহেব ফটোগ্রাফার শ্রীশ্রীমায়ের দ্বিতীয় ফটোটি তুলে নেন। এই দ্বিতীয় ফটোটিই সুপরিচিত 'পুজিত ফটো' (Worshipped pose)।"

বর্তমান আলোচনা থেকে এ তথ্য সুস্পষ্ট হয় যে ওলিবুলের প্রচেষ্টায় একই দিনে একই আসনে দুটি এক্সপোজার নেওয়া হয়। তার একটি প্রথমে, পরেরটি স্বাভাবিকভাবেই প্রথমটির পরে তোলা হয়। কিন্তু এই দুটি ছবির কোনটি আগে গৃহীত আর কোনটি পরে এ নিয়ে সাম্প্রতিককালে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে শ্রীমায়ের নতদৃষ্টি চিত্রটি (Looking down pose) প্রথম ছবি বলে অনেকে দাবি করেন। দ্বিতীয় মতে শ্রীমায়ের 'নতদৃষ্টির ছবি'টি দ্বিতীয় ছবি। সর্বজনপুজিত ছবিটিই শ্রীমায়ের প্রথম গৃহীত চিত্রের দাবি রাখে।

'নতদৃষ্টিতে গৃহীত চিত্রটি শ্রীমায়ের প্রথম চিত্র এই মত পোষণ করে পীযূষকান্তি রায় তাঁর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ফটো প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন, "শ্রীশ্রীমায়ের দ্বিতীয় ফটোটি নেওয়ার ঘটনাটি সামান্য বিতর্কমূলক, যেহেতু প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আজ কেউ বেঁচে নেই, তাই এর মীমাংসার জন্য কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। প্রথম ফটো তোলার পরই শ্রীশ্রীমায়ের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সাহেব ফটোগ্রাফারের পক্ষে দ্বিতীয় এক্সপোজার নেওয়া সম্ভব হতে পারে না। ফিল্ড ক্যামেরায় কাচের নেগেটিভ কাঠের কেসের মধ্যে ঢাকা থাকে এবং প্রতিটি ছবি নেওয়ার পর সেই নেগেটিভ ক্যামেরা থেকে বার করে পরে ছবির জন্য নতুন নেগেটিভ কেসে পরাতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়; সুতরাং এ বিষয়ে একমত হওয়া ছাড়া উপায় নেই যে, শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম ফটো নেওয়ার সময় মিসেস বুল নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন যে, ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের শাড়ির অংশে তাঁর পদাঙ্গুলির কোন অংশই দৃশ্যমান নয়। ফলে তিনি, মনে হয়, দ্বিতীয়বার শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লাভ করে দ্বিতীয় ফটোর ব্যবস্থা করেন এবং সাহেব ক্যামেরাম্যান দ্বিতীয় নেগেটিভের সাহায্যে সাধারণ প্রথানুসারে আরেকটি অতিরিক্ত ছবি তুলে নেন। বলা বাহুল্য, অনুমতি লাভের পর দ্বিতীয় ফটোটি তোলার আগে নিশ্চয়ই মিসেস

বুল শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের ওপর থেকে শাড়ির অংশ সরিয়ে দেন এবং তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের মন্তব্য থেকে; 'ফটো তুলিবার সময় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি কাপড়ে ঢাকা ছিল। পদাঙ্গুলি বাহিরে রাখিয়া একখানি ফটো তোলার প্রয়োজন মিসেস বুল অনুভব করেন, দেশে গিয়া পুজা করিবেন বলিয়া, মাকে সেই কথা জানাইয়া, অনেক বলিয়া কহিয়া দ্বিতীয়বার ফটো তুলাইতে সম্মত করানো হয়। গোলাপ-মা'র মুখে এই ঘটনা অনেকেই শুনিয়াছেন—তিনি মায়ের সঙ্গে ছিলেন।" (যুগজননী, পৃ ৪৫৪-৪৫৫)।

শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি রায়ের অভিমত বহুদিন ধরেই রামকৃষ্ণ-সারদা সাহিত্যে বলবৎ ছিল। সাম্প্রতিককালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী সত্ত্বানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দুটি ফটো' প্রবন্ধে (দ্র উদ্বোধন, ১০২তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১০০৭) এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেন। তাঁর মতে মায়ের সর্বজনপুজিত ফটোটিই প্রথম ফটো এবং নতদৃষ্টিতে চিত্রটি দ্বিতীয় ফটোরূপে গৃহীত হয়। তিনি তাঁর বক্তব্যের মূল উৎসরূপে স্বামী অরূপানন্দের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যকে উপস্থাপিত করেছেন। স্বামী অরূপানন্দ বা রাসবিহারী মহারাজ ছিলেন শ্রীমায়ের অন্যতম সেবক সন্ন্যাসী সন্তান। শেষ জীবনে তিনি কাশী অদ্বৈত আশ্রমে থাকাকালীন কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারী স্বামী সত্ত্বানন্দকে এই তথ্য প্রদান করেন।

পঁয়ত্রিশ

স্বামী অরূপানন্দ বা রাসবিহারী মহারাজ শ্রীমায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সেবকরূপে দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। এই সূত্রে তিনি গোলাপ-মা, ও যোগীন-মা প্রমুখ শ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বামী অরূপানন্দ কাশীতে থাকাকালে স্বামী সত্যানন্দকে শ্রীমায়ের ফটো প্রসঙ্গে নতুন তথ্য প্রদান করেন। যে তথ্যের মাধ্যমে এতকালের পুজিত ফটোই শ্রীমায়ের প্রথম ফটোরূপে চিহ্নিত করা হয়, সে ফটোটি দ্বিতীয় গৃহীত চিত্ররূপে স্বীকৃত ছিল। স্বামী সত্যানন্দ এই বিষয়ে লিখেছেন, সে অনেক দিনের কথা। বোধহয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি হবে, একদিন স্বামী অরূপানন্দ তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের নতদৃষ্টি ছবিখানি হাতে নিয়ে নিজে থেকেই বলতে লাগলেন, মায়ের এই নতদৃষ্টি ছবিখানি আমার বেশি ভালো লাগে—তাই আসনে রেখেছি। এটা মায়ের দ্বিতীয় ছবি। বোধহয় শুনেছিস, বিশেষ করে মিসেস বুলের আগ্রহেই শ্রীশ্রীমায়ের এই ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের কিন্তু কিছুতেই ফটো তোলার মত ছিল না। পরে মিসেস বুল যখন বললেন, আপনার ফটো দেশে নিয়ে গিয়ে—নিজের বাড়িতে রেখে পুজো করব, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীশ্রীমা ফটো তোলার ব্যাপারে রাজি হয়েছিলেন। তারপরে নিবেদিতা ও মিসেস বুল শ্রীশ্রীমাকে গোলাপমার সাহায্যে বাড়ির (যে বাড়িতে শ্রীশ্রীমা তখন ছিলেন—১০/২ বোসপাড়া লেন) ছাদের ওপরে ফটো তোলার জন্য নিয়ে যান। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের গভীর অন্তর্মুখ অবস্থা, স্বাভাবিক হুঁশ একেবারেই ছিল না এবং কোনোপ্রকার কথা বলা বা মন্তব্য প্রকাশ করার মতো অবস্থাতেও ছিলেন না। নিবেদিতারা যেভাবে চলছিলেন বা হস্তপদাদির সংস্থান করাচ্ছিলেন সেভাবেই, যন্ত্রচালিতের মতো করে যাচ্ছিলেন।....এই দ্যাখ, ভালো করে লক্ষ্য করে, যদিও তাঁর মুখ ক্যামেরার দিকে রয়েছে এবং চোখ দুটোও খোলা রয়েছে, তবু মন যেন কোথায় চলে গিয়েছে—দৃষ্ট বস্তুর ওপরে একেবারেই নেই। কতকটা vacant look (শূন্য দৃষ্টি) বলা যেতে পারে। নিবেদিতা ও মিসেস বুল দুজনেই খুব মনোযোগ দিয়ে, ছবিটি যাতে নিখুঁত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে, শ্রীশ্রীমাকে ঠিক করে বসিয়েছিলেন এবং কাপড় ও হস্তপদাদির যথাযথভাবে সংস্থান করেছিলেন। আমি শুনেছি, নিবেদিতাই মায়ের ডান হাতের ওপর থেকে কাপড় সম্পূর্ণ সরিয়ে তাঁর চুলগুলোকে সামনের দিকে এনে সাজিয়েছিলেন। এভাবে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম ছবিখানি তোলা হয়—যা সর্বত্র পূজিত হচ্ছে।

"এর মধ্যে শ্রীশ্রীমার বাহ্য বিষয়ে হুঁশ এসে যায় এবং 'গোলাপ, হয়েছে" বলেই উঠে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু ফটোগ্রাফার আরেকটি ছবি নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলায় শ্রীশ্রীমাকে আরও একটু অপেক্ষা করার অনুরোধ জানানো হয়। ইতিমধ্যে মায়ের দৃষ্টি তাঁর অনাবৃত ডান হাতটির দিকে পড়ায় তিনি তাঁর বাম হাত দিয়ে ডান হাতের পাশের আঁচলটিকে টেনে দেন এবং অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকেন ও নড়েচড়ে বসেন। ভালো

করে লক্ষ্য করে দ্যাখ, বাম হাতটিকে ঐভাবে ব্যবহার করার পর মায়ের পক্ষে ঠিক পূর্বের মতো যেমনভাবে নিবেদিতা হাতের আঙুলগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন, সেভাবে যথাস্থানে রাখা আর সম্ভব হয়নি—কতকটা এলোমেলোভাবেই রেখেছেন। এরপরে মা আর কিছুতেই ক্যামেরার দিকে তাকাতে না পারায় অগত্যা ফটোগ্রাফারকে ওইভাবেই দ্বিতীয় ছবিটি তুলতে হয়।" (যুগজননী সারদা, পৃ. ৪৭০)।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম ছবি কোনটি—এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তাঁর তোলা দুটি ছবির মতো তৃতীয় ফটোটিও বহুদিন বিতর্কিত ছিল। এই তৃতীয় ফটোটি গৃহীত হয়েছিল একই দিনে, বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনে, ওলি বুলের প্রচেষ্টায়। তৃতীয় ফটোটিতে শ্রীমা একাকী নন। সঙ্গে রয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটেছে এই অসাধারণ ছবিটির মধ্যে। এই ফটোটিকে আখ্যা দেওয়া হয়—'শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা'। এই ফটোটি যখন গৃহীত হয় তখন শ্রীমায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশ আর নিবেদিতার বয়স একত্রিশ।

শ্রীমার গৃহীত এই তৃতীয় চিত্রটিতে তো শ্রীশ্রীমা প্রথম ও দ্বিতীয় ফটোর মতো সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে নেই। তিনি বাঁয়ে ও নিবেদিতা ডাইনে বসেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের হাত-দুখানি কোলের ওপর, পরিধানে লাল নরুনপাড় সাদা শাড়ি, সামান্য ঘোমটা টানা, প্রসন্ন মুখমণ্ডল, কুঞ্চিত কেশরাশি কাঁধ বেয়ে বুকের ডান পাশে লুটিয়ে পড়েছে, হাতে সে-আমলের জনপ্রিয় 'ডায়মন্ডকাটা' সোনার বালা, তিনি একটি মৃগচর্মের আসনে বসে আছেন এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ভগিনী নিবেদিতার দিকে।" নিবেদিতা এখানে সাদা-গাউন পরেছেন, চুল খোঁপা করে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পা-দুখানি সিঁড়ির ধাপের ওপর রেখেছেন, হাত বা পায়ের কোনো অংশ দৃশ্যমান নয় এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রশস্ত আসনের এক প্রান্তে সংকোচের সঙ্গে তিনি বসেছেন। বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে তাকিয়ে থাকে, নিবেদিতাও শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে তেমনি তাকিয়ে আছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে নিবেদিতার দৃষ্টিতে অপার ভক্তি, ভালোবাসা ও আনন্দ উদ্ভাসিত।'

শ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতার এই যুগ্ম ফটোটি বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। কারণ, এ ফটোটি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল, এই ফটো কখনই মৌলিক ফটো নয়। কারণ শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা একসঙ্গে মুখোমুখি বসে কোনোদিন কোনো ফটো তোলেননি—দু'জনের ফটো একসঙ্গে জুড়ে ফটোটিকে কারচুপি করা হয়েছে। এইরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে বহুদিন এই ফটোটিকে স্বীকার করা হয়নি। এই ফটোটি সম্বন্ধে নিবেদিতা মিসেস ওলি বুল ও মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে ৫ জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে এক চিঠিতে লিখেছিলেন 'My proof and negative cost nothing. So unless you write to the country, we shall keep the 3 negatives here [in Calcutta]' Letter of Sister Nivedita-(ed). Sankari Prasad Basu. Vol-1. Nababharat Publishers. Cal. 1937. pp 36-37. সুতরাং ভগিনী নিবেদিতার পত্র থেকে এই ফটোটির সমর্থন পাওয়া যায়। 'যুগজননী সারদা' গ্রন্থে 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ফটো প্রসঙ্গ' নিবন্ধে পীযুষকান্তি রায় জানিয়েছেন, "ফটোটি মৌলিক নয়—এ ধারণা পোষণ করতেন বলেই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রথমে ফটোটির অনুমোদন মেলেনি এবং দীর্ঘ চুয়ান্ন বছর এই ফটোটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ দ্বারা

প্রকাশিত কোনো পত্রিকায় বা গ্রন্থে ছাপা হয়নি। মনে হয়, নিবেদিতার উল্লিখিত চিঠিটির বিষয়ে অবহিত না থাকার কারণে এই মনোরম আলোকচিত্রটিকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীশ্রীমায়ের সমসাময়িক কোনো গ্রন্থকার বা আলোকশিল্পী এ ফটোটি সম্পর্কে সমর্থনযোগ্য কোনো তথ্য কোথাও নথিভুক্ত করেননি। এমনকী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও সেবক কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও এ সম্পর্কে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতার এই বিতর্কিত যুগ্ম ফটোটি যে সাজানো নয় বা ফটোগ্রাফির কারচুপি নয় এবং একই দিনে ও একই সঙ্গে তোলা তিনটি মৌলিক ফটোর অন্যতম সে-রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে দীর্ঘদিন পোষিত ত্রুটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটেছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের এক বিবৃতিতে।" (পৃ. ৪৬১)

শ্রীমায়ের তৃতীয় ফটোটির রহস্য উন্মোচন করেন স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ। জন্মসূত্রে আমেরিকান এই সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের বিভিন্ন ফটো সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেছেন। ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে আসার পথে তিনি ইংল্যান্ড ঘুরে আসেন। ইংল্যান্ডে তিনি 'আর্ল অব স্যান্ডউইচে'র ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। জর্জ মন্টেগু পরবর্তীকালে নবম আর্ল অব স্যান্ডউইচ হন। অ্যালবার্টা স্টারজিসের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়।

অ্যালবার্টার মা প্রথমে ছিলেন মিসেস বেটি স্টারজিস, পরে মি ফ্রান্সিস এইচ, লেগেটকে বিয়ে করে মিসেস বেটি লেগেট হন। লেগেট দম্পতি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও শিষ্যা। স্বামীজির শিষ্যা মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ছিলেন মিসেস লেগেটের দিদি, অতএব অ্যালবার্টার মাসি। অ্যালবার্টা ছিলেন জর্জ মন্টেগুর প্রথমা স্ত্রী। জর্জ মন্টেগুর দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ এই ফটোটির একটি মূল কপি লাভ করেন। কিন্তু শ্রীমা ও নিবেদিতার ফটোর আদি কপি জর্জ মন্টেগুর বাসভবনে গেল কী করে। এ প্রসঙ্গে পীযূষকান্তি রায় লিখেছেন, "১৮৯৯ সালের ৪ জানুয়ারি নিবেদিতা তাঁর বান্ধবী মিসেস হ্যামন্ডকে যে চিঠি লেখেন তা থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় নানাজনের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের দ্বিতীয় ফটো ও শ্রীশ্রীমা-নিবেদিতার যুগল-ফটোর আদি কপি পাঠিয়েছিলেন। মিসেস হ্যামন্ডকে তিনি তাঁর ঐ চিঠিতে এমন নির্দেশও দিয়েছিলেন যে শ্রীশ্রীমায়ের এ-ফটো সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য নয়।' এই অবস্থায় সহজেই অনুমান করা যায়, নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যে শ্রীশ্রীমায়ের ফটোর কপি বিশেষ করে তাঁদেরই যেন উপহার দেওয়া হয় যাঁরা শ্রীশ্রীমাকে চেনেন, জানেন ও ভক্তি করেন এবং তাঁর ঐ ফটোর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। অতএব এই পরিস্থিতিতে অনুমান করা যায় যে, কোনো এক সময়ে মিস ম্যাকলাউড, মিসেস হ্যামন্ড অথবা নিবেদিতার মারফত এই ফটোর একটি মূল প্রতিলিপি অ্যালবার্টার ইংল্যান্ডের প্রাসাদে আসে।" (পৃ. ৪৬৪)।

ছত্রিশ

শ্রীমায়ের ফটো প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে, শ্রীমা দেখতে কেমন ছিলেন? শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী সারদেশানন্দ লিখেছেন, "মায়ের হস্ততল রক্তাভ ছিল, অনেকেই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। পদতলও ছিল লাল—ঠিক স্থলপদ্মের আভা, সুস্থ অবস্থায় তাঁহার কৃপায় কাহারো কাহারো ভাগ্যে দর্শন মিলিয়াছে। মস্তকের সুদীর্ঘ ঘন কেশরাশি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ, যেন সূক্ষ্ম রেশমসূত্র. অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কুটিল বক্র। সুগঠিত মুখমণ্ডলে দীর্ঘনাসা সত্যই তিল ফুলের মতো, ডগার দিকে। প্রশান্ত স্থির কৃপাদৃষ্টি, যাহা সকলেরই অন্তরে সর্বদা করুণা বর্ষণ করিত। প্রশস্ত উজ্জ্বল কপাল, প্রসন্ন বদনমণ্ডল—দেখিলেই চিত্ত শান্ত হইত। শ্যাম-গৌর রং প্রথমে ছিল উজ্জ্বল, শেষ বয়সে ম্লান হইয়াছিল। দীর্ঘাবয়ব, হস্ত-পদযুগলও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, একটু বাঁদিকে কাত হইয়া চলিতেন ধীরে ধীরে।" (শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, পৃ. ৮৭-৮৮)।

১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে মিসেস ওলি বুলের প্রচেষ্টায় তোলা শ্রীমায়ের তিনটি ফটোর পর থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শ্রীমায়ের জীবৎকালে প্রায় চল্লিশটি ফটো তোলা হয়। এরমধ্যে দুটি ফটো গৃহীত হয় তাঁর মহাসমাধির পর। শ্রীমায়ের সর্বশেষ ফটোটি তোলা হয় বিষ্ণুপুরে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরে যখন শ্রীমায়ের এই আলোকচিত্রটি তোলা হয় তার ঠিক পাঁচ মাস পরেই তাঁর মহাসমাধি ঘটে। শ্রীমায়ের সর্বশেষ এই ফটোটিকে আখ্যা দেওয়া হয় 'বিষ্ণুপুরে শ্রীশ্রীমা'। শ্রীমায়ের ফটো তুলতে যে সৌভাগ্যবান ফটোগ্রাফাররা সমর্থ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে হ্যারিংটন, বি. দত্ত, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, স্বামী সত্যকাম ও ডঃ বশীশ্বর সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি রায় 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ফটো প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে শ্রীমায়ের সেবক স্বামী ঈশানানন্দের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "মায়ের ফটো প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে এই বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী [স্বামী ঈশানানন্দ] তাঁর স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গিতে লেখককে বলেন 'মাতৃদর্শনে শৌখিন আলোকচিত্রী-ভক্তরা যখন পালকি, গরুরগাড়ি বা পদব্রজে তাঁদের গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতেন, তখন আমি তাঁদের বিদায় জানাবার জন্য তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের প্রধান সড়ক পর্যন্ত পৌঁছে দিতুম। ঐ সুযোগে আমি তাঁদের অনুরোধ জানাতুম যেন দেশে ফিরে তাঁদের তোলা মায়ের ফটোর দু-একটা কপি আমাকে পাঠানো হয়। কেউ আমার অনুরোধের মর্যাদা রেখে ফটোর কপি পাঠিয়েছেন, আবার অনেকে এক কপিও পাঠাননি।" প্রবন্ধকার জানিয়েছেন স্বামী ঈশানানন্দের সংগ্রহে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অন্তত পঁচিশখানি বিভিন্ন ভঙ্গির ফটো ছিল যেগুলি জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের দর্শনের সুবিধার জন্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রীমায়ের শেষ ছবি সম্বন্ধে প্রবন্ধকার বলেছেন, "স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় মা তাঁর জন্মভূমি জয়রামবাটী চিরতরে পরিত্যাগ

করে কলকাতা রওনা হন। পথে বিষ্ণুপুরে তিনি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে ২৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্ন থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাঁর এই সাময়িক অবস্থিতির সুযোগে সুরেশ্বরবাবুর ভাই বশীশ্বর সেন একটি ফটো তোলেন। ঐ ফটোতে দেখা যায়, ঐ বাড়ির লম্বা বারান্দায় শ্রীশ্রীমা মধ্যাহ্নভোজনে বসেছেন আর তাঁর অদূরে পঙ্ক্তি আহার করছেন সুরবালা (রাধুর মা), নলিনী, নন্দরানি, যামিনী, সুশীলা (মাকু) ও নবাসনের বউ।"

জীবৎকালে শ্রীশ্রীমায়ের প্রায় চল্লিশটি ফটো সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও শ্রীমায়ের অধিকাংশ আলোকচিত্রই পরিচিত নয়। সাধারণত, প্রথমদিন গৃহীত প্রথম ছবিটিই শ্রীমায়ের ছবিরূপে বেশি পরিচিত। শ্রীমায়ের আর একটি ছবি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে—এটি ফটোগ্রাফ নয়। এটি হল চেকোশ্লাভাকিয়ার প্রখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাকের (Frank Dvorak) অঙ্কিত প্রতিকৃতি। 'যুগজননী সারদা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "চেকোশ্লাভাকিয়ার প্রখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক ছিলেন স্বামী অভেদানন্দের দীক্ষিত শিষ্য। আজীবন তিনি পবিত্র কৌমারব্রত পালন করেছেন। তাঁর বোন হেলেনা ডোরাকও ছিলেন চিরকুমারী। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আগেই অবশ্য ফ্রাঙ্ক ডোরাকের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের পত্রালাপ হয় এবং শ্রীমা সারদাদেবীর চিত্রটি তিনি এঁকেছিলেন স্বামী সারদানন্দের 'নির্বন্ধাতিশয্যে"। (পৃ. ৪৮৫)।

ফ্রাঙ্ক ডোরাক কেবল শ্রীমা সারদার প্রতিকৃতি অঙ্কন করেননি। তিনি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন। সুদূর চেকোশ্লাভাকিয়ায় বসে ফ্রাঙ্ক ডোরাক কী করে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠলেন? সে এক কাহিনী। প্রাগের এই চিত্রশিল্পী স্বপ্নে একদিন এক মহাপুরুষের মূর্তি দেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল—He must be an Indian saint. কিন্তু কে এই মহাযোগী? অনেক অনুসন্ধান করেও জানতে পারেননি ডোরাক। কিছুদিন পরে তাঁর হাতে আসে ম্যাক্সমুলারের লেখা—'Life and saying of Ramakrishna.' বইখানা খুলে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখেই তিনি চমকে ওঠেন। বুঝতে পারেন, এই সেই মহাত্মা যাঁর ছবি তিনি দেখেছেন স্বপ্নে। এরপর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের বড় আকারের তৈলচিত্র আঁকার তীব্র প্রেরণা বোধ করলেন এবং স্বামী সারদানন্দের সহায়তায় একটি তৈলচিত্র সম্পূর্ণ করলেন ফ্রাঙ্ক ডোরাক।

শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্র সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ফ্রাঙ্ক ডোরাক শ্রীমায়ের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে শুরু করেন। এবং শ্রীমায়ের প্রতিকৃতি অঙ্কনের কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রীমার চিত্রটি যখন সম্পূর্ণ হয় তখন স্বামী সারদানন্দও পরলোকগমন করেছেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের বোন হেলেনা ডোরাক স্বামী সারদানন্দের নামে ছবিটি পাঠিয়েছেন, চিত্রটির জন্য যে শুল্ক ধার্য হয়েছিল তা অতিরিক্ত মনে হওয়ায় বাগবাজার শ্রীমায়ের বাড়ির কর্তৃপক্ষ সেই ছবিটিকে গ্রহণ করলেন না। চিত্রটি ফিরে গেল হেলেনা ডোরাকের কাছে। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে। হেলেনা স্বামী অভেদানন্দকে শ্রীমায়ের প্রতিকৃতিটি পাঠালেন। প্রতিকৃতিটি নিউইয়র্কে পৌছোবার আগেই স্বামী অভেদানন্দ কলকাতায় ফিরে এসেছেন এবং বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেছেন। সুতরাং অবশেষে সেই ঐতিহাসিক প্রতিকৃতি কলকাতায় উপস্থিত হল। 'যুগজননী সারদা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

"চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে শ্রীমার তৈলচিত্রটি কলকাতায় এসে পৌঁছলো ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। স্বামী অভেদানন্দ যেদিন শুল্ক বিভাগের অফিসে চিত্রটি আনতে গেলেন, 'গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল'-এর অধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন চিত্রটির সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য। চিত্রটি খোলা হলে এর অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ভালো করে দেখে শুনে তিনি বললেন, চিত্রটির দাম কমপক্ষে পাঁচশো টাকা হওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী শুল্ক-বিভাগ চিত্রটির উপর শুল্ক ধার্য করলেন পঁচাত্তর টাকা এবং বললেন, তখনই তা দিতে হবে। অথচ স্বামী অভেদানন্দ বা অধ্যক্ষ— কারো কাছেই তখন এক পয়সাও নেই। এমন সময় দেখা গেল, গণেন মহারাজ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। স্বামী অভেদানন্দকে দেখে তিনি ভিতরে এলেন এবং সব শুনে নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, ঠিক পঁচাত্তর টাকাই আছে। গণেন মহারাজের কাছ থেকে ঐ টাকা ধার করে শুল্ক হিসাবে দিয়ে শ্রীমার তৈলচিত্রটি সঙ্গে করে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত সমিতিতে ফিরে এলেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের ইচ্ছা পূর্ণ হল। শ্রীমার তৈলচিত্র স্থান পেল শ্রীরামকৃষ্ণে তৈলচিত্রের ডান পাশে। এ খবর পেয়ে হেলেনা ডোরাক খুব খুশি হয়েছিলেন। সে কথা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ তারিখে স্বামী অভেদানন্দকে প্রাগ থেকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়।" (পৃ. ৪৮৬)

শিল্পের দিক দিয়ে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীমায়ের ছবি এক শ্রেষ্ঠ অবদান। স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিতে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের অঙ্কিত শ্রীমায়ের ছবি যেন "ঠিক ষোড়শ মূর্তি। যেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে বসে আছেন।" ....এতে কালার-কম্বিনেশনের তুলনা নেই। ....লাবণ্য, কমনীয়তা ও সফ্‌টনেস-এর সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও স্বর্গীয় ভাগের অভিব্যক্তি শ্রীশ্রীমার ছবিতে সুপরিস্ফুট। অফুরন্ত ভালোবাসা, করুণা ও মাতৃত্বের পূর্ণবিকাশ ছবিতে প্রতিফলিত। শ্রীশ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না। নারীত্বের সকল কিছু সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ছবিটিতে মূর্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সর্বদা প্রসন্নতা ও ক্ষমাসুন্দর ভাব মুখে ও চোখে সুস্পষ্ট।

"আমার কী ভাব জানো? শ্রীশ্রীমার কেন, সমস্ত দেবীমূর্তিই নবযৌবনসম্পন্না হওয়া উচিত। প্রাচীন ছবিতে এবং ভাস্কর্যে দেখবে দেবীমূর্তিতে সর্বদাই নবযৌবনরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বুড়ো, অসুখে জর্জরিত, রোগে বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত—দেবদেবীদের এই ধরনের ছবি আঁকা বা প্রতিকৃতি তৈরি করা মোটেই উচিত নয়। শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধেও তা-ই। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীশ্রীমার ছবিতে দেবীভাব ও স্বর্গীয় সুষমা সুপরিস্ফুট। অপূর্ব লাবণ্য ও অনাবিল আনন্দপূর্ণ স্নিগ্ধতা সমগ্র ছবিখানিতে মাখানো রয়েছে। ছবিটির সত্যই তুলনা নেই।" (পৃ. ৪৮৮)। অনেকের মতে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীমায়ের ছবিটির মধ্যে পাশ্চাত্যভাব বড় বেশি। কিন্তু শ্রীমায়ের একটি বিশেষ লাবণ্য ফুটে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবী তৈলচিত্রই শিল্পীকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে জগতে। তাই স্বামী অভেদানন্দ এই ছবি প্রসঙ্গে বলেছেন, "শ্রীশ্রীমার ছবিতে মানুষীভাবের পরিবর্তে দেবীভাব সুপরিস্ফুট। ...শ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না, জগদ্ধাত্রীরূপিণী ও পবিত্রতার জীবন্ত মূর্তি। তাই তাঁর ছবি আঁকতে গেলে শিল্পীকে অপার্থিব রাজ্যের অধিবাসী হতে হবে।"

সাইত্রিশ

লোকাচার ও শ্রীমা

গুরুরূপে শ্রীমা যখন জগতের কাছে আবির্ভূতা, তখন আমাদের দেশে শাস্ত্রের নির্দেশের পরিবর্তে লোকাচার, স্ত্রীআচারের চলন বেশি। সেইসময় একটি মত প্রচলিত ছিল স্ত্রীলোকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলে যথার্থ ফললাভ হয় না। দীক্ষা নেওয়ার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়ে কোনো ভক্ত এক সন্ন্যাসীকে প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন, 'মা তো মেয়েমানুষ, মা দীক্ষা দেবেন কী করে? সন্ন্যাসী একথায় আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, বলিস কী রে, এসব আবার কোথায় শিখেছিস! উত্তর এল 'এক সাধুর লেখা বই থেকে।' অর্থাৎ তখন কোনো কোনো সম্প্রদায় নারীর পইতে গ্রহণের অধিকার নেই—এর মতো নারীর দীক্ষাদানের অধিকারহীনতার কথা প্রচার করত। অথচ রামকৃষ্ণ আন্দোলনে ঘটনাটি কিছুটা বিপরীত—এখানে শ্রীমাই হলেন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল তাঁর আদেশের মুখাপেক্ষী নন, তাঁর আদেশ অনুযায়ী সেবা করতে সদা তৎপর। তবু সাধুরা যখন শ্রীমাকে 'মা জগদম্বা, আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বয়ং'—একথা বলেছেন তখন অনেকেই এ ধারণা করতে পারেনি। কোনো সন্ন্যাসী আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, 'কোথায় লোক সব। মহামায়া বন্ধন খুলবার জন্য উদ্বোধনে বসে আছেন কটা লোক তাঁর কাছে গেল!'

জগদম্বারূপে নয় এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে তাঁর প্রতি আকর্ষণবোধ করেছেন খুব কমই মানুষ। এর কারণ তাঁর পল্লীগ্রামে বসবাস। শ্রীরামকৃষ্ণ গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের দেবদেউলে। সে স্থান রানি রাসমণির মতো দাপুটে ও তৎকালে সর্বপরিচিত রানির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশিত করার জন্য রাজধানী কলকাতার সুধীমহলকে সামনে পেয়েছিলেন। শ্রীমার ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনি কলকাতার ভক্তবাড়িতে খুব বেশি থাকেননি। জয়রামবাটীর পল্লী অঞ্চলেই তাঁর স্নেহের আঁচলটি বিছিয়ে রেখেছিলেন। সেখানে কারো ছিলেন 'পিসিমা' কারো বা 'দিদি'। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই কি কামারপুকুরে খুব পরিচিত ছিলেন। অনুকূলচন্দ্র সান্যাল শ্রীমা সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন বিষ্ণুপুর হয়ে তাঁরা যখন কামারপুকুরে পৌঁছালেন তখন সব থেকে মুশকিল হল 'রামকৃষ্ণ পরমহংসে'র বাড়ি খুঁজে বের করা। যাকেই জিজ্ঞাসা করা যায় 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়িটি কোথায়?' সেইই এক কথা বলে, 'বলতে লারবো বাবু।' অবশেষে এক বন্ধুর মনে হল ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালোবাসতেন, এই তো সামনে জিলিপির দোকান, দোকানদারের বাবা কিংবা ঠাকুরদাদা নিশ্চয়ই তাঁকে জিলিপি তৈরি করে খাইয়েছেন, ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন।' দোকানের জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ও বুঝতে পেরেছি বাবু, চাটুজ্যেদের বাড়ি—তাই বলো না বাবু—উ-ই যে বটেক, উ-ই দেখা যাচ্ছে।' সুতরাং স্বয়ং গদাধর চাটুজ্যের যখন এই অবস্থা তখন গ্রামের

গ্রাম্য পরিমণ্ডলে তাঁর ব্রাহ্মণী শ্রীমার কী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু সেই গ্রামেই কত মানুষ তাঁর অসাধারণ স্নেহলাভ করে ধন্য হয়েছে।

লোকাচার, দেশাচার আর ধর্মবোধ—এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করতে পেরেছিলেন শ্রীমা। ঘরের মেয়েদের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। পূর্ববঙ্গে ঢাকা থেকে এসেছেন সুশীলবালা মজুমদার। তাঁর সঙ্গে শ্রীমায়ের কথোপকথন হয়েছিল এইরকম, সুশীলবালা বলছেন, 'আমি মা, ছোট ছোট বিধবা মেয়েরা মাছ খেলে—এ দেখে আশ্চর্য হলুম। আমাদের দেশে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ) তো এরকম মাছ খেতে দেয় না, সমাজে বাধে।'

মা—ওসব কী জানো? দেশাচার ও লোকাচার। আমাদের ওদেশে ছোট বিধবাদের মাছ খেতে ও গহনা কাপড় পরতে দেয়। ওদের আকাঙ্ক্ষা থাকে কিনা। নাহলে চুরি করে খাবে। যখন বুঝতে পারবে এটা সমাজবিরুদ্ধ, তখন ছেড়ে দেবে।

আমি—মা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা কী যায়!

মা—না, মা, তা সত্য বলেছ। তবু বড় হলে দশজনকে দেখে লজ্জা হয়, ঝগড়া বিবাদের সময়েও অপরের খোঁটা সইতে হয়; তাই আপনি সামলে চলে।'

সুশীলা দেবী আর শ্রীমায়ের কথোপকথনের মধ্যে কয়েকটি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তখন পূর্ববঙ্গে বিধবাদের যতটা কঠোরতা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের ক্ষেত্রে ততটা ছিল না। না কি মায়ের বাড়িতে এই কঠোরতা কিছুটা শিথিল ছিল?—এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে। তবে সুশীলা দেবী যেদিন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে গিয়েছেন মায়ের বাড়িতে সেইদিন ছোলার ডাল, চচ্চড়ি, ডালনা ও টক—এই ছিল দুপুরের প্রসাদ। শ্রীমা আদেশ করলেন, একে মাছ দাও। সুশীলা দেবী বললেন, 'না, মা, প্রসাদ খেয়েই তৃপ্ত হয়েছি, মাছ আর খাব না।'

মা—সে কী গো, এয়োস্ত্রী মানুষ, মাছ খাবে না? পায়ে আলতা পরোনি কেন?

সুশীলা দেবী—আমাদের দেশে আলতা পরার চল নেই। শাখা, সিঁদুর পরলেই লোক এয়োস্ত্রী বলে।

মা—তা হবে বা! এ দেশে শাঁখা, সিঁদুর শখ করে পরে, নোয়া আর আলতাই এয়োস্ত্রীর লক্ষণ।

এখন আমরা সমস্ত বাঙালি বিবাহিত মেয়েদের কপালে সিঁদুর বিন্দু দেখতে পাই। পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গীয় বলে ভেদ নেই। কিন্তু শ্রীমায়ের সময়ে এই আচারের তারতম্য দেখা যেত। দেশাচার ও প্রচলিত ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে প্রায়শই শ্রীমা একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী জানিয়েছেন দীক্ষা গ্রহণের পরে শ্রীমাকে প্রশ্ন করেছেন, 'মা আমাকে কি তুমি নিরামিষ খেতে বলবে? 'মা বললেন—'সে কী তুমি নিরামিষ খাবে কেন? আমার ছেলেরা নিরামিষ খাবে কেন? তুমি খাবে দাবে আর ফুর্তি করবে। যা প্রাণে চায় তাই পরবে আর যা প্রাণে চায় তাই খাবে, বাকিটা আমি দেখব।'

মায়ের বাড়িতে বহুধরনের নারীরা আসতেন। সকলেই যে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্না ছিলেন তা বলা যায় না। কিন্তু তাঁদের মেয়েলি আলোচনার মধ্যেও শ্রীমায়ের স্বাতন্ত্র্য স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকত। বড় সহজেই বুঝতে পারা যেত তাঁর আধুনিক

মানসিকতার কথা। কুন্তলিনী দাশগুপ্তা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন দীক্ষার দিন প্রসাদ পাওয়ার পরে শ্রীমার কাছে বসেছেন। শ্রীমা ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের ফটো দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সম্বন্ধে কিছু কথা বলছেন· কিন্তু তাঁর ভাইঝি মাকু ও অন্যান্যদের দ্রষ্টব্য বস্তু হয়েছে কুন্তলিনী দেবীর চুড়ি, বালা প্রভৃতি। কুন্তলিনী দেবী লিখেছেন, 'আমার হাতের সোনা বাঁধানো লোহাটা ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহা গড়াইতে দিয়াছিলাম। ইহা আমার নিকট জানিবার পরেও উপস্থিত কেহ কেহ আমার হাতে শাঁখার সঙ্গে লোহা না থাকার ত্রুটি ধরিয়া মন্তব্য করিতে লাগিলেন। তখন মা তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বললেন, 'নোয়াটা ফেটে গিয়েছে তাই।' তখন তাহারা চুপ করেন। অপর একজন মহিলা মা'র সামনে আমার বাঁকা সিঁথির বিষয়ে উল্লেখ করেন। মা'র কাছে আসিবার সময়ে আমি বিদেশে; তাড়াতাড়ির মধ্যে আর চুল আঁচড়াইয়া আসিতে পারি নাই। তাই আমার মাথায় পূর্বদিনের বাঁকা সিঁথিটাই রহিয়া গিয়াছিল। এখন মা'র সামনে ঐ বাঁকা সিঁথির কথা উঠায় আমি প্রথমে লজ্জায় মাথা নিচু করিয়া রহিলাম। মা কী মনে করিতেছেন ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তা এখন হয়েছে এইসব।' তখন আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।''

শ্রীমায়ের স্মৃতিকথায় ক্ষীরোদবালা দেবী এক অনবদ্য চিত্র প্রদান করেছেন। বাল্যবিধবা ক্ষীরোদবালা কঠোরতা করে শরীরকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন শ্রীমা তাঁকে তাই কঠোরতা করতে বারণ করেছেন। তার উপর একাদশীর দিন খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দুঃখিত হয়ে বলেছেন, 'বাছা অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি, আর কোরো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলছ। দেহ নষ্ট হলে কী নিয়ে ধ্যান করবে মা?' তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষীরোদবালা তেল ব্যবহার করেন কিনা। ক্ষীরোদবালা জানালেন, 'আমি বিধবা হয়ে আর তেল মাখিনি।' শুনিয়া মা বলিলেন, তেল মাখলে মাথা ঠান্ডা থাকে, তেলটি মেখো।' শুনিয়া বলিলাম, 'বহুদিনের অনভ্যাসে তেল যেন ছুঁতেই ঘৃণাবোধ করি, তেল মাখতে পারব না মা।' গোলা মা বলিলেন, 'নিতান্তই ছেলেমানুষ, কঠোর করে করে না খেয়ে দেহটাকে শেষ করে ফেলেছে।' গৌরী মা বলিলেন, 'তুমি মাথার চুল কেটে ফেলে দিয়েছ কেন, বাছা?' বলিলাম, 'আমাদের দেশের বিধবাদের চুল রাখে না।' তিনি বলিলেন, 'চুল না থাকলে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, চুলটি বুঝি শুধু তোমার?' তখন যোগীন মা বলিলেন, 'এই দেহটি ভগবানের মন্দির। একে সুন্দর করে রাখাই ভালো।' মা বলিলেন, 'বেশ তো করেছে, চুল থাকলে একটু বিলাসিতার ভাব আসে; চুলের যত্ন করতে হয়। যাই হোক মা, কেশের সেতু পার হয়ে তুমি এখানে এসে পৌচেছ।'

অতি কঠোরতার প্রতিমূর্তি এই বিধবাদের চেহারা যেন আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু এখানে ভাবলে ভুল হবে যে শ্রীমা তপস্যাপ্রবণ মন এবং কৃচ্ছ্রতাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বৈধব্য জীবনকে শুচিতাপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, শুচিবাইগ্রস্ত করতে চাননি। এছাড়া অনাবশ্যক কঠোরতা মোটেই পছন্দ করেননি তিনি। ক্ষীরোদবালা দেবীর স্মৃতিকথায় আরেকটি চিত্র চমকপ্রদ। আমরা তাঁর ভাষাকে অনুসরণ করব। ক্ষীরোদবালা লিখছেন, ''আমার বিধবা হওয়ার এক বৎসর পূর্বেই একদিন আমি অনেকগুলি পেঁপে কাটিয়া তরকারি রান্না করিয়াছিলাম। সেই পেঁপের কষ হাতে লাগিয়া হাত চুলকাইয়া ভীষণভাবে

আঙ্গুলগুলি ফুলিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফাটিয়া গেল এবং এমন ভীষণভাবে হাতে ঘা হইল যে, বহু চিকিৎসাতেও আর ভালো হইল না। সেই ঘা ১২ বৎসর থাকে। চামচদ্বারা ভাত খাইতে হইত। সময় সময় একটু কম থাকিত। যখন বেশি হইত, তখন হাতে জল ঢালিলে মাংস পর্যন্ত পচিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আজ এক বৎসর যাবৎ আছি, কিন্তু একদিনও মাকে হাতখানা দেখাই নাই।... একদিন বেশি ঘা নিয়েই চলিয়া গেলাম। সেখানে যাইয়া মাকে প্রণাম করিলাম না, পাছে প্রণাম করিলে পায়ের ধুলা লইবার সময় মা ধরিয়া ফেলেন। এই চিন্তায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় দেখি একটি বিধবা মেয়ে মাকে প্রণাম করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া পায়ের ধুলা লইলেন ইহা দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইল। আমিও মাকে প্রণাম করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া পায়ের ধুলা লইলাম।

"প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে মা অতি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ' বৌমা, হাতে কাপড় জড়িয়ে ধুলা নিলে কেন? তোমার হাতে কী অসুখ আছে? ...হাত দেখিয়া এমনভাবে দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। বলিলেন, 'আহা! বাছা, তুমি এতদিন এখানে আছ, আর তোমার হাতে এরূপ ব্যধি! আমি তোমাদের মা, আমি জানি না। বাছা আমার এত কষ্ট হচ্ছে! কতদিন ধরে এই রোগ হয়েছে এবং কী করে হল, জিজ্ঞাসা করায় আমি সব কথা বলিলাম। মা বলিলেন, 'বাছা আমি এখন এমনই হয়েছি, আমাতেই আমি ডুবে থাকি। তোমাদের দিকে বড় তাকাই না। এই হাত দিয়ে ঠাকুরপুজো কর, এতেই রোগ ধরে রয়েছে। যাক আমার সঙ্গে এস। ঠাকুর পুজোর নির্মাল্য ও চরণামৃত—গঙ্গায় ফেলবার জন্য এখনই নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি এসো।'

"মায়ের সঙ্গে অন্য ঘরে গেলাম। মা বলিলেন, 'ঐ দেখ কমণ্ডলুতে ঐসব রয়েছে; সবটা হাত এতে ডুবিয়ে দাও।' তাহাই করিলাম। বললেন, আর হাতে অসুখ থাকবে না। তবে মাছ মাংস রসুন পেঁয়াজে হাত না দিয়ে যত দূর পারো থেকো। ...তবেই সেরে যাবে। যেদিন পেঁপে কেটেছিলে সেদিন কী খেউরি (নখ কেটেছিলে) করেছিলে? বলিলাম, 'মনে নেই।' মা বলিলেন, 'খেউরিও করেছিলে এবং পেঁপের কষও লেগেছে। দুটোতে মিলেই ঐসব হয়েছে।' বিকেলবেলা অন্যান্য মেয়েদের কাছে বলিলেন, 'ওগো, তোমাদের সকলকেই বলছি, তোমাদের স্বামী, পুত্র এবং তোমরা নিজেরাও নাপিতের নরুন দিয়ে নখ কেটো না। এত অনেক খারাপ রোগ হতে পারে। এই তো বৌমার হাতে এরূপ হয়েছে-অবশ্য ঠাকুরের ইচ্ছায় এ থাকবে না।"

হাতের অসুখের জন্য দৈবী ওষুধ তাতেই সুস্থ হওয়ার আশ্বাস কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তববুদ্ধির প্রয়োগ, নাপিতের নরুনে কেউ নখ কেটো না। বহু লোকের জন্য ব্যবহৃত বস্তু ব্যবহার করলে রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এই বাস্তব সাবধানবাণী উচ্চারণ করে মা 'একসঙ্গে বসে খাওয়া, এক বিছানায় দুজন শোয়া, একজনের কাপড় গামছা অপরের ব্যবহার করার কত দোষ, কীভাবে একজনের দেহের ভালো বা মন্দ অন্যের দেহের যায়' এইসব বলেছিলেন। সাধারণের জন্য সাধারণ জ্ঞানের উপদেশ, শ্রীমার কাছে এ আশ্চর্যজনক বই কী! তৎকালের লোকাচার কবলিত সমাজে মা এনেছিলেন যুক্তির হাওয়া, তৈরি করেছিলেন আত্মমুক্তির প্রেক্ষাপট।

আটত্রিশ

ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক সমন্বয়

সঙ্ঘস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন গ্রামবাংলার মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার জন্মমুহূর্তে কেউ কল্পনা করতে পারেনি, বাংলার মাটিকে ধন্য করে বিশ্ববন্দিত হবে এই দুই ব্যক্তিত্ব। যত দিন যাচ্ছে শ্রীমার জীবন মানুষকে ভাবাচ্ছে আরও বেশি করে। কার্ল মার্ক্স-এর ভাষায় বর্তমান যুগ হল 'অ্যালিয়েনেশন' বা 'একাকিত্বে'র যুগ। যুগের আবর্তে মানুষ যত বেশি একাকী হয়ে পড়ছে ততই সে মাতৃত্বের কাছে, মাতৃজীবনের কাছে নিরাপত্তা চাইছে। কারণ, পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু যে 'মা'। শ্রীমা চিরাচরিত পারিবারিক কাঠামো থেকে দূরে ছিলেন। আবার একদিকে তিনি পরিবারের মধ্যে বড় বেশি সম্পৃক্ত হয়ে ছিলেন। পরিবারের অঙ্গনেই জয়রামবাটীর দলঘাস-কাটা মেয়েটি হয়ে উঠেছিলেন জগজ্জননী। গৃহকে তিনি আশ্রমে পরিণত করেছিলেন, আবার বিশ্বকেও একটি গৃহে পরিণত করেছিলেন। তিনি গৃহবাসী ছিলেন, গৃহী ছিলেন না। তাই তাঁর পারিবারিক আদর্শ আজকের সমাজে বিরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, "ওরে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর্।"[১]—শ্রীমায়ের জীবন যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখব সত্যিই তিনি অদ্বৈতজ্ঞানকে আঁচলে বেঁধে তার প্রায়োগিক রূপ কেমন হয় তা দেখিয়েছেন। কার্ল মার্ক্স তাঁর 'Das Capital'-এ বলেছিলেন জগতে বহু দার্শনিকই সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে গিয়েছেন, প্রশ্ন হল তাকে বদলাবার। মার্ক্স সাম্যচিন্তাকে সমাজে প্রয়োগ করার জন্য 'প্রাক্সিস' তত্ত্বের কথা বলেছিলেন। শ্রীমাকে দেখি নীরবে ব্যবহারিক বেদান্তকে কর্মে পরিণত করেছেন—এদিক দিয়ে তাঁর জীবন এক বিস্ময়।

শ্রীমায়ের পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রমণি ছিলেন রাধারানি। মায়ের ভাইঝি রাধারানির জন্ম ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। স্বামী বিবেকানন্দ চলে গিয়েছেন ১৯০২-এ। সুতরাং রাধারানিকে নিয়ে মায়ের এই বিচিত্র লীলাখেলায় নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অনুপস্থিত। এইসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার বেলুড় মঠের ভিত্তি স্থাপনের পরেই সৃষ্টি হয়েছিল এই বিরল লীলাখেলা। একদিকে চরম সম্পৃক্ততা, অপরদিকে চরম নিস্পৃহতার একত্র সমাবেশ। ভক্তকুল বাইরে থেকে দেখছে মা 'রাধু, রাধু' করে সর্বদা ব্যস্ত। মায়ের উদ্বেগ কমানোর জন্য কোনো ভক্ত তাঁকে সাংসারিক পরামর্শ দিয়েছেন—মাস্টারমশাই (শ্রীম)-এর স্কুলে ভালো ভালো ছেলেরা পড়ে। মাস্টারমশাইকে বলে তাদের মধ্যে থেকে রাধুর জন্য পাত্র ঠিক করা যায়।—ভক্তের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে বৈরাগ্যের দীপ্তি "আপনা থেকে জোটে তো জুটুক—আমি কখনো কাউকে বন্ধনে ফেলবার জন্য বলতে পারব না।"[২] শহরের উচ্চবিত্ত শত ভক্ত থাকা সত্ত্বেও গ্রাম্য পরিমণ্ডলের মধ্যেই রাধারানির বিবাহ দিয়েছিলেন—এর মধ্যে তাঁর সাংসারিক দূরদর্শিতা ও নিস্পৃহতা যেন একসঙ্গে ফুটে ওঠে। একদিকে তিনি ভক্তদের অভয়দাত্রী,

অপরদিকে তিনি রাধুর জন্য বিষম চিন্তিত। পাগলের কন্যা অর্ধপাগল, যে যা বলছে রাধুর মঙ্গলের জন্য মা তাই করছেন। তেরলের খ্যাপাকালীর বালা, মাথায় বরফ, চণ্ড নামানো—কোনো গ্রাম্যরীতিই বাদ থাকছে না। অবশেষে একদিন কোয়ালপাড়ার জগদ্ধাত্রী আশ্রমের দাওয়ায় বসে একটি হলুদমণি পাখিকে জিজ্ঞাসা করছেন, ও পাখি বল তো, রাধুর খোকা হবে না খুকি হবে? পাখি যেন ডেকে ওঠে, খোকা হবে, খোকা হবে—মা সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত হয়ে বলে ওঠেন, ও বরদা শুনেছ, পাখি বলছে খোকা হবে, তাহলে নিশ্চয়ই রাধুর খোকা হবে। আবার সেই বালিকামূর্তি মুহূর্তে জ্ঞানদায়িনী জননীর মূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে—ওই কালেই মা হয়তো কোনো ভক্তকে দীক্ষা দিয়ে স্বচ্ছন্দে তাঁকে ইষ্টদর্শন করাচ্ছেন।

নহবতের সেই ছোট্টো কুঠুরিতে তপস্বীর জীবনযাপন করে অথবা জয়রামবাটীর গ্রামীণ পরিবেশে থেকে মা এমন বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করলেন কী করে? সমাজ-দেশ-কাল কোনোটিই তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা থেকে বাদ যায়নি। কোয়ালপাড়ার আশ্রম-প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রত্যক্ষ আশ্রম পরিচালনার সাক্ষ্য বহন করে। আবার পরোক্ষে পরিচালনা করেছেন সমগ্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে। যুগ পরিবর্তন যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনছিল—সেই অর্থনৈতিক পরিবর্তনও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ব্রিটিশ শাসনের সুফল-কুফল সবকিছুই তিনি অবহিত ছিলেন। যুগের সমস্যাগুলিকে ঘিরে তাঁর নিজস্ব ধারণার মধ্যে ছিল চিন্তার স্বচ্ছতা এবং আধুনিক মানসিকতা। তাঁর এই আধুনিকতা একদিকে প্রাচীন ভারত ও নবীন ভারতকে সংযুক্ত করেছে। অপরদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছে। এই সমন্বিত আদর্শই হল নারীর ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের সঠিক পথ।

শ্রীমায়ের যুগ পরিবার-ভাঙনের যুগ। নগরায়ণের সূচনা হচ্ছে। এইসময় তিনি পরিবারের বিরল আদর্শ দেখালেন। কারণ, তিনি জানতেন, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সংকট কেটে গেলে এই পারিবারিক আদর্শের নতুন রূপ প্রয়োজন হবে। সেখানে নারীর ভূমিকা প্রধান। শ্রীমায়ের পারিবারিক জীবনের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার আলোচনায়। তিনি দেখিয়েছেন, নারীর সহজ-সরল জীবন পরিবারের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে। শ্রীমা সেই সহজ অথচ গভীর জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে একটি মাত্র চিরুনি। তাও আবার ভাঙা। কোনো আত্মীয়া ভক্তদের কাছ থেকে একটা চিরুনি চাওয়ার কথা বললে শ্রীমা তাঁকে উত্তর করলেন, "কাজ তো চলে যাচ্ছে।"[৩] সংযত জীবনের প্রতি তিনি সমুচ্চ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কথায় সরযূবালা দেবী এমনই একদিনের স্মৃতি তুলে ধরেছেন। এক সন্ন্যাসী সন্তানকে দেখিয়ে শ্রীমা উপস্থিত মহিলাদের বলেছিলেন, "এই দেখো একটি ত্যাগী ছেলে, ঠাকুরের নাম নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সংসারী লোক খালি গন্ডায় গন্ডায় ছেলের জন্ম দিতে থাকে, ঐ যেন কাজ। ঠাকুর বলতেন, 'দু-একটি ছেলে হওয়ার পর সংযত থাকতে।' ইংরেজরা নাকি বিষয় বুঝে ছেলের জন্ম দেয়—যে এই (সম্পত্তি) আছে, এতে একটি ছেলে হলে বেশ চলবে এবং তাই হবার পর স্ত্রী-পুরুষ দুজনে বেশ আলাদা আপন আপন কাজ নিয়ে থাকে। আর আমাদের জাতের?"

মা হাসতে হাসতে বলছেন, "কাল একটি বউ এসেছিল, মা। গ্যাঁড়া, গোঁড়া ছোট্টটি, তার কোলে পিঠে ছেলে, ভালো করে সামলে নিতেও পারছে না। তারপর বলে কী, 'মা, সংসার

ভালো লাগে না।' আমি বলি, 'সে কী গো, তোমার এই সব কাচ্চাবাচ্চা!' তাতে বললে, 'ঐ পর্যন্তই, আর হবে না।' বললুম, 'তা পারো যদি ভালোই তো গো।' এই বলে হাসতে লাগলেন।"[৪]

আমরা ভৈরবীর মতো সাধিকা দেখেছি, রানি রাসমণির মতো গৃহী-ভক্ত দেখেছি, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের মতো একাধারে দুটি দেখিনি। একটি পরিবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সদস্যদের পারস্পরিক ব্যবহার, তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ও আধ্যাত্মিক আদর্শে। সদস্যদের পারস্পরিক ব্যবহারে শ্রীমা অনন্যা হয়ে উঠতেন। মুহূর্তে তিনি সাধারণ আলোচনাকে আধ্যাত্মিক আলোচনায় পরিণত করতেন। "শ্রীমা শেষবারে জয়রামবাটীতে আছেন। মনসা নামক এক যুবক তাঁহার নিকট গৈরিক বস্ত্র পাইয়া সন্ধ্যার সময় খুব আনন্দিত মনে কালীমামার বৈঠকখানায় বসিয়া শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেছেন। মাতাঠাকুরানীর উহা খুব ভালো লাগিল। তাঁহার কাছে বসিয়া রাধু, মাকু প্রভৃতি এবং মামিদের দুই-একজনও গান শুনিতেছিলেন। মামিদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'ঠাকুরঝি ঐ ছেলেটিকে সাধু করে দিলেন।' মাকুও তাহাতে যোগ দিয়া বলিল, 'ঐ ছেলের বাপ-মা কত আশা করে তাকে মানুষ করেছিলেন, এখন সেসব চুরমার হয়ে গেল। বিয়ে করাও তো একটা সংসারধর্ম! পিসিমা এভাবে সাধু করতে থাকলে মহামায়া তাঁর উপর চটে যাবেন। সাধু যারা হতে চায়, নিজেই হোক, পিসিমার ঐজন্য নিমিত্ত হতে যাওয়া কেন?' সব শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন, 'মাকু, ওরা সব দেবশিশু। সংসারে ফুলের মতো পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের কী আছে বল দেখি? সংসারে যে কী সুখ তা তো দেখছিস। তোদের সংসারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে গেল।' "[৫]

আর একদিন দুপুরের কথা। মহিলা মজলিশে শ্রীমা নীরব শ্রোতা। মজলিশের আলোচনার বিষয়, অপবাদের মধ্যে কোনো অপবাদ ভালো। নলিনীদি বহুক্ষণ আলোচনার পর শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা পিসিমা, বলো তো অপবাদের মধ্যে কোন্ অপবাদ ভালো?" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "তবে ধনের অপবাদই ভালো। কোনো লোককে যদি বলা যায়, উনি বেশ ধনী লোক, সে উহা শুনে প্রথমটায় মুখে দীনতা বা অসন্তোষ যাই দেখাক না কেন, তার অন্তরটি বেশ খুশি হয়।"—শ্রীমায়ের এই সিদ্ধান্তে সকলেই খুব খুশি। এরপর মা সকলের সামনেই নলিনীদিকে প্রশ্ন করলেন, " '....আচ্ছা, তোরা এখন বল দেখি নলিনী, কোন জিনিসটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়?' তখন নলিনীদি বলিতেছেন, 'কেন পিসিমা, মানুষ যাতে সুখে থাকতে পারে, আর এই জ্ঞান, ভক্তি—এইসব প্রার্থনা করতে হয়।' শ্রীশ্রীমা ধীরে ধীরে বলিতেছেন, 'নলিনী, সে তো হলো, কিন্তু এক কথায় বল্‌তে গেলে তার কাছে অন্তর থেকে "নির্বাসনা" প্রার্থনা করতে হয়।' "[৬] একান্ত নিস্পৃহ মনের স্বচ্ছন্দ উচ্চারণ, স্বাভাবিক প্রকাশ।

ত্যাগকে বা কোনোরকম উপদেশকে কোনো মানুষের উপর চাপিয়ে দিতেন না শ্রীমা। মানবিকতা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। কত অশান্তির নিষ্পত্তি তিনি দরদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে করেছেন তার সীমা নেই! জনৈকা স্ত্রীভক্ত তার পুত্রবধূর উপর সংযম আরোপ করতে চান। কারণ পুত্রটি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। একদিন এই স্ত্রীভক্তের প্রসঙ্গ উঠলে শ্রীমা বললেন, "বউয়ের উপর তার অতিরিক্ত শাসন। অত কি ভালো? পেছনে থেকে সামনে একটু আলগা দিতে হয়। আহা! ছেলেমানুষ বউ, তার একটু পরতে খেতে ইচ্ছে হয় না? অমন করে সে যে বলে, যদি আত্মহত্যাই করলে বা কোনদিকে বেরিয়েই গেল—তখন কী হবে?

"একটু আলতা পরেছে, তা আর কী হয়েছে। আহা! ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো চোখে দেখেছি, সেবাযত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন কাছে যেতে পেরেছি, যখন বলেননি এমনকী দুমাস পর্যন্ত নবত থেকে নামিইনি। দূর থেকে দেখে পেন্নাম করেছি।"[৭]—এক নারীর প্রতি অসাধারণ সহমর্মিতা!

ঠিক এইরকমভাবেই তরুণ সন্ন্যাসীকে মাতৃসেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন শ্রীমা। তিনি বলছেন, "মা'র সেবা করা সকলের উচিত, বিশেষ যখন তোমরা সকলের সেবা করবার জন্য এখানে এসেছ। তোমার বাপ যদি টাকা না রেখে যেতেন তাহলে তোমাকে টাকা রোজগার করে মা'র সেবা করতে বলতুম।

"মা'র পথের সঞ্চয় করবার সাহায্য করতে পারো তবেই তো ঠিক ছেলের কাজ করলে। তার বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হয়েছ, কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেছেন! তার সেবা করা তোমার সবচেয়ে বড় ধর্ম জানবে।... কিন্তু সাবধান, মা'র সেবা করছি ভেবে বিষয় নিয়ে মেতো না, একটা বিধবার খাওয়া-পরা বই তো না! কত টাকাই বা চাই! কিছু লোকসান দিয়েও যদি তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত হয়, তার চেষ্টা করবে। ঠাকুর তো টাকা ছুঁতেই পারতেন না। তোমরা তার নামে বেরিয়েছ, সবসময় তাঁর কথা ভাববে। জগতে যত অনর্থের মূল—টাকা। তোমাদের কাঁচা বয়স, হাতে টাকা থাকলেই মন লোভ দেখাবে। সাবধান!"[৮]—সংসারে থেকে চরিত্রের ভারসাম্য আমরা রক্ষা করতে পারি না। এই ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা যদি পেতে হয়, তবে শ্রীমার জীবনের দিকে আমাদের তাকাতেই হবে!

পরিবারের কর্তব্য ও পরিবারের আদর্শ কী হওয়া উচিত—এ-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। গীতার মধ্যে, মহাভারতের শান্তিপর্বে এই আলোচনা সবিস্তারে করা হয়েছে। প্রাচীনকালে চারটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম যেমন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ঠিক তেমনিভাবেই আদর্শের দিক দিয়ে সন্ন্যাস আশ্রমের মহিমাও কীর্তিত হয়েছে। কোন আশ্রম বড়ো—গৃহস্থাশ্রম না সন্ন্যাসাশ্রম—এ-বিতর্কের নিষ্পত্তি মা করেছেন তার অসাধারণ মাতৃত্ব দিয়ে। 'মাতৃত্ব' শব্দটির সঠিক অর্থ হল বিস্তার; স্বার্থপূর্ণ আবর্তকে ভেঙে দিয়ে বৃহতের সঙ্গে মিশে যাওয়া। নিজের ক্ষুদ্রতাকে কী সুন্দর স্বাভাবিকভাবে বর্জন করেছিলেন মা। সরযূবালা দেবী তাঁর স্মৃতিকথাতে শ্রীমায়ের আত্মবিলয়ের একটি খণ্ডচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, ৩ আশ্বিন, ১৩২৫-এর দিনলিপিতে। নলিনীদি ও শ্রীমায়ের মধ্যে কথোপকথন ছিল এইরকম

"নলিনী—পিসিমা, লোকের কত ধ্যানজপ হয়, দর্শন-স্পর্শন হয় শুনি, আমার কিছু হয় না কেন? তোমার সঙ্গে এতদিন যে রইলুম, কই আমার কী হলো?

মা—ওদের হবে না কেন? খুব হবে। ওদের কত ভক্তি বিশ্বাস! বিশ্বাস ভক্তি চাই, তবে হয়। তোদের কি তা আছে?

নলিনী—আচ্ছা, পিসিমা, লোকে যে তোমাকে অন্তর্যামী বলে, সত্যিই কি তুমি অন্তর্যামী? আচ্ছা, আমার মনে কী আছে তুমি বলতে পার?

মা একটু হাসলেন। নলিনী আবার শক্ত করে ধরলেন। তখন মা বললেন, 'ওরা বলে ভক্তিতে।' তারপর বললেন, 'আমি কী, মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—

(হাতজোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন) আমার "আমিত্ব" যেন না আসে।' "[৯] বাস্তবিকই দেবতুল্য স্বামীর জীবনে তিনি ছিলেন এক অনুচ্চারিত মাধুর্যস্বরূপ। তাঁর অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ছিল না। ছিল না লেশমাত্র অধিকারবোধ। তাঁর জীবন নীরবতায় ভরা। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন কারও বোঝার উপায় ছিল না, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনো সম্পর্ক রয়েছে। সর্বদাই অন্য ভক্তনারীদের সঙ্গে তিনি নিজেকে মিশিয়ে রাখতেন। কিন্তু ত্যাগ, তপস্যা এবং অসাধারণ চরিত্র মহিমায় তিনি সকলকে ছাড়িয়ে যেতেন। হয়ে উঠতেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই এক অভিন্ন সত্তা!

শ্রীমায়ের জীবন ও ভাবনা একটি বৃক্ষের মতো। যার মূল প্রোথিত রয়েছে মাতৃত্বরূপ বীজে আর ডালপালায় ছড়িয়ে আছে সংসার থেকে সংসারের ঊর্ধ্বে যাওয়ার পথরেখা। আমরা মুণ্ডকোপনিষদের দুটি পাখির উপমা স্মরণ করতে পারি। যে পাখি স্থির, শান্ত, আত্মমগ্ন, তার দিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন ডালে বিচরণকারী, কটু, তিক্ত ও কখনো মিষ্ট ফল আহরণকারী পাখিটি এক ডাল থেকে আর এক ডালে, এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তরণ করে। সংসাররূপ ডালে মা সেই আত্মমগ্ন স্থির ধ্রুবতারার মতো আদর্শস্থানীয়া। সংসারের জটিল আবর্তে আমরা যদি তার মহাবাণীরূপ ডালগুলিকে অবলম্বন করি তবে আমরা এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তরণ করে সেই ডালে গিয়ে পৌঁছাব যেখান থেকে অসীম আকাশে বিচরণ করা যায়।

সংসারের সবরকম রূপচ্ছবির মধ্যে আমরা মাকে ফেলতে পারি। কেউ যদি বলে, 'মা, আমার সংসারে এত কষ্ট,' সঙ্গে সঙ্গে মাতৃজীবনরূপ মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠা উলটালেই পেয়ে যাব ঠিক সেইরকমই ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাব অগ্নিশুদ্ধা সীতার মতোই সংসারের অগ্নিকুণ্ডে নির্লিপ্ত, নির্মোহ, নিষ্কলুষ এক মুখ। যিনি বলবেন—আমার জীবন দেখো, জলে ভাসা নৌকার মতো, পদ্মপাতার জলবিন্দুর মতোই নিস্পৃহ, উদাসীন। সেই শান্ত মুখচ্ছবি, কেবল শান্তি দেবে না, সঙ্গে সঙ্গে ভরসা দেবে, দেবে মহা আশ্বাস, "বাবা, তারাও (বিলাতের লোক) তো আমার ছেলে।..."[১০] তিনি পরিবারের সকলের মা, আবার বিশ্বমাতাও বটে—"...মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন।..."[১১] তা তো বটেই, বিস্তারই তো জীবন, মাতৃসুধা-সাগরের তীরে বসে আমরা পান করে চলেছি গরল। কারণ, সংসারে থেকে সংসার-উত্তীর্ণ হওয়ার রূপ আমাদের জানা নেই।

পরিবারকে অমৃতালয় করে তুলেছিলেন তিনি, যে পরিবার সকলেই পেয়েছে অমৃতের স্বাদ। স্বামী সারদেশানন্দ স্মৃতিকথায় বলেছেন, "মনে পড়ে (জয়রামবাটীতে) সেই সুমধুর আহ্বান, 'বাবা! বেলা হয়েছে, জল খাবে এসো!' সেই ডাক এখনও যেন কানে বাজে, প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় 'পাখী হয়ে উড়ে যাই' সেখানে সেই বারান্দা, যেখানে আসন বিছাইয়া জলের গ্লাস ও কাঁসিতে গুড়-মুড়ি—পাতায় প্রসাদী ফল-মিষ্টি রাখিয়া দরজার দিকে মা চাহিয়া আছেন সস্নেহ নয়নে, ব্যগ্র হইয়া 'বৎসের প্রতীক্ষায় গাভীর ন্যায়।' কিন্তু হায়, আর তো সে ভাগ্য হইবে না, সারা সৃষ্টি খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে না সেই মাতৃস্নেহ!"

"রাত্রে মায়ের বাড়িতে খাওয়া—রুটি-তরকারি, গুড়, একটু দুধ। রুটি অতি চমৎকার হয়। মা আটা মাখেন স্বহস্তে, অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া টিপিয়া টিপিয়া—অতি মোলায়েম

করিয়া। সন্ধ্যার পর ঠাকুরকে ভোগ দিয়া সেই খাবার ভালোভাবে ঢাকা দিয়া কাছে লইয়া বসিয়া থাকেন, যাহাতে না ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ছেলেরা একটু রাত হইলে খাইবে—সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরকে ডাকিবে, তাহার স্মরণ করিবে; আবার একটু রাত্রি না হইলে ক্ষুধা পায় না, পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে না; তাই মা প্রতীক্ষা করিতেছেন।... মিট্ মিট্ প্রদীপটি জ্বলিতেছে। ঠাকুরকে ধূপ দিয়া প্রণাম করিয়া, আলো কমাইয়া দিয়া মা পা মেলিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কোথায় কোন্ রাজ্যে তাঁহার মন বিচরণ করিতেছে, তিনিই জানেন। সব নিস্তব্ধ।"[১২]

এক শ্রাবণের ঘনঘটায় শ্রীমার স্থূলদেহের দীপ নির্বাপিত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছিল একটি আশার বাণী, "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"[১৩]

ষোড়শী পূজার মাধ্যমে এই মাতৃস্বরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। যে মাতৃত্বে আবাহন আছে, বিসর্জন নেই। অতি সাধারণ বাহ্যিক রূপের অন্তরালে তাঁর অসাধারণ চরিত্র মাধুর্য ধীরে ধীরে জনমানসে ছড়িয়ে পড়ছে। ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমায়ের জীবন কাব্যময় ভাষায় তুলে ধরে বলেছিলেন এ যেন এক নীরব প্রার্থনা—যে প্রার্থনা সন্তানদের জন্য, আমাদের সকলের জন্য।

উনচল্লিশ

শ্রীমা সন্তোষের স্থির প্রতিমা

ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারতে যেসব বিরল দৃশ্য অঙ্কিত আছে তারমধ্যে শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্মের উপদেশ অন্যতম। পিতামহ কুরুকুলমণি যুধিষ্ঠিরকে তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন। শোনাচ্ছেন রাজধর্মের কথা, মানবধর্মের কথা, শোনাচ্ছেন ভারতের চিরন্তন আত্মার সংগীত। কী এক বিচিত্র দৃশ্য। যন্ত্রণায় কাতর শরশয্যায় শুয়ে তত্ত্ব আলোচনা! এ ছবি কেবল ভারতবর্ষের কবিই বর্ণনা করতে পারে। আর ভীষণ যুদ্ধের মধ্যেও স্থির হয়ে শুনছেন যিনি, তিনি যুধিষ্ঠির। যুদ্ধে স্থির তিনি, তাই যুধিষ্ঠির। তার নামের মধ্যেই চরিত্রের মহিমা ঝংকৃত হয়েছে। মূল সুর এক জীবনের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যে ধীর স্থির থাকা। এই বিরল চরিত্রই মানব সভ্যতার ভিত্তিভূমি। পিতামহ ভীষ্ম আর যুধিষ্ঠির।

শান্তিপর্বেরই এক অংশ, পিতামহ বলে চলেন জ্ঞানী মানুষ কী রকম? তিনি বলেন—

উপদ্রবাংস্তথা রোগাণ্ হিতজীর্ণমিতাশনাৎ।
লোভংমোহঞ্চ সন্তোযাদ্বিষয়াংস্তত্ত্বদর্শনাৎ॥' ৮৬২/৮

জ্ঞানী মানুষ হিতজনক, পরিপাকযোগ্য ও পরিমিতি আহার দ্বারা দৈহিক উপদ্রব ও রোগ দূর করবেন। সন্তোষ দ্বারা লোভ ও মোহ ত্যাগ করবেন এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পুত্রকলত্রাদির চিন্তা বর্জন করিবেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের থেকে আমাদের দৃষ্টিকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে নিয়ে আসি। কবির কল্পনা নয়, জলজ্যান্ত ইতিহাস! তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যে কী করে স্থির ধ্রুবতারা মতো আত্মার মহিমাকে উজ্জ্বল রাখা যায় তার এক নিদর্শন। আমরা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কথা বলছি। আধ্যাত্মিক সূর্য শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নীরূপেই তার পরিচিতি সর্বাধিক হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর নারী সমাজের মধ্যমণি তিনি। বহুকাল পরে, বহু সাধকের সাধনার ধনরূপে, বহু নারীর নীরব ক্রন্দনের উত্তর রূপে ভারতবর্ষ ধারণ করেছেন এই নারী চরিত্রকে। এ শুধু আবির্ভাব নয় এ এক বিস্ময়! যার সঠিক রূপ এখনও লোকগোচরে আসেনি। তার স্থিরতার এক সার্থক ছবি এঁকেছেন তারই এক সন্ন্যাসী সন্তান! তিনি বলছেন, "একটি দিনের চোখে দেখা ঘটনা মনে পড়ে। ১৯১৯ সাল জয়রামবাটীতে রয়েছেন, জ্বর হয়েছে। রাধুর ছেলে চিৎকার করে কাঁদছে—রাধুর পাগলি মা উনুন থেকে একটি লম্বা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে শ্রীশ্রীমাকে মারতে আসছেন। গ্রামের কয়েকজন বুড়ি নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করে মায়ের কাছে এসে আপসের পরামর্শ চাইছে—রাধু তাইতে খুব রেগে চড়া গলায় মাকে তীব্র গালাগালি দিচ্ছে আর বলছে 'তুমিই এদের প্রশ্রয় দিচ্ছ।' মা কিন্তু শান্ত। রাধুকে শুধু বলছেন 'মিষ্টি কথা বল, মিষ্টি কথা বল।'

এই স্থির প্রতিমা কেবল জীবন যুদ্ধে স্থির ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্ঞানদায়িনী। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।' তাঁর কথা মিথ্যা হয়নি। তাই আমরা দেখি সাধারণ গৃহবধূ হয়ে, অবগুণ্ঠনে গুণ্ঠিতা হয়েও মা জ্ঞানদায়িনী। সংসারের খোলায় দগ্ধ সন্তানকে শোনাচ্ছেন সেই মহাভারতের বাণী, নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজের মাধুর্যময় কাব্যে, 'বাবা, সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই।' সুস্থ সবল মনের গঠনের জন্য চাই 'সন্তোষ' নামে এক মানসিক অবস্থান। যে অবস্থান আমাদের লোভ এবং মোহ দূর করবে। যে অবস্থান পারস্পরিক সহাবস্থানের প্রেরণা প্রদান করবে।

দ্বন্দ্বের মধ্যে স্থির থাকার এক আশ্চর্য জীবন কৌশল শিখিয়েছেন মা। আজ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নেই। কিন্তু মানুষের অন্তর তাতে সংগ্রামমুক্ত হয়নি। মানুষের মনের মধ্যেই চলছে তীব্র দ্বন্দ্ব, তীব্র সংগ্রাম। যার প্রকাশ ঘটছে নানা মানসিক রোগের মধ্যে দিয়ে। শ্রীমায়ের ভাষায় আমাদের সব কিছুই 'মুখস্থ' কোনো কিছুই 'অন্তস্থ' নয়। অর্থাৎ মনের মধ্যে সাম্যতা আসেনি। আসেনি ধীরতা।

সন্তোষ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন শ্রীমা। তার ব্যাপ্তি ব্যক্তি চরিত্র গঠন থেকে সমাজ গঠন পর্যন্ত। সন্তোষ কোনো মানবীয় গুণ নয়, এটি একটি মনের অবস্থান। সহ্য হল মানুষের চারিত্রিক গুণ। এ প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের স্পষ্ট কথা সহ্যের সমান গুণ নেই। অর্থাৎ মানব চরিত্রের সহ্য করার গুণটি সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। কেন? না এই সহ্যের মাধ্যমে আমরা একটি মানবীয় অবস্থাকে লাভ করতে পারি। এই অবস্থান হল সন্তোষ। মায়ের জীবনের দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখব অশান্তির নানা উপকরণ বা সব কটি উপকরণই মজুত ছিল। কিন্তু মায়ের মনের শান্তিকে তা বিনষ্ট করতে পারেনি। জীবনের নেতিবাচক দিকটিকে ক্রমাগত অতিক্রম করে গেছেন তিনি কেবল ইতিবাচক দিকটির দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। সেই কারণেই তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছে গঠনমূলক ভাবনায় সমৃদ্ধ। তাঁর প্রার্থনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রার্থনা হল অদোষদর্শিতা। শ্রীমা এক ভক্তকে বলছেন, 'আমারও আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে, 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারিনে,' বলে কত প্রার্থনা করে তবে দোষ দেখাটা গেছে। বৃন্দাবনে যখন থাকতুম, বাঁকেবিহারীকে দর্শন করে বলতুম, 'তোমার রূপটি দেখতে বাঁকা, মনটি সোজা। আমার মনের বাঁকটি সোজা করে দাও।' (মাতৃ সান্নিধ্যে, স্বামী ঈশানানন্দ, পৃ. ১১০) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর থাকলেও তাঁর ভাগনে হৃদয়ের ব্যবহার শ্রীমায়ের প্রতি ভালো ছিল না। পরবর্তীকালে সেসব কথার উচ্চারণও মা পছন্দ করতেন না কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে তিনি প্রেমপূর্ণা ছিলেন। তৃপ্ত ছিলেন। তাই নহবতের বনবাস তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে শিক্ষার অঙ্গন। দরমার বেড়ার ফুটো দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন পরম প্রিয় স্বামীর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য। মানুষের কাছে সন্তোষের বিরল প্রতিমা হয়ে তিনি বিরাজিতা।

ব্যক্তিজীবনে পার্থক্য নিরূপিত হয় প্রাপ্তি দিয়ে নয়, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা দিয়ে। সন্তোষ ব্যক্তি জীবনকে শান্তির মতো দুর্লভ বস্তু দান করে, যা লাভ করা আমাদের সকলেরই লক্ষ্য।

চল্লিশ

সর্বজনীন আদর্শ ও শ্রীমা

মায়ের জীবনের বিস্তারের ভঙ্গিমায় বারংবার তাঁর মাতৃত্ব, তাঁর লজ্জাপটাবৃতারূপটি ফুটে উঠেছে। তিনি কখনো যুগজননী কখনো বিশ্বজননীরূপে বন্দিতা হয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে সর্বজনীন আবেদনটি বোধহয় ততখানি প্রকাশের উদ্যোগ করা হয়নি। শ্রীমা যদি শ্রীরামকৃষ্ণ আচরিত এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত আদর্শের বাস্তবায়িত রূপ হন তবে তাঁর জীবনের মধ্যে সেই আবেদন অপরিহার্য যে আবেদনকে আমরা সর্বজনীন আবেদনরূপে চিহ্নিত করি। সর্বজনীন, অর্থাৎ যা স্থান, কাল, পাত্র ভেদে অম্লান ধ্রুব সত্যরূপে বিরাজিত। যে আদর্শের গভীরতা ও বিস্তার সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহাবস্থান বৈজ্ঞানিক ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বর্ণনায় তাঁকে অনেক মনীষী 'ইউনিভার্সাল গসপেল' বা 'ফেনমেনন' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। শ্রীমায়ের জীবনকেও আমরা সমভাবে ইউনিভার্সাল গসপেল রূপে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর জীবনও পৃথিবীর ইতিহাসে এক 'ফেনমেনন'। নারীর মাতৃরূপে বন্দনা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক পরে সূচনা হয়েছে, মা মেরীর কোলে যিশু ইতিহাসের পরবর্তীকালের সৃষ্টি। এই মাতৃরূপ নিয়ে শ্রীমা বিশ্বের জনমনে কী বার্তা পৌঁছে দিলেন এই আমাদের আলোচনার বিষয়।

শ্রীমায়ের সর্বজনীন আদর্শকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রথমত, তিনি জীবনে যা পালন করে গেছেন তা নারীর সঙ্গে পুরুষেরও আদর্শ স্থান করেছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর আদর্শের মধ্যে এমন এক সময়োচিত আবেদন রয়েছে, সমস্ত পরিবেশে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। তৃতীয়ত, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে যা আজ সত্যি তা কাল মিথ্যে হয়ে যাবে না। চতুর্থত, যুগের পরিবর্তনকে সমাজবিজ্ঞানীর চোখেই তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে। একদিন মাড়োয়ারি ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জীবন প্রত্যক্ষ করে তাঁর সেবার ইচ্ছায় দশহাজার টাকা দিতে চাইলেন। প্রস্তাব শুনে কামকাঞ্চন ত্যাগী ঠাকুরের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তিনি মন্দিরের দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মা এতদিন পর আমাকে আবার লোভ দেখাতে এলি?' তারপর সেই রহস্যময় পুরুষের মনে পড়ল আরেক নারীর কথা, যাঁকে তিনি মাতৃরূপে পুজা করেছেন, নহবতবাসিনী সেই মা সারদামণির কাছে উপস্থিত হলেন তিনি 'ওগো, এই টাকা দিতে চায়। আমি নিতে পারব না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে। তুমি ওটা নাও না কেন? কী বলো?' শ্রীমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ও টাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না করে থাকতে পারব না; ফলে ওটা তোমারই নেওয়া হবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে

তোমার ত্যাগের জন্য; কাজেই টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।' মায়ের এই কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। (শ্রীমা সারদা দেবী, ৮৩)

এখানে শ্রীমায়ের একটি কথার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। মা বলছেন, 'কিছুতেই নেওয়া হবে না।' নিজেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রদান করছেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, 'লোকে তোমার ত্যাগের জন্যই তোমাকে মান্য করে।' কার্ল মার্ক্স বলেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'ডায়লেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম্'-এ অর্থই পৃথিবীর তাবৎ সমাজব্যবস্থাকে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব সবকিছুর জন্য দায়ী ওই অর্থ। দ্বন্দ্বেই চলছে এই পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই কাঞ্চনকে নিয়েই এক অসাধারণ উদাহরণ স্থাপন করলেন। স্থাপন করলেন ও বাস্তবে দেখালেন, কাঞ্চনের স্পর্শমাত্রে অঙ্গ বিকৃত হত তাঁর। এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দিয়ে তিনি এক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন, অর্থ এ জগতের দ্বন্দ্বের মূল হয়, কারণ সেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে চালিত করে। অন্ধের মতো আমরা অর্থের পিছনে চলি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখালেন অর্থ মানুষের জন্য, মানুষ অর্থের জন্য নয়। মানুষ মনুষ্যত্বের জন্য। অর্থ একটি উপাদান মাত্র তাকে নিয়ন্ত্রণে যে রাখতে পারে সেই মানুষ। শ্রীমা তাকে স্থাপন করলেন আরও নিপুণভাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে তাঁর কথা, তিনি ঠাকুরকে বলছেন, 'লোকে তোমায় ত্যাগের জন্য মান্য করে।' তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ সাধন জীবন বা ঈশ্বর দর্শনের কথা বললেন না। তিনি বললেন চরিত্রের মূল গুণাবলির কথা। মুহুর্মুহু সমাধি, ভাব মুখে থাকা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের পারে, কিন্তু ত্যাগের কথা সকলেই বোঝে। এ পৃথিবীতে প্রত্যেককেই বাঁচতে হয় অপরের প্রতি কিছু ত্যাগ স্বীকার করে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সেই ত্যাগমূর্তি তাই শ্রীমা বিবৃত করলেন তাঁর কথায়। ধর্ম, সাধন পদ্ধতি দেশ কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্নতা লাভ করে। কিন্তু ত্যাগ! তা সমগ্র বিশ্বের মানব মনের একান্ত সম্পদ। সব ধর্মের, সব দেশের অধ্যাত্ম সাধনার মূলভিত্তি স্বরূপ। শ্রীমা সেই বিশ্বজনীন ক্ষেত্রটির উপর আলোক নিক্ষেপ করলেন। প্রদান করলেন বিশ্বজনীন আদর্শ।

এই ঘটনার তাৎপর্য কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় না। আমরা জানি সমাজের অর্থনীতিকে পরিচালনা করেন নারীরা। যেহেতু ঘর সংসারের দিকটি তাঁদের হাতেই থাকে। নারীদের ত্যাগপূর্ণ জীবন সমাজের অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলে গভীরভাবে। বাস্তবে আমরা প্রত্যক্ষই দেখি নারীদের কামনা বাসনা একটি পুরুষকে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনে বাধ্য করছে! কিংবা অধিক পরিশ্রমে তারা তাদের ক্রিয়েটিভ দিকটির মৃত্যু ঘটিয়ে ছাপোষা কেরানিতে, কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। শ্রীমা নারীদের কাছে জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপন করলেন, দেখালেন একটি আদর্শকে কেন্দ্র করে সুস্থ শান্তিপূর্ণ, ভারসাম্যযুক্ত জীবনের জন্য কীভাবে ত্যাগ করতে হয়, কীভাবে স্বামীর ত্যাগকে ত্যাগব্রতকে মহিমা গাথায় রূপান্তরিত করতে হয়। পরিবার গঠিত হয় স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতায়। শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণের কথা শ্রীমাকে নাও বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, দেখালেন পরিবারের একত্র বাস সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একত্র হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এই দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের জন্য রেখে গেলেন। শ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পারস্পরিক সম্পর্ককে যখন নিপুণ লেখনীর টানে পাশ্চাত্যের কাছে তুলে ধরছেন নিবেদিতা, তখন তিনি এই লক্ষ্মীনারায়ণ

মাড়োয়ারীর প্রসঙ্গটির উল্লেখ করছেন। কারণ, বিদেশি মানসিকতায় এই ঘটনা গুরুত্বলাভ করেছে, চট করে মনকে স্পর্শ করেছে।

মায়ের সর্বজনীন আদর্শ বর্ণনায় আমরা দ্বিতীয় প্রসঙ্গে যাব। মায়ের জীবনে আমরা ডাকাত আমজাদের কথা সকলেই জানি। মা'র সেই বিখ্যাত উক্তি 'শরৎ যেমন আমার ছেলে আমজাদও তেমন আমার ছেলে'। এই মহাসাম্যভাবের পিছনে সামাজিক কারণও লুকিয়ে ছিল, তা হয়তো এখনও অনুচ্চারিত। আমরা যদি জয়রামবাটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর আলোকপাত করি তবে দেখব, এই অঞ্চল রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। অর্জুন আর পলাশ গাছে প্রকৃতির খেয়ালে রেশম গুটি হত। কারণ জয়রামবাটির বেশ কিছুটা দূরেই জয়পুরের জঙ্গল। ন্যাচারাল ফরেষ্ট। এই জঙ্গলে এখন হরিণ দেখা যায়, মা যখন ছিলেন তখন ভালুকও ছিল। কারণ কোয়ালপাড়ায় গ্রামের দারোয়ান অম্বিকের শাশুড়িকে ভালুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। জয়রামবাটির অবস্থানের মধ্যে বিশেষত্ব আছে। যদিও সেটি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমরা রেশম গুটির কথা বলছিলাম, রেশম গুটির চাষ ও শিল্পতে জয়রামবাটি সংলগ্ন শিরোমণিপুরের মুসলমান বসতি বংশ পরম্পরায় যুক্ত ছিলেন। এই রেশমগুটি ছিল তাঁদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। এই রেশমগুটির চাষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হল ইংরেজরা তার পরিবর্তে নীলচাষ করল, এই অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছাল, জীবনধারণের জন্য চুরি ডাকাতি ভিন্ন আর তাদের কিছু করার ছিল না। শেষে তারা চোর বলে সুখ্যাতি লাভ করল, কেউ তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না। কিন্তু মানসিক নিপীড়নে সকলেই অংশগ্রহণ করল। মা কী করলেন, এদেরকে দিয়ে ঘরামির কাজ করালেন, গ্রামের মাতব্বরদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মা নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। মায়ের নতুন বাড়ির স্থপতি ছিল এরাই, এদের চুরি করে আনা কলা মা অনায়াসে ঠাকুরের প্রসাদের থালায় স্থান করে দিয়েছেন। ওপর থেকে ভাঙনটাকে চোখে পড়ে কিন্তু এর ভিতরে ছিল গড়নের আঁচ, যা মা জানতেন আর জানতেন তাঁরা যাঁরা মায়ের উদার দৃষ্টিতে উপকৃত হয়েছিলেন। মা যখন জয়রামবাটিতে থাকতেন তখন সেখানকার দরিদ্র মানুষ উপকৃত হত। কারণ মায়ের কাছে ভক্ত পরিমণ্ডল আসতেন, মা তাঁদের জন্য তরকারি ও নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এদের কাছ থেকে কিনে নিতেন। উঠোনে গজিয়ে ওঠা তরকারির পরিবর্তে এরা কিছু টাকা পেত। জয়রামবাটির গ্রাম্য অর্থনীতি যেন ঠিক থাকে তার দিকে মায়ের প্রখর দৃষ্টি ছিল। কোনো এক সন্ন্যাসী সন্তান খাঁটি দুধ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যিনি দুধ দেন তাঁকে প্রস্তাব দিলেন, দাম কিছুটা বেশি দেওয়া হবে কিন্তু দুধ যেন খাঁটি হয়। সন্তানের দেওয়া প্রস্তাব শুনে মা বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন দাম বাড়াচ্ছ, ও আরো লাভ করার জন্য দুধে জল মেশাবেই, মাঝখান থেকে দুধ যা নিত্যপ্রয়োজনীয় তার দাম বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের দুধ কিনতে অসুবিধা হবে। মায়ের এই দূরদৃষ্টিকে একমাত্র এক অর্থনীতিবিদই বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। মায়ের এই ব্যবহার ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, যে-কোনো সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আগে আমাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলকে ভালো করে বুঝতে হবে। মায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে যে কেউ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে পারেন।

মায়ের সর্বজনীন আদর্শকে অনুসরণ করে আমরা সাতবেড়িয়ার লালুজেলে বা লালমোহন দাসের প্রসঙ্গে আসব। জয়রামবাটির পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাতবেড়িয়া বা সাতবেড়ে। এখানে জেলে গোষ্ঠীর বসবাস। এদের মধ্যে লালুজেলে একজন। মায়ের বাড়ির পুণ্যিপুকুরে মাছ ধরার প্রয়োজন হলে ডাক পড়ত লালুর, লালু জেলের কাছে শ্রীমা ছিলেন 'পিসিমা'। মাছ ধরার সাথে সাথে লালুর মধ্যে আরেকটি নেশা গড়ে উঠেছিল, সে গ্রামের বাউলদের কাছ থেকে গান শিখে বাউলদল করার চেষ্টা করত। তাঁর গান বাঁধা আর বাউলদল গড়ার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন শ্রীমা। কখনো লালু অভাবের তাড়নায় বাউলের দল ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করত। মায়ের কানে গেলে মা তাকে ডেকে বলতেন, 'ওরে গান ছাড়িস না লালু; এতে যে ঠাকুরের কথা আছে।' লালু খুব সুকণ্ঠের অধিকারী ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে! মায়ের জীবনীগ্রন্থে আমরা পাই একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় লালু তার ভাঙা টিন নিয়ে হাজির! গান শোনাব পিসিমা। সঙ্গে আছে স্টেজ তৈরি করার নানা সরঞ্জাম! মা তা দেখে বললেন, লালু এতকিছুর দরকার কী? তুই দুটো গান গেয়ে চলে যা।' কিন্তু লালু ছাড়বার পাত্র নয়! ভাঙা তোরণ থেকে ছেঁড়া শামিয়ানা বের করতেই কতগুলি আরশোলা লাফিয়ে উঠল। নলিনীদি তাঁর স্বাভাবিক ঝাঁঝে বলে উঠলেন, 'গায়ে আরশোলা ছেড়ে দিতে এসেছিস মুখপোড়া!' লালু নির্ভয়। কয়েকটি গান গেয়ে পিসিমাকে শুনিয়ে তবে সে গেল। তার বাঁধা গান পিসিমা মন দিয়ে শোনেন, এ কথা জানত লালু। কারণ তিনিই ছিলেন লালুর গানের প্রেরণা। নইলে সাধারণ গ্রাম্য জেলে কী লিখতে পারে এই তত্ত্ব কথা? লালু জেলে গান বেঁধেছে,—

ওরে মন জেলে, মিছেই মরিস জাল ফেলে
হাতের দড়ি রইল হাতে জাল গেল অগাধ জলে।
তুই) জাল ফেলতে শিখলি না
তোর ঘটবে যন্ত্রণা।
তুই (জাল) ফেললে ছুঁড়ে জড়িয়ে পড়ে
ছড়িয়ে পড়ে না।

এই লালু জেলে শ্রীমায়ের আরেকটি দিককে উন্মোচিত করেছে। জিবটের রায়দের বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ করতেন সাতবেড়ের জেলেরা। একবার কোনো এক কারণে বাবুদের সঙ্গে জেলেদের মতান্তর হল। বাবুরা বললেন, পুকুরে তোমাদের আর মাছ চাষ করতে দেব না। ভিন গাঁয়ের জেলেদের দিয়ে মাছ চাষ হবে। পুকুরটি জিবটের রায়দের সম্পত্তি হলেও সাতবেড়ে গ্রামের মধ্যে তার অবস্থান! বাবুরা ভয় দেখালেন, কেবল মাছচাষ নয় এবার থেকে খেতচাষ করতেও তাঁরা ভিন্ন গ্রামের চাষিদের নিয়ে আসবে! বাবুদের সিদ্ধান্ত শুনে গরিব জেলের দল ছুটল মায়ের কাছে! মা সব কথা শুনে বললেন, 'সে কেমন কথা! তোমাদের পাড়ার পুকুরে অন্য গাঁয়ের জেলেরা এসে মাছ চাষ করবে? তাছাড়া তোমাদের বাপ-ঠাকুরদা ঐ পুকুরে মাছ চাষ করেছে; এ ভারী অন্যায়! তোমরা মাছ চাষ করবে বই কী? জমিজমা ওরা কাকে দেবে সে ওরা বুঝুক। তবে কোনো অশান্তিতে যেয়ো না। ওদের কাছে গিয়ে বলো। ওরা ঠিক ওদের ভুল বুঝতে পারবে।' পিসিমার কথা মতো জেলের দল জিবটের বাবুদের বাড়ি চলল। সেখানে আর্জি করতেই ফল পাওয়া গেল, বাবুরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার মাছ চাষের জন্য সাতবেড়ের জেলেদের কাজে নিলেন।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, সাতবেড় ও জিবটে জয়রামবাটির পার্শ্ববর্তী গ্রাম। মা থাকতেন জয়রামবাটি, কিন্তু তার প্রভাব বিস্তারিত হয়েছিল কতখানি। নিম্ন শ্রেণির মানুষদের মা একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে চাইতেন। বিচ্ছিন্নভাবে উল্লিখিত এই ঘটনাগুলি তারই পরিচয় বহন করে। শ্রীমায়ের সর্বজনীন আদর্শের বর্ণনায় আমরা তৃতীয় ঘটনার উল্লেখ করব। এটি তাঁর সার্বজনীন ভাবনার উত্তপ্ত ফসল। ভগিনী নিবেদিতার মতোই আরেক ভগিনী শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। মিস লরা গ্লেন, যিনি ভগিনী দেবমাতা নামে সুপরিচিতা। ৪৭ নং বোসপাড়া লেনে দেবমাতা কিছুদিন ছিলেন। এইসময় প্রায় প্রতিদিনই সকালে তিনি উপস্থিত হলেন সারদা সন্নিধানে। এইরকম একদিনের কথা, দেবমাতা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মা ছোট্ট বারান্দায় বসে ভাইঝি রাধারানিকে খাওয়াচ্ছেন। রাধারানি স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। ভাত খেয়ে রাধারানি উঠে যেতেই শ্রীমা তার উচ্ছিষ্ট বাসনপত্র তুলতে গেলেন, সামনে অনেকেই বসে ছিলেন। কিন্তু শ্রীমার এত সাধারণ কাজ করতে দেখে দেবমাতার ভালো লাগল না। তাঁরা আছেন উপস্থিত! সুতরাং তিরের মতো উঠে 'মাতাদেবী' 'মাতাদেবী' বলে মায়ের হাত থেকে থালাবাটি নিয়ে নিলেন। তাঁর এই কাজ দেখে মায়ের আরেক ভাইঝি নলিনীদি হেসে ফেললেন। তাঁদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার! এ তো পিসিমার নিত্যকর্ম! মেমসাহেব এতে এত বিচলিত কেন! হাসি চাপা তাঁর পক্ষে দায়, কিন্তু নীরব হতে হল। মায়ের ঘোমটার আড়াল থেকে কঠোর দুটি চোখ নলিনীকে থামতে বাধ্য করল। দেবমাতা থালাবাটি নিয়ে স্থানত্যাগ করতেই তীব্র বিরক্তিতে মা বলে উঠলেন, 'ঐ মেয়েটি আমাদের ভাষা বোঝে না, তুই যে অমন করে হেসে উঠলি, তাতে ও ভাববে না, না জানি কী অন্যায় কাজ করে ফেলেছি! আর সেইসব মনে হলে ও কত কষ্ট পাবে!' নলিনীদির কাছে এ ছিল কেবল পিসিমার শাসনমাত্র, কিন্তু আমাদের কাছে তা বিশ্বজনীন নীতিবোধ। পরে দেবমাতা চলে গেলে মহিলার দল গোবর ন্যাতা দিয়ে সেই স্থানটি ধুয়ে দিয়েছিলেন। সমাজবিজ্ঞান বলে যুগ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে কিন্তু সেই রক্ষণশীলতার মধ্যে বাস করে শ্রীমা এই শিষ্টাচারকে অর্জন করলেন কী করে? কী করে তা সমাজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেন। একান্ত নীরবে, অপূর্ব সহমর্মিতায়!

শ্রীমায়ের সর্বজনীন আদর্শ বর্ণনায় আমরা যে তিনটির ঘটনার উল্লেখ করলাম প্রথমটিতে শ্রীমা ব্যক্তি আদর্শকে ত্যাগের উপর স্থাপন করেছেন যা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষের পক্ষে মূল ভিত্তিস্বরূপ। কেবল তাই নয় ত্যাগই ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সৃষ্টি করে। নতুন বিশ্বশান্তি গঠনে যে সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। দ্বিতীয় ঘটনার মাধ্যমে শ্রীমা জনগণের মধ্যে তাঁর সৃজনশীলতাকে কেমনভাবে বিস্তার করেছিলেন তা আমরা দেখতে পাই, শ্রেণিদ্বন্দ্ব নয়, শ্রেণি সমন্বয়ের এ এক বার্তা। তৃতীয় ঘটনার মধ্যে আবিশ্বকে সহমর্মিতার সঙ্গে গ্রহণ করার উদার মানসিকতার দেখা পাই। সহযোগিতা, সমন্বয় এবং সহমর্মিতা—এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মাধ্যমে মা তাঁর বিশ্বজনীন আদর্শকে সর্বজনে বিতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বড় মমতায়, একান্ত স্নেহে। শ্রীমায়ের মধ্যে কেবল

একচল্লিশ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও নারী জাগরণ

প্রসঙ্গটিকে আমরা দুভাবে তুলে ধরতে পারি। শ্রীমাকে কেন্দ্র করে নারী জাগরণ অথবা নারী জাগরণের ক্ষেত্রে শ্রীমা কী বলে গেছেন। একথা আমাদের সকলেরই জানা, মায়ের মুখ দিয়ে এমন কোনো কথা উচ্চারিত হয়নি যা সমাজের প্রতি আদেশস্বরূপ গণ্য হতে পারে। অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমা চিরকালই এক মহান জীবনযাপন করে গিয়েছেন, কথার থেকে তিনি জীবনে 'কথাকে বাস্তবায়িত' করার দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীমা যখন চলে গেলেন তখন স্বামীজির বিদেশিনী শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড তাঁর একটি চিঠিতে লিখলেন 'সেই দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল, যে দীপটি হাজার বছর ধরে বিশ্বের নারীকে কোন পথে চলতে হবে তার পথ দেখাবে।' মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আমরা ভগিনী নিবেদিতার কথাও উল্লেখ করতে পারি। ভগিনী, শ্রীমায়ের প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত 'স্বামীজিকে যেমন দেখিয়াছি' গ্রন্থে বলেছেন, 'তিনি কী প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি নাকি নবীন আদর্শের প্রথম অগ্রদূত।' কেবল স্বামীজির শিষ্যারা কেন স্বামীজি স্বয়ং গুরুভাইদের বিদেশ থেকে যে চিঠি লিখলেন তারমধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করছেন 'শ্রীমাকে কেন্দ্র করে কত গার্গী মৈত্রেয়ী জন্মগ্রহণ করবেন।' তাহলে আমরা দেখছি শ্রীমাকে কেন্দ্র করে এক নারী জাগরণের কথা এঁরা বলছেন বারংবার এবং দ্বিতীয়ত, এই নারী আন্দোলন বা নারী জাগরণ কেবল ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের নারীকে শ্রীমায়ের জীবন ও বাণী থেকে জীবন গঠনের রসদ সংগ্রহ করতে হবে তারই ইঙ্গিত বহন করে চলেছে। মায়ের জীবনের মধ্যে আমরা দেখি একাধারে প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় আবার প্রাচ্য নারী ও পাশ্চাত্যের নারীর অপূর্ব সম্মেলন। শ্রীমা ও নারী জাগরণের ক্ষেত্রটি আলোচনাকালে আমাদের এই দুটি বিষয় বা দুটি দিককে লক্ষ করতে হবে।

যে সমাজে শ্রীমা জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সমাজে নারীরা ঠাকুরঘরকে করে তুলেছিল নিজেদের কষ্ট দুঃখ ও চোখের জল ফেলার একটি নিভৃত ক্ষেত্র। শ্রীমা এই ঠাকুরঘরে নিয়ে এলেন যুক্তি, বিজ্ঞান, সমাজচেতনা ও প্রাচীন আধ্যাত্মিক দর্শনের আলো। তিনি দেখালেন নারী এই ঠাকুরঘরে নিজের জীবন তৈরি করতে সক্ষম। নিজের জন্য চোখের জল ফেলা নয় অপরের চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য নিজে তৈরি হওয়ার ক্ষেত্র করা যায় তাকে। শ্রীমা যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই যুগ ছিল নবজাগরণের সন্ধিক্ষণ, এই নবজাগরণকে ঐতিহাসিকগণ নারীজাগরণের অপর নাম বলে চিহ্নিত করেছেন। বাস্তবিকই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নারী জাগরণ। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতীয় নারীদের সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, ইত্যাদি সংস্কার কার্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আবার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে যদি আমরা দেখি তবে দেখব, আমেরিকায় নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের আন্দোলন বা ফেমিনিষ্ট

আন্দোলনের সূচনা হয়ে গিয়েছে। শ্রীমা এইরকম এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন, যে সন্ধিক্ষণে ভারত তথা বিশ্বের নারী একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ খুঁজে পেতে চাইছে।

আমরা দেখেছি ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, শ্রীমা প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি! বাস্তবিকই তাই, প্রাচীন নারীর আদর্শরূপে আমরা একাধারে বৈদিক যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতীর কথা বলতে পারি। মৈত্রেয়ীর মুখে শুনি সেই অমৃতত্ব লাভের বাণী 'যে ধন আমাকে অমৃতত্ব দান করবে না, সেই ধন নিয়ে আমি কী করব?' শ্রীমায়ের জীবনে আমরা তারই প্রতিফলন দেখতে পাই, শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, ঠাকুর মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে সংসার পথে টানতে এসেছ! শ্রীমা অনায়াসে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'না সংসার পথে টানতে যাব কেন! আমি তোমায় ইষ্টপথে সহায়তা করতে এসেছি।' শ্রীরামকৃষ্ণের ইষ্টপথ কী? এই জগৎকে অমৃতত্ব লাভের উপযোগী করে তোলাই তাঁর ইষ্টপথ। তাই তাঁর সর্বশেষ মহা আশীর্বাদ ছিল 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। শ্রীমাও মানবের চৈতন্য বিতরণে সদারত। একদিকে ভারতীয় নারীর অসাধারণ লজ্জাশীলতা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তিনি অবগুণ্ঠনবতী। ভারতীয় নারীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেম তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছে এক কাব্যের মতো। শ্রীরামচন্দ্রময়ী মা সীতার মতো শ্রীমাও শ্রীরামকৃষ্ণ গতপ্রাণা। 'শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের অপূর্ব পাত্র।'—ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমায়ের সম্বন্ধে এই অপূর্ব উক্তিটি করেছিলেন। ঠাকুর স্বয়ং মাকে ভার সমর্পণ করেছেন। কাশীপুরে তিনি শ্রীমাকে বলেছিলেন, 'কলকাতার লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখবে। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে মা একদিন এক সেবককে বলেন—'আমি আর কী করতে পাচ্ছি—কজনকে দেখতে পাচ্ছি! তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন! সকলকে দেখতে পারতুম, তবে তো হত' স্বামীর জীবন ব্রত সম্বন্ধে কী তীব্র সচেতনতা! আবার আধ্যাত্মিক গভীরতার দিক দিয়ে তাঁর স্বামীই তাঁর ইষ্ট। কাশীপুরে ঠাকুরের লীলা সংবরণের পরে শ্রীমায়ের মুখে সেই বিখ্যাত উক্তি 'ও আমার মা কালী গো, আমায় ফেলে কোথায় গেলে!' ভারতীয় আদর্শে যথার্থ সহধর্মিণী তিনি। আবার কেবল তিনি পতিনিষ্ঠ স্ত্রী নন, তিনি জ্ঞানদায়িনী মাতাও বটে।

শ্রীমায়ের মুখে আমরা ভারতের চিরন্তন জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ সর্বদা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হতে দেখি। শ্রীশ্রীমায়ের কথা গ্রন্থে আমরা একদিনের বর্ণনা পাই। উদ্বোধনে শ্রীমায়ের কাছে এসেছেন এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের গৈরিকধারিণী সাধিকা। তাঁর মামলাপ্রিয় গুরুদেব ঋণে জর্জরিত হয়েছেন। তাঁর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বের-হয়েছেন সাধুনি। তিনি শ্রীমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তাঁর গুরুদেব মূর্তি পূজায় আস্থাবান নন। এ প্রসঙ্গে মায়ের কী অভিমত! শ্রীমা প্রথমে তাঁকে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়!—বলে নিরস্ত করতে চাইলেন। তারপর জিজ্ঞাসুর জেদের ফলে তাঁর শ্রীমুখ থেকে এক মহাবাণী নির্গত হল। শ্রীমা বললেন, "তিনি (তোমার গুরু) যদি সর্বজ্ঞ হতেন—এই দেখো তোমার জিদের ফল, কথায় কথা বেরুল—তাহলে ঐ কথা বলতেন না। সেই অনাদিকাল হতে কত লোকে মূর্তি উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আসছে সেটা কিছু নয়? আমাদের ঠাকুরের ওরূপ সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না। ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কী জানো—সাধু পুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে

এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানারকমের পাখি বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখির বোল বলি, একটাই পাখির বোল আর অন্যগুলো পাখির বোল নয় এরূপ বলি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীই শ্রীমা ভিন্ন ভাষায় উপস্থাপিত করলেন। আবার এক সন্তান শ্রীমাকে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। এত জপ ধ্যান করেও নিজের প্রবৃত্তিকে বশে আনতে সক্ষম হচ্ছেন না তিনি। আহত, অক্ষম সন্তানের প্রতি শ্রীমায়ের অভয়বাণী উচ্চারিত হয়েছে। শ্রীমা বলছেন, 'এমন যে জল, যার স্বভাব নীচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচুদিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।"

ভক্ত সন্তানকে উপদেশদানের সময় শ্রীমা নিজের জীবনকে দৃষ্টান্ত দিয়ে উপদেশ দিতেন, তাঁর উপদেশ দানের এটি একটি বিশেষত্ব ছিল। স্বামী শান্তানন্দজিকে শ্রীমা বলেছিলেন, 'মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভালো কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। আমি আগে রাত তিনটের সময় উঠে প্রত্যহ ধ্যান করতুম। একদিন শরীর ভালো না থাকায় আলস্যবশত করলুম না; তা কদিন বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য ভালো কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব রোক চাই। যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠত, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম। 'চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোনো দাগ না থাকে।' কী সাধন বিষয়ে কী জাগতিক বিষয়ে মায়ের জীবনে পরিশ্রমকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। তিনি সব ক্ষেত্রেই অসাধারণ সাধনার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়টিকে আজকের নারী-স্বাধীনতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। নহবতের জীবন ছিল তাই একাধারে কর্মবহুল অপরদিকে ধ্যানগম্ভীর। ঠাকুর শ্রীমাকে বলতেন, "কর্ম করতে হয়; মেয়ে লোকের বসে থাকতে নেই; বসে থাকলে নানারকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা—সব আসে।' শ্রীমা এই কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, '(ঠাকুর) কতকগুলি পাট এনে আমায় দিয়ে বললেন, 'এইগুলি দিয়ে আমার শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখব, লুচি রাখব ছেলেদের জন্যে'। আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁসোগুলি দিয়ে থান ফেড়ে বালিশ মাথায় দিতুম। তখনো তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হত, এখন এই সবে (খাট বিছানায়) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোনো তফাত বোধ হয় না, মা।" নারীদের জীবনে সন্তোষ সংসারে শান্তি এনে দেয়। পরিবারকে সুন্দর করে সমাজকে দৃঢ়ভিত্তি প্রদান করে। এই সন্তোষের জন্য একান্তভাবে দরকার আধ্যাত্মিকভাবে ভাবিত হওয়ার। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা নারী জাগরণের জন্য নারীদের মধ্যে এই অধ্যাত্মভাবনার কথা স্বীকার করছেন। সমাজবিজ্ঞানী উরসুলা কিং তাঁর গ্রন্থ, 'Women and spirituality, voices of protest and promise'.

"Feminist thought acts as a decisive critical category for spirituality itself. Negetively speaking, feminist critical thought challenges traditional religions and spiritualities for their exclusiveness, their rejection and subordination of women; positively it seeks to discover different, more

integral world and life affirmative religious possibilities. The women's movement can be seen as a spiritual revolution, it certainly bears witness to a new women spirit rising at a very decisive moment in human history, the search for viable spiritualities is expressed in different but related ways in the writings on both feminism and spirituality."

শ্রীমা এই আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ধারক বাহক হবেন। যেখানে নারীর প্রতি অত্যাচার নেই আছে দর্শন, স্বাতন্ত্র্য, মুক্ত চিন্তার অধিকার। সমাজবিজ্ঞানী উরসুলা কিং এক্ষেত্রে শ্রীমা সারদা দেবীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় নারীদের জীবনে যে ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষার দেখা আমরা পাই শ্রীমায়ের জীবনে তার প্রতিটি ক্ষেত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সাধারণ ব্রত থেকে শুরু করে অদ্বৈত বেদান্তের চূড়ান্ত দর্শন তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছে। আমরা জানি শ্রীমা নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়িতে পঞ্চতপা ব্রত পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে কোনো ভক্ত মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, মা এই ব্রত করার তাৎপর্য কী? তোমার জীবনে এই ব্রতের উদ্দেশ্যও বা কী?' মা সহজভাবে উত্তর দিয়েছেন, এসব মেয়েলি ব্রত, পার্বতী শিবের জন্য করেছিলেন। লোকশিক্ষার জন্যই এই ব্রত পালন করা। নইলে লোকে মনে করবে খায় দায় বেশ আছে।' প্রাচীন ভারতের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। ভগিনী নিবেদিতা বিদেশি সঙ্গীদের সাথে কামারহাটিতে 'গোপালের মাকে' দর্শন করতে গিয়েছেন। স্বামীজি সে কথা শুনে ভগিনীকে বলেছিলেন, 'তোমরা সেই প্রাচীন ভারতকে দেখে এলে। সেই ত্যাগ তিতিক্ষার ভারত চলে যাচ্ছে, সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।' মায়ের জীবন সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলতে পারা যায়। কী বৈদিক যুগের নারী, কী পৌরাণিক নারী, কী মহাকাব্যের নারী— সব যুগের নারীর ইতিবাচক দিকটি শ্রীমায়ের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

আবার যদি নতুন ভারতের অগ্রদূতরূপে আমরা শ্রীমাকে দেখি তবে আমরা দেখব সেই ক্ষেত্রেও তিনি অনন্যা, অদ্বিতীয়া। যুগসন্ধিক্ষণে তিনি এসেছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে সামাজিক উদারতার এক চরম নিদর্শন তিনি রেখে গিয়েছেন। তিনি জাতপাতের গণ্ডিকে অতিক্রম করে আমজাদকে পুত্ররূপে স্বীকার করেছেন। বাগদি ডাকাতের সঙ্গে পিতাপুত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। ভগিনী নিবেদিতাকে সাদরে 'খুকি' করে নিজের কোলে স্থান দিয়েছেন। যে যুগে কালাপানি পার হলে জাতিচ্যুত হতে হত সেই যুগে তিনি সন্ন্যাসী সন্তানকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। গৃহের মধ্যে থেকে মনের অসাধারণ বিস্তার, নতুনকে গ্রহণের উদারতা শ্রীমায়ের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। তিনি গৌরীমাকে বলেছেন, 'ওদেরকে বলে দিয়ো, থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়' করার জন্য তাঁদের জন্ম হয়নি।' নারী জীবনের নিজস্ব বিচরণ ক্ষেত্রকে শ্রীমা সম্যকরূপে নির্দেশ করেছিলেন। কোনো অভিভাবক মায়ের কাছে দুঃখ করে বলছেন, মেয়েদের বিবাহ দিতে পারছেন না। মায়ের স্বচ্ছন্দ উত্তর মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারো নিবেদিতা স্কুলে রেখে দাও। পড়াশুনা শিখুক।' আবার গৌরীমায়ের এক ছাত্রীকে মা জিজ্ঞাসা করছেন 'বাড়ি গিয়ে খাব—এর ইংরেজি কী হবে বলো তো।' নারীর উন্মুক্ত মনকে মা সাদরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আজকের তথাকথিত নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে মায়ের বক্তব্যের পার্থক্য ছিল। শ্রীমা কখনো 'পুরুষের মতো' হওয়ার কথা আমাদেরকে বলেননি।

কোনো এক ভক্ত মহিলা মাকে বলছেন, 'মা ঠাকুর বলেছেন, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।' শ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'না বাবা, ও সন্ন্যাসীদের জন্য। মেয়েদের ক্ষেত্রে লজ্জা ঘৃণা, ভয়—এ তিনেরই প্রয়োজন। যার আছে ভয় তার আছে জয়।' তিনি যুক্তিকে চেয়েছেন অযৌক্তিক বাঁধনহীনতাকে মেনে নেননি।

আমরা শ্রীমায়ের জীবনে নবীন ও প্রাচীনকে সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মেলনও দেখতে পেয়েছি। প্রাচ্য নারীর মধ্যে যে সমাজ মনস্কতা, নানা নাগরিক চেতনার দেখা পাওয়া যায়, তা কিন্তু শ্রীমায়ের মধ্যেও ছিল। কিন্তু শ্রীমা তাকে ভারতীয় ভাবনার ধারায় অনুরঞ্জিত করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, উইলসনের চৌদ্দ দফা দাবিতে। মা এক সন্তানের কাছে তা শুনতে চাইলেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'এ সব মুখস্থ। যদি অন্তস্থ হত তাহলে কথা থাকত না।' ভক্ত প্রবোধবাবু একদিন ইংরেজ সরকার আমাদের কী কী সুবিধা করে দিয়েছে তারই বর্ণনা মায়ের কাছে বর্ণনা করছিলেন। সব শোনার পর শ্রীমা তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তা সব হয়েছে। কিন্তু আগে মানুষের অন্নকষ্টের এত অভাব ছিল না। এখন অন্ন কষ্টের অভাব বেড়েছে।'

কেবল প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় নয়, কিংবা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয় নয়। শ্রীমা নিজের জীবনে নারীর নিজস্ব বিচরণের একটি ক্ষেত্রকে নির্দেশ করেছিলেন। এটি হল তাঁর মাতৃত্ব। এই মাতৃত্বের মধ্যে তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকেও প্রবেশের অধিকার দেননি। তিনি নিজ মুখে বলেছেন, 'আমি সত্যকারের মা'। গর্ভে লালন না করেও কীভাবে সত্য জননী হওয়া যায়, তার রহস্য আমাদের মায়ের জীবনের কাছ থেকে শিখতে হবে। আমরা দেখব বিস্তারই নারীর সঠিক মাতৃত্ব। মা এই বিস্তারকে শিখিয়েছিলেন। ভারতের নারীদের কাছে এমন এক আদর্শ রেখে গিয়েছেন যা নারীত্বের সুষমায় পরিপূর্ণ এক নতুন নারীবাদের বার্তা ঘোষণা করে। এই নারীবাদে ভাঙনের কোনো কথা নেই, কেবল রয়েছে গঠনের আহ্বান।

বিয়াল্লিশ

মহামায়ারূপে

সর্বক্ষণ রাধু রাধু! ভক্তদের মধ্যে কেউ বিস্মিত, কেউ বা লজ্জিত। আবার কারোর মন প্রশ্ন করার জন্য উন্মুখ। অবশেষে শ্রীমায়ের কাছে এক ভক্ত প্রশ্ন করেই বসলেন, 'মা! আপনি সবসময় রাধু রাধু করেন কেন?' উত্তর এল, 'আমরা মেয়েরা এরকমই!' স্বয়ং মহামায়া শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অসুরকে বলছেন, 'তুমি বহু দেখছ কি! সবই যে আমি!' মায়ের এই কথায় যেন তারই প্রতিধ্বনি! যিনি মহামায়া তিনিই স্থির করেন মায়ার স্বরূপ। পরিচালিত করেন সমগ্র নারীজাতিকে। আজ আমরা মায়ের সেই মহামায়ারূপের অন্দরমহলে প্রবেশের চেষ্টা করব? আমাদের মনে আসবে চিরন্তন সেই প্রশ্ন, 'মাগো তুমি কে?'

দুর্গাপূজা শেষ হয়ে কালীপূজাও সম্পন্ন হয়েছে। গ্রাম বাংলার আকাশে বাতাসে শীতের পরশ। ঠিক এইসময় ঢ্যাম্ কুড় কুড় বাজনা বাজিয়ে এক দেবীর আগমন হল। দেবী জগদ্ধাত্রী। প্রাচীন যুগে বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবিত গ্রাম জয়রামবাটী। বাঁকুড়া আর হুগলির সীমায় অবস্থিত এই গ্রামের লোকসংস্কৃতিতে বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট, গ্রামে দেবী সিংহবাহিনী ধর্মরাজ। তাই সাড়ম্বরে সেখানে পালিত হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। একটি পুজোকে ঘিরেই সমস্ত গ্রামে উন্মাদনা। আশেপাশের গ্রামও সেই আনন্দ উৎসবে শামিল হয়। ১২৬৮ সালের কাছাকাছি সময়, জয়রামবাটিতে সেবার ধুমধাম করে জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে, জগদ্ধাত্রী আরাধনা। দেবী দুর্গারই আরেক রূপ জগদ্ধাত্রী। এইরূপে তিনি ধারণ করে আছেন পৃথিবীকে। গ্রামের অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছেন রাম মুখুজ্যের মেয়ে সারদা। না, আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠার মতো মেয়ে তিনি নন। স্থির ধ্রুব তারার মতো স্বতন্ত্র গম্ভীর, শুভ্রফুলের থেকেও সুন্দর পবিত্র। দেবী বাগবাদিনীর চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। গ্রামবাসী তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তাকে স্বীকার করে, কিন্তু তার স্বরূপকে সর্বদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আগুনের পাশে থাকলে তাঁর উত্তাপকে স্বীকার করতেই হবে। তাই মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের মতো সাধারণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অসাধারণ রূপটি বেরিয়ে পড়ে। জগদ্ধাত্রী পূজায় পাশের গ্রাম হলদেপুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল এসেছেন দেবীর আরতি দেখতে। রাজরানির মতো বিরাজিতা দেবীর সম্মুখে পুরোহিত নিষ্ঠার সঙ্গে নিরাজন সম্পন্ন করছেন। দর্শকেরা সকলেই মগ্ন হয়েছেন। রামহৃদয় ঘোষালের দৃষ্টি হঠাৎ গিয়ে পড়ল দেবীর সম্মুখে বসা কুমারী এক মেয়ের দিকে রামমুখুজ্যের মেয়ে সারদা। চোখ পড়তেই বিস্ময়ে স্থির হয়ে যান রামহৃদয় ! এ কী, সম্মুখের মৃন্ময়ী দেবীর মুখ আর সারদার মুখ মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। কে দেবী? চিন্ময়ী সারদা না মৃন্ময়ী জগদ্ধাত্রী। ছোট্ট সারদা দেবীর সামনে ধ্যানে তন্ময়! বারংবার দেখতে থাকেন রামহৃদয়। তাঁর কি চোখের ভুল হল? না, কোনো ভুল নেই। সারদা আর দেবীর মুখ কোন দেবতার লীলায় এক রূপ ধারণ করেছে। দুজনের মধ্যে এই সাদৃশ্যের রহস্য উদঘাটনের দিকে গেলেন না রামহৃদয়। তিনি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন। স্থান ত্যাগ করে পা বাড়ালেন গৃহের দিকে।

সাধারণ মেয়েটিকে নিয়ে অসাধারণত্বের রূপকথা আঁকা হয়েছে তাঁর জন্মের আগে থেকেই। সাধারণের রূপে নিজ মহিমাকে গোপন করে কোনো মহাশক্তি জন্ম নিয়েছেন ভেবে পান না পিতা রামচন্দ্র মুখুজ্যে আর মা শ্যামাসুন্দরী দেবী। সেদিনটিই ছিল খুব সাধারণ। বাপের বাড়ি শিহড় গ্রামে গিয়েছিলেন শ্যামাসুন্দরী। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেখানে। পেটের অসুখ! বারবার ঘরের বাইরে যেতে হচ্ছে। গ্রামগঞ্জে পুকুরের ধারেই সকলে নিত্যপ্রয়োজনের কাজ সারে। কিন্তু শরীরে দুর্বলতা পুকুর পর্যন্ত যেতে দিল না শ্যামাসুন্দরী দেবীকে। একটি বেলগাছের তলায় অচৈতন্যের মতো পড়ে রইলেন তিনি। সেই আধো অচেতন অবস্থায় হঠাৎ দেখলেন বেলগাছের থেকে এক ছোট্ট লালচেলি পরা মেয়ে নেমে এল। তড়িৎ গতিতে নেমে এসে শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরে বীণার মতো মধুর স্বরে বলল, 'আমি তোমার কাছে এলুম মা।' ব্যস, এইটুকুনই। এরপর থেকে শ্যামাসুন্দরীর মনে হতে লাগল কী যেন তাঁর পেটের মধ্যে ঢুকে আছে। তিনি অনুভব করলেন তিনি গর্ভবতী। যে সন্তান জন্মের সূত্রপাত এই অলৌকিকতাকে দিয়ে তাকে অন্যের থেকে পৃথক করে তো দেখবেই সকলে। কিন্তু সারদা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিকতার অহংকারে অহংকৃত এক অস্তিত্ব নন। বরঞ্চ সকলের আড়ালে নীরবতায় মাখামাখি হয়ে বিরাজ করেন। তাঁর দিন কাটে আর সব মেয়েদের মতোই গৃহকর্মের মধ্যে দিয়ে। পিতামাতার বড় সন্তান তিনি! মায়ের গৃহকর্মে সহায়তা করা, ছোট ছোট ভাইদের দেখাশোনা করা—সব কাজই তাঁর উপর। ধর্মপ্রাণ পিতামাতার ভালোবাসায় বাহুল্য নেই আছে এক শ্রদ্ধামিশ্রিত স্নিগ্ধ স্নেহ। কন্যারূপে পিতৃগৃহের সব কাজই তিনি সম্পন্ন করেছেন সুচারুভাবে। শ্যামাসুন্দরী কোনো কোনো দিন কন্যা সারদার অপূর্ব ধৈর্য আর সেবা দেখে বলে ফেলেছেন, 'মাগো, তুই যে আমার কে মা? আমি কি তোকে চিনতে পেরেছি মা?' মায়ের মুখে এই কথা শুনে ত্রস্ত সারদা দ্রুত উত্তর দিয়েছেন, 'কে আবার, কে আবার? আমার কি চারটে হাত হয়েছে। তাহলে তোমার কাছে আসব কেন?'

না বাইরের রূপের পরিবর্তন হয়নি ভিতরে ভিতরে রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করেছেন সারদা। কখনো তিনি দুর্গারূপে আরাধিতা, কখনো জগদ্ধাত্রী, কখনো বা তিনি বগলা, কখনো তিনি কালী। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ স্ত্রী সারদাকে পূজা করেছিলেন ষোড়শী দেবী রূপে। বিভিন্ন পুরাণ মহাকাব্যের মধ্যে দেখি দেবীকুল সর্বদাই সখী পরিবৃত। কখনো বা নিজের দেহ থেকেই সৃষ্টি করছেন নিজেরই মতো আরেক দেবীর। দেবী সত্তার এ এক বিশেষত্ব! শ্রীমা সারদার ক্ষেত্রে দেখি ছোটবেলা থেকেই সখী পরিবৃত। সে যেমন তেমন সখী নয়। এই সখীদের তিনি ছাড়া আর কেউ দেখতে পেত না। তিনি নিজের মতোই আরেক মেয়ের অস্তিত্ব তাঁর জীবনকে আর সব মেয়ের থেকে পৃথক করেছিল। তিনি পরবর্তীকালে বলতেন, 'দেখো, ছেলেবেলা দেখতুম, আমারই মতো মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত—আমার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করত; কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না।'

লোকমুখে স্বামী সম্বন্ধে নানা খবর শুনে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া মনস্থির করলেন সারদা। সঙ্গে চললেন পিতা রামচন্দ্র মুখুজ্যে। অনেক পথ। দরিদ্র পিতা ও কন্যা হেঁটেই সেই পথ অতিক্রম করতে চাইলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই অসুস্থ হলেন সারদা। জ্বরের তীব্র ঘোরে এক চটিতে শুয়ে

শুয়ে দেখলেন এক কালোবরণ কন্যা তাঁর কাছে এসেছে, তাঁর গায়ে তার ঠাণ্ডা শীতল হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। তিনি চোখ মেলে বললেন, 'তুমি কে গা? কোথা থেকে এসেছ?' কালো মেয়ে উত্তর দিল, 'আমি তোমার বোন হই! আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' এই কথা শুনে অবাক হয়ে মা বললেন, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলুম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐসব হলোনি। 'মায়ের মুখে এই কথা শুনে মেয়েটি বলল, 'সে কী! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কী, ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যেই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' শ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বটে! তুমি আমাদের কে হও গা!' কালো মেয়ে জবাব দেয়, 'আমি তোমার বোন হই।'

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি সাধনায় মগ্ন রেখেছিলেন তিনি দেবী কালিকা। ভবতারিণী। সেই দেবীই শ্রীমায়ের কাছে অঙ্গীকার করছেন তিনি সারদার বোন হন। স্বরূপের একই সূত্র ধরে দুই ভিন্নরূপে এ দেবীলীলার কতটুকুই বা মানব বুঝতে পারে! অন্তহীন তেলেভেলোর মাঠ পার হচ্ছেন সারদা। সঙ্গীরা তাঁকে ফেলে গেছে। একাকিনি, পথে ডাকাতের ভয়। সন্ধের অন্ধকার ধীরে রাতের দিকে অগ্রসর হয়েছে, সারদাও তাঁর পথ হারানো সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন। এমন সময় পুরুষের কর্কশ স্বর বলে ওঠে, 'কে যায়?' সঙ্গে সঙ্গে বিশাল দেহী এক ডাকাত সামনে দাঁড়ায় সঙ্গে তার স্ত্রী। কিন্তু সারদার দিকে তাকাতেই তাদের সেই দস্যু প্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত। সারদাকে সন্তানরূপে সেই বনের মধ্যেই আশ্রয় দিলেন। 'তোমরা আমাকে কেন এত ভালোবাসো?' সারদার এই প্রশ্নের উত্তরে ডাকাত দম্পত্তি জানিয়েছিলেন তুমি তো সামান্যা নও! তোমার মধ্যে যে আমাদের ইষ্টদেবী কালীর দেখা পেলাম আমরা! শ্রীমা তখনও নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বালিকার মতো নিস্পৃহ।

জয়রামবাটির এক গ্রাম্য বালিকা এলেন দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে। স্বামী তখন অধ্যাত্ম সাধনার চরম উপলব্ধি লাভ করে, সমস্ত ধর্মের সার বস্তুকে নিজ সাধনজীবন দিয়ে আস্বাদ করে ফেলেছেন। এইসময় এলেন সারদা। স্বামীর সাধন জীবনে এসে তিনি দেবীর থেকে মহত্ত্ব প্রদান করলেন। স্বামীকে স্পষ্ট জানালেন, 'আমি তোমার ইষ্ট পথের সহায়তা করতে এসেছি।' এই বাণী তাঁকে দেবীত্বে বরণ করল, শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীরূপে পূজা করলেন তাঁকে। পূজা করলেন ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন।

জগতের কাছে যে জীবন্ত মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মাতৃমূর্তিকে আমরা আজীবন ভক্তের কাছে, তাপিত তৃষিত মানবের কাছে কখনো গর্ভধারিণীরূপে ঘরোয়াভাবে, কখনো বা জগৎজননীরূপে বিরাটভাবে সান্ত্বনা আশ্বাস ভালোবাসা বিতরণ করতে দেখেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর পথে পথে ঘুরছেন নরেন্দ্রনাথ। সঙ্গে মায়ের আশীর্বাদ। চিঠিতে লিখছেন 'বাবুরামের মা (শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দের জননী) জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গার আরাধনা করছেন।' এখানে স্বামীজি বর্ণিত 'জ্যান্ত দুর্গা' হলেন শ্রীমা সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে থাকতেই কাশীপুরের বাগান বাড়িতে নতুন ত্যাগীদের ভিক্ষা গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুভাইদের নিয়ে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমায়ের কাছে। ভিক্ষা চেয়েছিলেন এই

বলে, 'অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে সারদে শঙ্করবল্লভে'। হে অন্নপূর্ণা, শিব শঙ্করের প্রাণ বল্লভা তুমি আমাদের ভিক্ষাদান করো। মায়ের সেই অন্নপূর্ণা অর্থাৎ দুর্গারূপটি শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের মনে চিরকাল জাগরূক। তাই বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় দেবী প্রতিমার মতোই বন্দিতা হন শ্রীমা। নাট্য সম্রাট গিরীশ ঘোষ নিজগৃহে দুর্গাপূজার শ্রীমার উপস্থিতিকেই দেবীর উপস্থিতি বলে গণ্য করেন।

উদ্বোধনে আছেন শ্রীমা। এক ভক্ত এসেছেন প্রণাম করতে। প্রণাম করে উঠে তাকিয়ে দেখেন চোখের কোন দিয়ে তাঁকে দেখছেন শ্রীমা। কিন্তু তাঁর চক্ষু দুটি দেবী চক্ষুর মতো আকর্ণ বিস্তৃত! স্বামী প্রেমেশানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের এক উল্লেখযোগ্য সন্ন্যাসী। মায়ের সন্তান! তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, মাকে প্রণাম করে তাকিয়ে দেখেন চোখ দুটিতে বিদ্যুতের ঝলক! যেন দুটি টর্চ জ্বলছে। দশমহাবিদ্যার উল্লেখযোগ্য দেবী হলেন, বগলা। পুরাণে এই দেবীর রূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আলোর মতো জ্যোতির তরঙ্গে এক পদ্মের উপর বসে আছেন দেবী। সম্মুখে এক অসুর। দেবী একহাতে তাঁর জিহ্বাকে আকর্ষণ করেছেন, আরেক হাতে গদা দিয়ে তাঁকে প্রহার করছেন। দেবীর সংহার-মূর্তি। কিন্তু তিনি বাইরে শান্ত। কামারপুকুরে আছেন শ্রীমা, 'একাটি একাটি আছি।' শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পরে। একদিন হরিশ নামে এক পাগলভক্ত কামারপুকুরে উপস্থিত হল। তার স্ত্রী ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। শ্রীমায়ের তার প্রতি করুণা আছে। কিন্তু পাগল হরিশ একদিন অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। 'তুমি আমার শক্তি, তুমি আমার শক্তি, বলে মায়ের পিছনে ধাওয়া করল। পাগলের আচম্বিত খেয়ালে হতচকিত শ্রীমা প্রথমে ধানের মরাইয়ের চারধারে কিছুক্ষণ ঘুরলেন। তারপর? তারপরের কথা মায়ের মুখ থেকেই শুনি। মা বলছেন, 'হরিশ কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি। এসে বাড়ির ভিতর যেই ঢুকছি, অমনি হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটছে। হরিশ তখন খেপা—পরিবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই—আমি কোথায় যাই? তাড়াতাড়ি ধানের খামারের চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আর আমি পারলুম না। তখন নিজমূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল।'—পাঠকের নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হবে না শ্রীমা 'নিজমূর্তি' বলতে বগলারূপকেই চিহ্নিত করেছেন।

সারদা যখন ছোট্ট, তখন দেবপ্রতিম স্বামী তাঁকে নির্দেশ করে ভক্ত সন্তানদের বলেছিলেন, 'ও সারদা, সরস্বতী! জ্ঞান দিতে এসেছে। ও আমার শক্তি।' দেবতার সঙ্গিনীরূপে, শক্তিরূপে দেবীই অবতীর্ণা হন। মহামায়া ব্যতীত মায়াধীশকে সাহায্য করার শক্তি কার? তাই সবার মা সারদা মহামায়ারূপে সকলের কাছে বন্দিতা।

তেতাল্লিশ

ভারতীয় নারী-সমাজের বিবর্তনের ধারায় শ্রীমা

১৯২০-র ২০শে জুলাই, বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে লীলা অবসান হয়েছে শ্রীমায়ের। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সে সংবাদ। এক মহাবৃক্ষের সমাপনকে উদ্দেশ্য করে স্বামীজির শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড লিখলেন, 'সেই দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল? রেখে গেল এক মহৎ আদর্শ যে আদর্শ হাজার বছরের ভবিষ্যৎ নারীসমাজ কোন পথে চলবে তার হবে পথপ্রদর্শক।' স্বামীজির শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি হল ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, তিনি বললেন, এই নারীজীবন কি প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি? নাকি নবীন আদর্শের অগ্রদূত। যুগসন্ধিক্ষণের চালিকা শক্তিরূপে শ্রীমাকে চিহ্নিত করে গেলেন ভগিনী নিবেদিতা। সত্যিই কি মা ছিলেন সেই পরিচালিকা শক্তি? সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে, সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে, আর সংস্কৃতির পূর্ণতায় কী তাঁর ভূমিকা? এই আলোচনায় আমরা শ্রীমায়ের সেই ভূমিকাকেই নির্ধারণ করতে চেষ্টা করব।

সভ্যতা একটি নদীর মতো, সে তার উৎসধারা থেকে নির্গত হয়ে বয়ে চলে। আর চলার পথে কত অভিজ্ঞতাকে বুকে নিয়ে বয়ে যায় সাগরের দিকে। আর সংস্কৃতি? সংস্কৃতি যেন এক মধুকরের অতি যত্নে নির্মিত মৌচাক। ধীরে ধীরে, বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত, অতি যত্নে নির্মিত। আর বিবর্তনের ধারা—যেন রাত্রি-দিনের খেলা। বিবর্তনের পথ একবার উজ্জ্বল দিন, কিছুপরেই ঘন কালো অন্ধকার নেমে আসা রাত্রি। যে রাত্রি দেখে মনে হয়, অন্ধকারের কি শেষ নেই! হারিয়ে গেল বোধহয় উজ্জ্বল সোনালি দিনগুলি। কিন্তু রাত্রির তপস্যা একদিন সুন্দর প্রভাত নিয়ে আসে। আবার শুরু হয় দিন আর রাত্রির চলার পথ। বিবর্তনের ধারাকে আরেকটু স্পষ্টভাবে যদি আমরা বলতে চাই, তবে তাকে ঢেউ-এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একবার তার গতি উঁচুর দিকে পরমুহূর্তে গতি তার নীচের দিকে। বিবর্তনের গতি সরলরেখায় না ওঠাপড়ার ছন্দে গড়ে ওঠে এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে আছে মতাদর্শগত বিভেদ, দ্বন্দ্ব! সমাজ-বিবর্তনের আলোচনায় কার্ল মার্ক্স বিবর্তনের ধারাকে সরলরেখায় বর্ণনা করেছেন। আবার ভিলফ্রেড প্যারেটো, অগাস্ত কোঁত প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ বিবর্তনকে ঢেউ-এর গতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এঁদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন ঢেউ-এর গতির কথা। দ্বন্দকে সরিয়ে রেখে, আমরা যদি বিবর্তনের ধারাকে লক্ষ করি তবে দেখব এ হল সমাজের ধীরে ধীরে এগিয়ে চলার পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে সমাজ এক স্তর থেকে আরেক স্তরে এগিয়ে চলে। ভারতের নারী সমাজের বিবর্তন ভারতের সমাজ বিবর্তনরই একটি অংশ। সমাজের প্রাথমিক অবস্থা থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতীয় নারীর গতিপথ এবং সেখানে শ্রীমা সারদাদেবীর স্থান নির্ণয়—এই বিষয়টি নতুন নয়। সঠিক তথ্যের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দান করি, তবে দেখব এই বিষয়টি সর্বপ্রথম আলোচনা করেছিলেন সূত্রাকারে

স্বামী বিবেকানন্দ তারপর বিস্তৃতভাবে ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা তাঁর Web of Indian Life গ্রন্থে ভারতের নারী বিবর্তনে শ্রীশ্রীমায়ের স্থান কোথায় তার একটি বিস্তৃত, মনোজ্ঞ, গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন। আমরা আজকে ভারতবর্ষের নারী সমাজের বিবর্তনের ধারায় শ্রীমায়ের ভূমিকা কী তা আলোচনা করব স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই।

ভারতের নারী সমাজের বিবর্তনের ধারার প্রথম স্তর বৈদিক যুগ। কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনাকে সমাজের আদিম অবস্থা দিয়ে শুরু করব। যখন সমাজের সূত্রপাত হয়নি, মানুষ কেবল সংঘবদ্ধ জীব! বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকা অস্তিত্ব। ভগিনী নিবেদিতা মানবের এই পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক অবস্থার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ যখন টিকে থাকত তখন মানুষ আর মানুষের মধ্যে একটিই মানবিক সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল। সেটি হল মা আর তার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক। মানব সভ্যতার আদিম অবস্থায় মানুষের অনুভূতিগুলো তীক্ষ্ণ ছিল না। সে জানত না বিজ্ঞান, অবগত ছিল না প্রকৃতির গভীর রহস্যের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা। সে শুধু একটি সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই নিজের জীবনকে আবর্তিত করে চলত। স্বামীজি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে 'সমাজের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে' বলতে গিয়ে আদিম সমাজের কথা বলছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌন সম্বন্ধ উপস্থিত হল। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্বসমাজে মায়ের উপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা থাকত না। মায়ের নামে ছেলেপুলের নাম হত। মেয়েদের হাতে ধন থাকত মানুষ করবার জন্য। ক্রমে ধনরত্ন পুরুষের হাতে গেল। মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বললে, "যেমন এ ধনধান্য আমার, আমি চাষবাস করে বা লুঠতরাজ করে উপার্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বসায় তো আমি বিরোধ করব', তেমনি বললে, 'এ মেয়েগুলো আমার, এতে যদি কেউ হস্তার্পণ করে তো বিরোধ হবে।' বর্তমান বিবাহের সূত্রপাত হল। মেয়েমানুষ-পুরুষের ঘটি বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হল।" স্বামীজির মতে সমাজে এই প্রথম বিবাহের সৃষ্টি হল। সামাজিক বিবর্তনের প্রথম পর্যায়, বৈদিক যুগে আমরা দেখব কেবল বিবাহ নয় সমাজ গঠিত হয়েছে, মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছে। তবু আমরা আমাদের আলোচনা সমাজ ও সমিতি সূচনার আগের অবস্থা অর্থাৎ আদিম অবস্থা থেকে শুরু করলাম কারণ আদিম অবস্থায় মাতৃভাবের অস্তিত্বকে স্মরণে রাখবার জন্য। আমরা সমাজের বিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করে দেখব কী করে এই মাতৃত্বের সম্পর্ক বিভিন্ন পথ বেয়ে শুদ্ধ মাতৃভাবে পর্যবসিত হয়েছে আর সেখানে শ্রীমা কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিবর্তনের এই প্রাথমিক পর্যায়কে মাথায় রেখে আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হব।

আমরা বিবর্তনের প্রথম পর্যায়রূপে বৈদিক যুগের কথা বলেছি। এই যুগকে ভারতীয় নারীদের স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই যুগের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষা ও স্বাধীনতা। ভারতের মেয়েরা এই যুগে পুরুষদের মতো একই অধিকারে সমাজে লালিত ও পালিত। সেখানে কোনো তারতম্য নেই। পুরুষের মতো নারীও উপনয়নের মাধ্যমে গ্রহণ করতে সক্ষম দীক্ষিত, ব্রতধারিণীর জীবন। আবার শিক্ষার শেষে স্কন্ধে তুলে নেয় গার্হস্থ্য

আশ্রমের ভার। যে আশ্রমে সেবা ও যজ্ঞে স্বামীর সমান অংশীদার নারী। বিদ্যালাভের পরে, আশ্রম বাসের পরে কেউ কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। পারেন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে। বৈদিক নারীর সার্থক উদাহরণ গার্গী ও মৈত্রেয়ী। আমরা বৃহদারণক্য উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে যে নারীর পরিচয় পাই তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু। স্বামীর কাছে উপবিষ্ট হয়েছেন, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু জ্ঞানলাভের পূর্বে যে অপরিহার্য শর্তটির উপর মৈত্রেয়ী চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হল, বৈরাগ্য। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজের আশ্রম-ধন বন্টিত করতে আগ্রহী ছিলেন ; তাঁর দুই পত্নী কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ীর মধ্যে। কিন্তু এই সাংসারিক ভাগ বাঁটোয়ারা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মৈত্রেয়ী। ব্রহ্মজ্ঞ স্বামীর কাছে আনত হয়েছেন একটি বৈরাগ্যময় প্রশ্নে 'যে ধন আপনি দান করবেন তা দিয়ে কি অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব?'

না সম্ভব নয়, কারণ এ দুটি বিরুদ্ধ শর্তে আবদ্ধ।

যে ধন আমাকে অমৃতত্ব দান করে না, সেই ধন নিয়ে আমি কী করব।

মৈত্রেয়ী উচ্চারিত এই বাক্য আজ বৈরাগ্যের মহাবাক্যরূপে বন্দিত। আমরা মৈত্রেয়ীর সঙ্গে গার্গীর কথা উল্লেখ করেছিলাম। যিনি জনক রাজার সভায় ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞানদান করেছিলেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী ছাড়া আমরা আরও অনেক ঋষিকন্যা ও ঋষিকার নাম পাই। যাঁরা তাঁদের চরিত্র মহিমায় উজ্জ্বল। আমরা পাই অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাকের দেখা। যাঁর মুখ দিয়ে দেবীসূক্ত উচ্চারিত হয়েছিল।

সমাজবিজ্ঞানীরা বৈদিক যুগকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। একটি স্বর্ণযুগ (Golden Age) অন্যটি ক্ষয়িষ্ণু স্বর্ণযুগ (Later Vedic Period)। এখানে মনে রাখা দরকার, ছোট সমাজের মধ্যে একটি সাম্যভাব থাকে যা ঋগ্বেদের সমাজের মধ্যে আমরা পাই। সমাজের বর্ণভেদ ও নানা স্তরবিন্যাস সমাজের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জটিল হয়েছে। বৈদিক যুগের শেষের দিকে (খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে চতুর্থ শতাব্দী) বৈদিক সমাজে এক ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হল। এইসময় আর্যাবর্তের মানুষ পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে নেমে এলেন নতুন কৃষিজমি এবং সংস্কৃতি সম্মেলনের জন্য। এই স্থানগত পরিবর্তন সমাজজীবনেও বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করল। বিশেষ করে অভিজাত মহিলাদের সামাজিক মর্যাদায় এল পরিবর্তন। কারণ ঋগ্বেদীয় গার্হস্থ্য ধর্ম তখন বেশি জটিল রূপ ধারণ করল। সৃষ্টি হল নানা গৃহ্যসূত্রের। এর ফলে বৈদিক যজ্ঞের শেষের দিকে ভারতীয় সমাজ, বিশেষ করে উত্তর ভারত আচারভিত্তিক সমাজে পরিণত হল। আচারভিত্তিক সমাজ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আচার পালনের জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এর ফলে নারীদের গৃহক্ষেত্রে যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল তা হল সংকুচিত। কারণ তখন শিক্ষাব্যবস্থা গৃহ থেকে ছোট ছোট আশ্রমে স্থানান্তরিত হল। সৃষ্টি হল গুরুকুল প্রথার। গৃহ থেকে বাইরে গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষাগ্রহণ সব মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ মেয়েদের গৃহে রাখতেই বেশি পছন্দ করা হত। সুতরাং ধর্মের গুহ্যমন্ত্রের রহস্য ধীরে ধীরে মেয়েদের কাছ থেকে দূরে চলে গেল। ধর্মীয় সাহিত্যের বিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারায় মেয়েরা সামিল হতে সক্ষম হল না। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে সৃষ্টি হল দুটি শ্রেণির। একটি শিক্ষিত, অপর শ্রেণি শিক্ষায় বঞ্চিত। বৈদিক যুগের মধ্যে এই বৈষম্য ধীরে ধীরে নারী সমাজের মধ্যে নিয়ে এল বৈষম্য। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা বেশি হল, নারীরা

নিজেদের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করতে থাকল গৃহে। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এল পরিবর্তন। অর্থনৈতিক, সামাজিক উভয় দিক দিয়ে নারী পড়ল পিছিয়ে। হল গৃহমুখী। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হল, একজন ব্রাহ্মণের তিনটি ঋণ আছে—মুনিদের প্রতি, দেবতাদের প্রতি এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি। পূর্বপুরুষদের অর্চনা ও পুত্র সন্তানের জন্য পুরুষের গুরুত্ব বৃদ্ধি করল। গৃহকর্মের জন্য মেয়েদের যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই তাদের শিক্ষা দেওয়া হত, ফলে ব্রহ্মবাদিনী বা উপনয়নের অনুষ্ঠান মেয়েদের জন্য আর রইল না। তার মধ্যে এই ঘর আর বাইরের দ্বন্দ্ব বয়ে চলল চিরকাল ধরে। যুগ এগিয়ে চলল।

বৈদিক যুগে নারীর সামাজিক অবস্থার বিচ্যুতি স্বামীজির ভাষায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে, "একটি স্বতন্ত্র পৃথক পুরোহিত শ্রেণির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এইসকল জাতির ভিতর নারীর ধর্মকৃত্যে সমানাধিকার পিছনে হটিয়া গিয়াছিল। সেমিটিক রক্তসম্ভূত অ্যাসিরীয় জাতির ঘোষণা প্রথমে শোনা গেল কন্যার কোনো স্বাধীন মত থাকিবে না, বিবাহের পরও তাহাকে কোনো অধিকার দেওয়া হইবে না। পারসিকেরা এই মত বিশেষভাবে গ্রহণ করিল, পরে তাহাদের মাধ্যমে উহা রোম ও গ্রীসে পৌঁছিল এবং সর্বত্র নারীজাতির উন্নতি ব্যাহত হইতে লাগিল।" সুতরাং স্বামীজি স্পষ্টভাবে বললেন পুরোহিত শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় তত্ত্বে জনগণের অধিকার নষ্ট হয়ে একটি শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়। আমরা যদি সংক্ষেপ করি তবে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়, প্রথমত উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি নারীকে সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্যুতি ঘটাল। দ্বিতীয়ত, পুরোহিত শ্রেণীর উৎপত্তি নারীকে ধর্মীয় অধিকার থেকে সরিয়ে দিল। তখন থেকেই নারী অবহেলিত হতে লাগল। তৃতীয়ত, গুরুকুল প্রথার উদ্ভব।

স্বামীজি দেখিয়েছেন ভারতীয় নারীরা ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার থেকে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে তাঁদের মধ্যে একটি পবিত্রতার ধারা ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। এই 'পবিত্রতার ধারণাই' ভারতীয় নারীকে মৌলিকতা দান করেছে। স্বামীজি ক্রমবিকাশের ধারণার বৈদিক যুগের পরে বৌদ্ধ যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপরেই গুরুত্বপূর্ণ হল বৌদ্ধযুগ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় এটা ছিল 'সন্ন্যাসীদের যুগ'। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা থাকলেও এই যুগের একটি প্রধান নেতিবাচক দিকের কথা বারংবার তিনি নির্দেশ করেছেন। এই দিকটি হল সন্ন্যাস-আশ্রমের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান। স্বামীজি বললেন, "বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিয়াছিল—গৃহত্যাগী যতিরাই শুধু 'নির্বাণের' অধিকারী। ...এই শিক্ষার ফলে সারা ভারত যেন সন্ন্যাসীদের একটি বিরাট মঠে পরিণত হইল। সকল মনোযোগ নিবদ্ধ রহিল শুধু একটিমাত্র লক্ষ্যে—একটিমাত্র সংগ্রামে—কি করিয়া পবিত্র থাকা যায়। স্ত্রীলোকের উপর সকল দোষ চাপানো হইল। এমনকী চলতি হিতবচনে পর্যন্ত নারী হইতে সতর্কতার কথা ঢুকিয়া গেল। যথা : নরকের দ্বার কি? এই প্রশ্নটি সাজাইয়া উত্তরে বলা হইল 'নারী'। আর একটি : এই মাটির সহিত আমাদের বাঁধিয়া রাখে কোন্ শিকল? 'নারী'। অপর একটি : অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ কে?—'যে নারী দ্বারা প্রবঞ্চিত।"

অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের মতে কেবল পুরোহিত শ্রেণি নয়, সন্ন্যাসী শ্রেণির প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক অবনতি হল। তিনি 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে বললেন 'সেই থেকে মোক্ষটা আদৃত হল ধর্মটা অবহেলিত।' ভারতের সমাজ কাঠামোয় চতুরাশ্রমের প্রতিটি

আশ্রমকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পরে কেবলমাত্র সন্ন্যাস আশ্রমই গুরুত্ব পেল, অন্য আশ্রম গুরুত্বহীন হল। ফলে সংযমের ধারণা সমাজজীবনে এত বেশি গুরুত্ব পেল যে স্বাভাবিকভাবে নারীর ধারণার কেবল অবনতি হল না ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারী একটি অতি ঘৃণ্য পদার্থরূপে গণ্য হতে লাগল। নারীর সামাজিক সম্মান অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌছাল। স্বামীজির মতে ভারতীয় নারী সমাজের মধ্যেই কেবল অবক্ষয় দেখা যায়নি, এই অবক্ষয় সমস্ত ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হল। স্বামীজি বলছেন, "পাশ্চাত্যের মঠসমূহেও অনুরূপ ধারণা দেখা যায়। সন্ন্যাস প্রথার পরিবিস্তার সব সময়েই স্ত্রীজাতির অবনতি সূচিত করিয়াছে।"

আমরা বৈদিক যুগের পরে বৌদ্ধযুগের প্রসঙ্গকে তুলে এনেছি। কিন্তু এই দুই যুগের মধ্যবর্তী একটি অংশ বর্তমান। এটি হল মহাকাব্যের যুগ। এই মহাকাব্যে আমরা দেখলাম নারী গৃহকেন্দ্রিক জীবনধারায় অভ্যস্ত হলেও রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ। তার সঙ্গে সীতার পতিপ্রেম, সাবিত্রীর সাহস, আর দময়ন্তীর প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব সবই আজও আমাদের কাছে আদর্শ। এর সঙ্গে রয়েছে নানা ঋষিকন্যাদের কাহিনী যাঁরা শিক্ষায় নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। মহাকাব্যের পরে বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধযুগ থেকে গুপ্তযুগ, এই সহস্র বছরের কালসীমায় সমাজে নারীর অবস্থানগত পার্থক্য ঘটেছিল। বৌদ্ধযুগে নারী সন্ন্যাস লাভের অধিকারী হলেন ঠিকই কিন্তু এই সময়ের পরে বিভিন্ন সূত্র সাহিত্যের রচনা হয়েছিল। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, পরাশর, জৈমিনি ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ নারীর উপনয়নের অধিকারের মতো বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারও কেড়ে নিলেন। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ্যপ্রথার সংকোচ হয়েছিল, কিন্তু গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যকুল আবার ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীরা সন্ন্যাসীদের অধীনে থাকায় সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে প্রথম ব্যভিচার প্রবেশ করল। সন্ন্যাসের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধায় গৃহস্থ সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত হতে লাগলেন। যত রূপগুণবতী নারী—হয় বারবনিতা, নয় সন্ন্যাস আশ্রমে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। গার্হস্থ্যধর্ম ব্যাহত হতে থাকল, কারণ আদর্শ গৃহিণীর অভাব হতে লাগল। এইসময় গার্হস্থ্য আশ্রমকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য সমাজ মন থেকে উঠে এল বাৎসায়নের কামসূত্র নামক গ্রন্থ। বিষ্ণুপুরাণ, আপস্তম্ভের গৃহ্যসূত্রে মেয়েদের বাল্যবিবাহের উপর জোর দেওয়া হল আর হারীত ও বৃহস্পতি স্মৃতিগ্রন্থে জানালেন বিধবাদের সতীদাহ প্রথার উপযোগিতা। এই দুই প্রথাই উনবিংশ শতাব্দীর ক্ষতরূপে দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় ভারতে এল মধ্যযুগ। মুসলমান শাসন, বিদেশিদের আক্রমণ সমাজের নারীমনকে স্তব্ধ করে রেখে দিল। নারী সমাজের অগ্রগতি ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে গেল।

আমরা আলোচনার প্রথম অংশে উল্লেখ করেছি সমাজবিবর্তনের ধারা ঢেউ-এর গতিকে অনুসরণ করে। একবার ওঠে আর একবার তার মুখ পতনের দিকে। বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়কে আমরা স্বর্ণযুগ বলছি। আবার এই যুগের শেষ অধ্যায়ে আসছে সংকীর্ণতা। এই অবনতির ফল নারীর সমাজের কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠছে গৃহ আর ভাবক্ষেত্রে গড়ে উঠছে পবিত্রতা। নারী তখন সন্তান পালনে বিশেষ করে পুত্র সন্তানের মাতারূপে সামাজিক সম্মান খুঁজে পাচ্ছে। আর তারপরেই এল মহাকাব্যের যুগ। সেখানে গৃহক্ষেত্রেই নারী অসাধারণ

চরিত্র হয়ে ফুটে উঠছে। সে গৃহের ধারণ শক্তি। দাসী নয় সম্রাজ্ঞী। কিন্তু মহাকাব্যের যুগেরও অবসান হয়েছে এসেছেন বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধযুগের সূচনায় দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের জন্য তথাগত বুদ্ধ কতই না করুণাময়। এই যুগে উঠে আসছে, অম্বাপালী, মল্লিকার মতো আদর্শ গৃহী আবার পটাচারা, ক্ষেমা, গোতমীর মতো আদর্শ সন্ন্যাসিনী। কিন্তু আমরা দেখেছি বুদ্ধের সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতি অত্যধিক আধিক্য নারীকে আবার অস্তিত্বের সংকটে ফেলেছে। আর যখনই অস্তিত্বের সংকট উপস্থিত হয়েছে তখনই নারী নিজেকে প্রকাশের একটি পথ নিজেই করে নিয়েছে। এবার নারীসমাজ কর্মক্ষেত্ররূপে গৃহ এবং সন্ন্যাস দুটি আশ্রমকেই বেছে নিয়েছে। আর ভাবগত ক্ষেত্রে গড়ে তুলেছে 'জননীর আদর্শ'।

তাহলে বৈদিক যুগ থেকে নারী সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় আদিম অবস্থা থেকে বৈদিক ভারত হয়ে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করল (১) পবিত্রতার ধারণা, (২) জননীর আদর্শ। ক্রমবিকাশের ধারায় সংকটের মুহূর্তে দুইভাবে ভারতের নারী বিকশিত হতে চেয়েছে। দুটি ভাবই জাতীয় জীবন ও চরিত্রে গভীরভাবে অনুস্যূত হয়েছে এবং সমগ্র ভারতীয় নারীর জীবনাদর্শকে পরিচালিত করেছে।

স্বামীজির আলোচিত বিবর্তনের ধারা উল্লেখ করার পর আমরা ভগিনী নিবেদিতার আলোচনাকে গুরুত্ব দেব। নিবেদিতা Civic Ideal and Indian Nationality, The Present Position of Women প্রবন্ধে বিশ্বের নারীসমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত পারিবারিক আদর্শে পরিচালিত নারী। দ্বিতীয়ত নাগরিক আদর্শে পরিচালিত নারী। এই আলোচনায় নিবেদিতা দেখিয়েছেন পারিবারিক আদর্শে পরিচালিত নারীর জীবনধারার কেন্দ্রবিন্দু পরিবার। নাগরিক আদর্শে পরিচালিত নারীসমাজ পরিবারের চেয়ে নাগরিক বা সমাজচেতনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ নারীসমাজের বিবর্তনের ধারাকে 'জননীর আদর্শ' ও 'পবিত্রতার ধারণা—এই দুই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতা 'পারিবারিক আদর্শ' ও 'নাগরিক আদর্শ' এই দুটি আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন বিশ্লেষণে আমরা এই চারটি ভাবগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ও পরিপূর্ণতা দেখতে চেষ্টা করব।

ভারতের তাবৎ নারী আদর্শের সমষ্টি বিগ্রহ হলেন শ্রীমা সারদা। এত লালিত্যময় সমষ্টিরূপ আমরা আগে কখনো দেখিনি। বিধাতার নিপুণ হস্তে তৈরি শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি শ্রীমা সারদা। আমরা বিবর্তনের ধারায় যে ভাবগত আদর্শকে উঠে আসতে দেখেছি মায়ের জীবনে তা কীরূপে প্রকাশিত হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে দেখে নেব বিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে ভারতীয় নারীসমাজ মায়ের সমসাময়িক অবস্থায় কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। মায়ের সামাজিক পটভূমির কাল ছিল উনবিংশ শতাব্দী। ঐতিহাসিকদের মতে উনবিংশ শতাব্দী হল নারীজাগরণের কাল। জাগরণ বলতে কী বোঝায়? নতুন আদর্শে অনুরণিত হওয়া? না কি পুরাতন আদর্শে সঞ্জীবিত হওয়া? এই প্রশ্ন সেই যুগের মধ্যে লালিত হয়েছিল। এই প্রশ্নের সমাধানরূপে স্বামীজি দেখালেন প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের অপূর্ব সমন্বয়কে। মায়ের জীবনের মধ্যেও সেই প্রাচ্য আর প্রতীচ্য ভাব সমন্বিতভাবে প্রকাশিত হল। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকদের মতে উনবিংশ শতাব্দী নারীসমাজের সংস্কার আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কাল।

সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিবারণ—সংস্কারকগণ তাঁদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন নারীসমাজের এই উল্লেখযোগ্য সংস্কারে। নারী তখন একটি বিলাসের বস্তু ব্যতীত আর কিছু নয়! কৌলীন্য প্রথার কুফল তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তারিত। 'ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহলে' লেখিকা বলছেন, ভারী ভারী গহনায় আচ্ছাদিত হওয়া আর পরনিন্দা ও পরচর্চা ব্যতীত আর কিছু কাজ ছিল না মেয়েদের। বিয়ের সময় তাদের স্ত্রীধনরূপে প্রাপ্য হল ভারী সোনার গহনা। যেগুলিকে সোনার ঢিল ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না!' সমসাময়িক নারী সমাজ সম্বন্ধে ইতিহাস এ তথ্য প্রদান করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবগঙ্গায় স্নাত বা স্পষ্টভাবে বলতে গেলে শ্রীমায়ের চারপাশে আমরা যেসব নারী চরিত্রগুলির দেখা পাই তাঁরা ভিন্ন চেতনায় জাগ্রত ছিলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে অনায়াসে বলা যায় যুগের আপাত কালিমার নীচে ফল্গুধারার মতো চিরন্তন ভারতীয় নারীর ভাবাদর্শ বহমান ছিল। তাঁদের ঈশ্বরসর্বস্ব জীবনের পিছনে সামাজিক চেতনা একেবারেই ছিল না, একথাও বলা যাবে না। না হলে কিশোরী সারদা সকলের জন্য স্বামীকে কী করে বলতে পেরেছিলেন, 'তুমি তো আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।' যে যুগে নারীরা অশিক্ষা, অবিচারে অবদমিত ছিল, যে যুগকে পীড়ন ও নারীর স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে কলঙ্কিত যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই যুগে একটি গ্রাম্য বালিকার মধ্যে নিজেকে বিস্তার করে দেওয়ার ক্ষমতা, শিক্ষা ও শক্তি এল কোথা থেকে? সমাজবিজ্ঞান শূন্য থেকে কোনো সৃষ্টি হওয়াকে অস্বীকার করে। সুতরাং একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে—নারী পীড়নের তলায়, কলঙ্কের নীচে, এ শুদ্ধভাব, চিরন্তন ভারতীয় নারীর ভাবনা সর্বদাই ফল্গুধারার মতো বহমান ছিল। যুগদ্বন্দ্ব, নারীদের মানসিক ও সামাজিক অস্থিরতা সেই শুদ্ধ ফল্গুধারাকে উৎসারিত করল সকলের সম্মুখে। এই শুদ্ধস্রোতস্বরূপ প্রবাহিনীর নাম সারদা সরস্বতী।

এই প্রবাহিনীর দিকে তাকিয়ে স্বামীজি শিকাগোয় তাঁর প্রাচ্য নারী শীর্ষক ভাষণে বলে ছিলেন, 'পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই পূর্ণ নারীত্ব।' নারী সভ্যতার ধারাপথে যে পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল তার ভাবমহিমার সমন্বিতরূপের দিকে এবার আমরা দৃষ্টি দেব। 'জননীর আদর্শ' ও 'পত্নীর আদর্শ' ভারতীয় নারীকে একটি সূত্রে বেঁধে রেখেছিল, তা হল পবিত্রতা। মাতা দেবীতুল্যা কেন? তিনি সন্তানের জন্য সংযমে সংবৃত থেকেছেন। তাঁর ত্যাগের তুলনা কোথায়? শ্রীমায়ের জীবনে দেখি তিনি 'জননীর আদর্শ' ও 'পত্নীর আদর্শ'কে সংযুক্ত করেছেন একটি মূল আদর্শ দিয়ে—তা হল পবিত্রতা, যা তাঁর জীবনের ভিত্তি। এই পবিত্রতা ও সংযমের জন্যেই তিনি ছিলেন স্বামীর পূজ্য, মানবকে দেবতা হতে সাহায্য করে তিনিও হয়েছিলেন দেবী। তবু তাঁর এই দেবীত্ব তাঁকে উদ্ধত করেনি, শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াতলে তিনি অনায়াসে থাকতে পেরেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ তাঁর গ্রন্থ 'শ্রীমা সারদাদেবীতে' শ্রীমায়ের পত্নীরূপে নহবতে বাসের অপূর্ব দিনগুলি বর্ণনা করছেন যে অধ্যায়ে সে অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন, 'বিন্দুবাসিনী'। নিজেকে যেন একটি বিন্দুতে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদার ভালোবাসার টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছিল নহবতের জীবন। বড় প্রাণের টান ছিল দুজনের। ঠাকুরকে শিশুর মতো ভুলিয়ে রাখতেন সারদাদেবী। স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'ঠাকুরের ভাত বাড়বার সময় (দুই হাত দিয়ে দেখিয়ে) ভাতকে টিপে টিপে কম

দেখাবে বলে সরুটি করে দিতুম। তিনি বেশি ভাত দেখলে ভয় পেতেন।' ...পঞ্চবটীতে তখন একজন ব্রহ্মচারী থাকত, মনে বড় ভয় হত যদি ওঁর কোনো মন্দ করে ; তাই দশ টাকা দিতে গেলুম যাতে খুশি থাকে। তা ঠিক টের পেয়েচেন, অমনি নবতে এসে বললেন, "আমার মা আছে, কে মন্দ করবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে চিন্তা শ্রীমায়ের সাধনায় পর্যবসিত হয়েছিল। রামচন্দ্র মুখুজ্যের কন্যা সারদা থেকে তিনি 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' সারদায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এই আত্মমগ্নতার উৎসভূমি ছিল স্বামীর প্রতি পবিত্র নিষ্কাম ভালোবাসা। আমরা জনক নন্দিনী সীতার কথা জানি। তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। যিনি সার্থক পত্নী ঠিকই কিন্তু আমাদের মা ঠাকরুনের পত্নীপ্রেমের আদর্শের মধ্যে অপূর্বভাবে মিশ্রিত হয়েছে মাতৃত্ব! তিনি নারীর সমস্ত ভাবকেই মাতৃত্বের রসে সঞ্জীবিত করেছিলেন। তার সঙ্গে ছিল পৌরাণিক যুগের হর-পার্বতীর মতো গুরু শিষ্যার নিগূঢ় সম্পর্ক। গুরু অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে ডুবে আছেন তাঁর ছোট্ট ঘরে। ভিত্তি তৈরি করছেন ভাবী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের আর শিষ্যাকে দেখি নহবতের ছোট্ট ঘরে গৃহকর্মে ব্যাপৃতা। কিন্তু মন পড়ে আছে সেই ছোট্ট ঘরে। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন বালক সারদাপ্রসন্ন। একদিন বালক সারদাপ্রসন্নকে ঠাকুর আদেশ করলেন নহবত থেকে গাড়ি ভাড়ার চার পয়সা যেন সংগ্রহ করে নেয়। সারদাপ্রসন্ন নহবতের দরজার গোড়ায় গিয়ে দেখলেন ভাড়ার চার পয়সা রাখা আছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মা বলছেন, "হ্যাঁ বাবা, কথা সত্যি। আমি নবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও আমার মন সর্বদা ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকত। অতদূর থেকে খুব আস্তে আস্তে বললেও আমি সব কথা শুনতে পেতুম। ঠাকুরের মুখে ঐ কথা শুনেই আমি চারটি পয়সা রেখে দিয়েছিলুম। আর একদিন ঠাকুর নরেনকে খেতে বলেচেন। আমি নবত থেকে শুনেই, নরেন যা খেতে ভালোবাসে—ছোলার ডাল চড়িয়ে দিয়ে ময়দা মাখচি। ঠাকুর এসে দেখেন, তিনি যা বলতে এসেচেন, আমি আগে থেকেই তাই কচ্চি।" বিন্দুবাসিনী মা অসাধারণভাবে ঠাকুর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। পরবর্তীকালে নানা সাংসারিক ঝামেলায় অতিষ্ঠ হয়ে মা একদিন বললেন, 'আমি তো সেই পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে ছুঁয়েছি! আমি না হয় কিছু বুঝি না, তিনিও তো আমাকে ছুঁয়েছেন? তবু আমার এত জ্বালা?' স্বামীর দেবত্ব সম্বন্ধে এ এক অসাধারণ প্রকাশ! কিন্তু এখানে বলতেই হবে, শ্রীমা কিন্তু আদর্শ পত্নী হয়েই থেমে থাকেননি, আদর্শ মাতারূপেও প্রকাশ হয়েছে তাঁর। দক্ষিণেশ্বরে প্রথমদিকে মায়ের সঙ্গিনী খুব বেশি ছিল না। গঙ্গায় মাছ ধরতে আসা কিছু জেলের মেয়ে যারা তাদের চুবড়িগুলি নহবতে রেখে গঙ্গায় স্নান করতে যেত। এইসময় এক বৃদ্ধার আনাগোনা শুরু হল। যৌবনে তাঁর স্বভাব ভালো ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর অনুশোচনা হয় ও হরিনাম করতে শুরু করে সেই বৃদ্ধা মায়ের কাছে আসতেন এবং মা'ও তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। একদিন ঠাকুর সেই বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ওটা এখানে কেন?' মা উত্তর দিলেন, 'ও এখন ভালো কথাই তো কয়, হরিকথা কয়, তাতে দোষ কী?' তবু শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়েছিলেন, 'ছি! ছি! বেশ্যা!' ঠাকুরের এই ধিক্কার শুনে আমাদের মন স্তব্ধ হয়ে যায়, মা কিন্তু একটুকু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়লেন না। বৃদ্ধা তাঁকে মা বলে ডাকেন! এই মাতৃত্বের এলাকা তাঁর নিজস্ব, এখানে তিনি স্বামীকেও প্রবেশ করতে দেননি। পরবর্তীকালে যোগীন মা একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মা আপনি সব বিষয়ে ঠাকুরের অনুগত হলেও কোনো কোনো

ক্ষেত্রে তাঁর কথা মানেন না কেন? শ্রীমা হেসে জবাব দিয়েছেন, 'তা মানুষ কি সব কথাই মেনে চলতে পারে? তা বাপু যাই বলো, কেউ মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।"

একইসঙ্গে চরম 'জননীর আদর্শ' ও চরম 'পত্নীর আদর্শ' নিজ জীবনে প্রকাশ করেছিলেন। একদিকে হয়েছিলেন 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' অপরদিকে সত্যিকারের মা—এই দুটি ক্ষেত্রের একটি সমন্বয়সূত্র, যার নাম পবিত্রতা। কী দৈহিক পবিত্রতা, কী অন্তরের—দুটি দিক দিয়েই তিনি ছিলেন অনন্যা। দক্ষিণেশ্বরে নিজের সাধনজীবন সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, 'সেসব কী দিনই গিয়েছে, মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি, 'তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।" বৃন্দাবনে গিয়ে বাঁকে বিহারীকে বলেছেন, 'তোমার রূপটি বাঁকা মনটি সোজা, তোমার মতো মনটা আমার সোজা করে দাও।" পরবর্তীকালে গোলাপ মা কোনো কারণে অভিযোগ করলে মা উত্তর দিয়েছেন, 'আমি যে দোষ দেখতে পারি না গোলাপ!' আবার কাউকে কাউকে বলেছেন, 'অনেক প্রার্থনা করে তবে দোষ দেখাটা গেছে!' কী অসাধারণ প্রকাশভঙ্গি! মায়ের মতো আত্মবিলয় সেই বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রকাশভঙ্গি নারী সমাজের ইতিহাসে বিরল! মায়ের প্রার্থনাগুলি এক একটি সংগীতের মতো। যার প্রতিটি অক্ষরে ঝরে পড়ে পবিত্রতার ধারা।

ভারতের নারী সমাজ তার বিবর্তনের ধারায় যে দুই আদর্শকে অবলম্বন করেছিল তা কেমনভাবে মায়ের জীবনে রূপায়িত হয়েছে তা আমরা যেমন দেখলাম, ঠিক তেমনভাবেই আরও দুটি ক্ষেত্রকে দেখতে চেষ্টা করব। নাগরিক আদর্শ আর পারিবারিক আদর্শ—নিবেদিতা যেভাবে বিশ্বের নারী সমাজকে ভাগ করেছেন। শ্রীমা সারদাদেবী যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা অতি গ্রাম্য অতি দরিদ্র এক পরিবার! সেই পরিবারে নারীর যা যা ভূমিকা পালন করা দরকার মা সবটাই নিপুণভাবে পালন করেছেন। কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে, স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে—প্রতিটি রূপেই তিনি অনন্যা! কন্যারূপে তিনি পিতামাতার সংসারের হাল ধরেছেন। ভাইদের মানুষ করা, ধান ভাঙা, মুনিষদের খাবার দিতে মাঠে যাওয়া, তুলো থেকে পইতে কাটা! সব কাজই তাঁর আয়ত্তে ছিল। পরবর্তীকালে ভায়েদের সংসারের মধ্যমণি হয়ে থেকেছেন। তাঁর জীবনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, মা যে সংসারে থাকছেন তা তাঁর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী চরিত্রের! কিন্তু তাতে মায়ের জীবনধারায় কোনো পরিবর্তন আসছে না। তিনি অনায়াসে সেখানে বিচরণ করেছেন! ভাইঝিদের বিবাহ দেওয়া, সংসারের আত্মীয় পরিজন, যেমন খুড়ো নীলমাধব—মা তাঁকে কতই না শ্রদ্ধা করতেন, ভালো বাসতেন। ভালো ভালো খাবার খুড়োকে খাওয়াতেন। এতে কোনো ভক্ত আপত্তি জানালে মা বলেন, 'দেখো বাবা. খুড়ো আর কদ্দিন! এখন ভালো করে খাইয়ে দাও। আমরা পরে কত খেতে পারব।' নিজের পারিবারিক কর্তব্য ও তার ভূমিকা সম্বন্ধে খুব সচেতন মন্তব্য করেছেন। মা বলছেন, "আমরা যেমন খুড়ো ইত্যাদির সেবা করেছি আজকালকার মেয়েরা অত করে না!' মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি গৃহ থেকে পুষ্ট হয়ে বাহির পৃথিবীর দিকে প্রসারিত হয়েছে। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন পরিবারের ভূমিকা সম্পূর্ণ না হলে কখনো নাগরিক ভূমিকা সম্পূর্ণতার উপর গড়ে উঠতে পারে না। এখানে শ্রীমা সারদা দেবী সমাজবিজ্ঞানের প্রজ্ঞা নিয়ে সমাজ জীবনকে বিশ্লেষণ

করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, সুন্দর, সার্থক, গৃহ-ই সুষ্ঠু সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান। তাই নাগরিক আদর্শের সচেতনতা পারিবারিক আদর্শেরই সম্প্রসারিত রূপ।

ভক্ত প্রবোধবাবু, (তিনি পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।) জয়রামবাটিতে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। কথায় কথায় তৎকালীন নানা বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসঙ্গ উঠে এল। মা বললেন, 'দেখো এখন যাতায়াতের কত সুবিধে হয়েছে! রাসবিহারী একদিনে কলকাতা থেকে জয়রামবাটি পৌঁছাল! আর আমরা গিয়েছি কত কষ্ট করে!' প্রবোধবাবু এই কথা শুনে কিছুটা উত্তেজিত। তিনি তৎকালের নানা উন্নতি, যেমন রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির কথা বলতে লাগলেন। মা সব শুনলেন। তারপর ছোট্ট একটা মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, এখন অনেক উন্নতি, অনেক সুবিধে হয়েছে বটে কিন্তু অন্ন বস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। এখন একটা ছোট ছেলেও অভাবের কথা জানে! আগে এই অন্নাভাব ছিল না।' মা কৃষিভিত্তিক সমাজের মূল খাদ্যশস্য ধানের প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন। ভারতের স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা বা 'ভিলেজ কমিউনিটি' (Village Community) ইংরেজ শাসনের ফলে পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছিল। শষ্যের অর্থকরী দিকটি প্রধান হয়ে উঠল। মানুষ ধান বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করত। পূর্বের মরাইতে সংগ্রহ করে রাখার অভ্যেস চলে গেল। এর ফল হল দুর্ভিক্ষ। মা এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মায়ের সঙ্গে ভক্ত প্রবোধবাবুর কথোপকথনের কিছু অংশ এরকম ছিল,

মা—পূর্বে মুনিষদের (মজুরের) দাম চার পয়সা ছিল। আমার মনে আছে, এতখানা একটা কাগজে লিখে কলকাতায় লোক পাঠাত। সে হেঁটে যেত। তখন ডাক ছিল না।

প্রবোধবাবু—এখন ডাক হয়ে সুবিধে হয়েছে মা।

মা—তা হয়েছে। পূর্বে যা ছিল তাই বলেছি। এক টাকায় অনেক তেল পাওয়া যেত। এখন ধান এক আঁজলাতেই টাকা বলে, সকলে ধান বেচে দিচ্ছে, টাকা বেশি পাওয়া যায় কিনা! বাকি সামান্য যা থাকছে তাও তো রাখতে পারবে না, কেননা পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। খেতে হবে তো? "প্রসন্ন (বড় মামা) চার পাঁচশ টাকার ধান বেচে দিলে। তাঁর কিছু ধান চুরি গিয়েছিল। রাজ ঘোষও ধান বেচে ফেলেছে। তাঁর অনেক ধান। তাঁকে নাকি চিঠি দিয়েছিল—'তুমি এত টাকা দাও, না হলে তোমার বাড়িতে চুরি হবে।'" (মা. ক ১২৯)

মা স্বামী শান্তানন্দকে বলছেন, দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গে। মা বলছেন, "লোকে খেতে পাচ্ছে না, আবার যার ঘরে ছেলেপিলে আছে তার আরও কষ্ট। এই তো কষ্ট আরম্ভ হয়েছে। বর্ষা হয়ে ধানচাল হলে তবে তো কষ্ট যাবে। কে সাহেব-নাকি এসেছিল কলকাতায়—যেখানকার ধান চাল সেখানে থাকবে, আইন করবে বলে, সে নাকি চলে গেছে।"

১৯১২ নোয়াখালির বন্যা ও তারপরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ভগিনী নিবেদিতাকে বিচলিত করে। তিনি বরিশালের বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে নোয়াখালি পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন বা ফিল্ড স্টাডির পর নিবেদিতা দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে ঠিক এই ক্ষেত্রটিকে দুর্ভিক্ষের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু নিবেদিতা সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। আর মা! তিনি তো মাটির দাওয়ায় বসে সেই চেতনার অধিকারী, তরকারি কুটতে কুটতে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন। এ এক বিচিত্র উপস্থিতি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আসছে, কৃষির সঙ্গে ছোট ছোট শিল্পগুলি ভেঙে যাচ্ছে—এ বিষয়টি মায়ের চিন্তায় স্পষ্ট ধরা

পড়েছিল। তিনি ভক্তদের বলেছিলেন, চরকা পেলে আমিও চরকা কাটি!' কেবল তাই নয় তৎকালীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতো তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মা সচেতন ছিলেন। তাই দেখি স্বদেশি আন্দোলন মায়ের আঁচলের তলায় পরিপুষ্ট হয়েছে। কী নির্ভীক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর এক সন্ন্যাসী সন্তানকে কোনো একসময় স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য ব্রিটিশ পুলিশ অত্যাচার করে চলে। সেই সন্তানের দুর্বিষহ জীবনে মা এনেছিলেন নির্ভীক আদর্শের প্রলেপ! তিনি সন্তানকে ডেকে বললেন, 'দেখো বাবা, ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থেকো! তোমার অস্তিত্ব থাকবে, ব্যক্তিত্ব থাকবে না।' মায়ের এই উপদেশে যুবক সন্তান নির্ভয়ে সহ্য করেছিলেন সব অত্যাচার! ব্রিটিশ সরকার রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনলে স্বামী সারদানন্দজিকে সে বিষয়ে প্রতিবাদ করতে বলছেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কতবার স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত ছিল এমন সন্তানদের মঠ থেকে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন এসেছে, সে আবেদনে কর্ণপাত করেননি মা। অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর গড়ে ওঠে সমাজ। সেই সমাজে কিছু বাস্তব বিষয় থাকে যা মেনে চললে সমাজ সুন্দর হয়। সে যুগে দাঁড়িয়ে মা পরিবার পরিকল্পনার কথা বলেছেন। নারী শিক্ষার কথা বলেছেন, আর বলেছেন জাতপাত ও নানা ধর্মের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিলোপ সাধনের কথা। জয়রামবাটি অঞ্চলের গরিব মুসলমান শ্রেণিকে মা যেভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন তা আজকের স্বাধিকারের ধ্বজাধারী, সমাজ সংস্কারক নারীদের শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে! মহাভারতে আমরা যজ্ঞ থেকে সৃষ্ট যাজ্ঞসেনীকে দেখি যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে অধর্মের বিনাশের জন্য ধর্মভাবনাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। মহাভারত অনুযায়ী দ্রৌপদী নাকি হস্তিনাপুরের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখতেন! অর্থাৎ যা একটি রাজ্যে অর্থমন্ত্রী করে থাকেন। মহাকাব্যের নারীদের মধ্যে এই রাজনৈতিক চেতনার দেখা আমরা পাই, যুগ বিবর্তনের ধারা বেয়ে মায়ের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

বিবর্তনের ধারায় যে চারটি আদর্শের কথা আমরা আলোচনা করলাম যুগধর্মপাত্রীরূপে আরেকটি আদর্শকে মা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেটি হল নারীর আধ্যাত্মিক আদর্শ। বৌদ্ধযুগে আমরা দেখেছি ভিক্ষুনিরা ভিক্ষুর উপর নির্ভরশীল। মা কিন্তু তাঁর 'সঙ্ঘজননী' ভূমিকাটি নিপুণভাবে পালন করে আধ্যাত্মিক জীবনে, বিশেষত মঠ জীবনে নারীর স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। নারীমঠের স্বাতন্ত্র, গাম্ভীর্য, তাৎপর্য, তার বীজ—মা তাঁর জীবদ্দশাতেই রোপণ করেছেন। মায়ের কাছে সন্ন্যাসিনী ও গৃহকর্মে ব্যাপৃতা নারী দুজনের জন্যেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির কপাট উন্মুক্ত ছিল। নিজে কত সুচারুভাবে গৃহকর্ম সম্পাদন করেছেন। শেষবার মা যখন জয়রামবাটি থেকে কলকাতায় আসছেন, তখন তাঁর জ্বর! গাড়িতে উঠতে যাবেন! এমন সময় মনে পড়ল কালকের পান্তা ভাত রয়েছে! সেটি তিনি পাশের বাড়ির একজনকে দেবেন বলে রেখেছেন, কিন্তু দিতে ভুলে গিয়েছেন। সেবক বললেন, মা আমি দিয়ে দেব! মা কিন্তু শুনলেন না! না বাবা আমিই দেব। সারদা মঠের প্রথম প্রেসিডেন্ট প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা মাতাজিকে জনৈক সন্ন্যাসিনী একবার বলেন, 'মা আপনি কী সুন্দর গুছিয়ে রাখেন!' মাতাজি হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'রাখব না! গুছুনির কাছে ছিলুম যে!'

বৈদিক যুগের ঋষিবাকের আত্মঘোষণা, উপনিষদের মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্য! মহাকাব্যের সীতার মতো পতিনিষ্ঠা ও পবিত্রতা, দময়ন্তীর মতো মানবতার প্রতি নিষ্ঠা ও সাহস! সাবিত্রীর মতো প্রেম, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতো বৈরাগ্যপূর্ণ মন, আর জগতের হিতের প্রতি কামনা সবকিছু মায়ের মধ্যে এসে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। মা তাঁর অবগুণ্ঠনের মধ্যে ভারতের নারী সমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করেছেন। সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে মাতৃত্বের বাঁধনে বেঁধেছেন! তারপর অতি সাধারণ বেশে বসেছেন সেই মাটির দাওয়ায়। মেলেছেন উদাস দৃষ্টি। যে দৃষ্টি গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে দেশ দেশান্তর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আবিশ্বে! নীরবে নিভৃতে তা আঘাত করে চলেছে মানুষের মনের মণিকোঠায়। ধীরে ধীরে বলে চলেছে 'আমি এসেছি'। দেখো সেই আদিম মানুষের দিকে তাকিয়ে যারা জানত না বিজ্ঞান, প্রকৃতির রহস্য তাদের কাছে অজানা ছিল। শুধু একটি সম্পর্ককে তারা আবিষ্কার করেছিল, সেই সম্পর্ক হল মাতৃত্বের সম্পর্ক সেই একটি বাঁধনই তাদের জীবনে এনেছিল অমৃত, আনন্দের উৎসভূমি ছিল তা। আর আজ? আজ বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ আমরা, কিন্তু আজও পৃথিবী চায় একজন মাকে। যিনি হবেন বিশ্বপ্রেমের উৎসধারা! আমি সেই বিস্তারের বার্তা, মাতৃত্বের স্বাদ দিতে এসেছি। আমার কাছে এসো, তোমরা। বিশ্বের অন্তরে করাঘাত করে সেই মাতৃত্ববোধের জয়গান গেয়েছেন তিনি। বিবর্তনের ধারাপথ সভ্যতাকে এই পর্যায়েই এনে দিয়েছে! নারীর সমস্ত ভাবকে আঁচলে বেঁধে সে আঁচল পিঠে ফেলে মা দাঁড়িয়ে আছেন জয়রামবাটির নতুনবাড়ির দরজায়, ভক্তদের সেই পরিচিত ভঙ্গি। সামনে উপস্থিত হলেই যিনি বলবেন, 'বাছা! আমিই মা!' দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, পিছনে তাঁর অতীত ভারত, সম্মুখে ভবিষ্যৎ। সত্যিই তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি? নাকি নতুন আদর্শের অগ্রদূত? নাকি সেই মহাসাগর? যেখানে সমস্ত নদী তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি ভবিষ্যৎ গড়তে গেলে তার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতেই হবে। কারণ তিনি অতীতের সার্থক সমষ্টিরূপ।

পঁয়তাল্লিশ

ভারতের শক্তিসাধনার ধারা ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

ভূমিকা

'শক্তি' কথাটির সাধারণ অর্থ 'ক্ষমতা', 'উৎসাহ'। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে বলেছেন, 'ও আমার শক্তি!' কখনো যুবক লাটুকে ধ্যানের প্রচেষ্টায় বিরত করে বলেন, 'কার ধ্যান করছিস রে লাটু! যার ধ্যান করছিস তার তো রুটি বেলার লোক নেই। যা, নহবতের ঘরে যা, রুটি বেলে দে গে।' অবতারের সঙ্গী অবতারী। ভগবানের পাশে স্বয়ং ভগবতী। নিজের স্বরূপকে নিজেই ব্যক্ত করেছেন কখনো, কোনো ভক্ত প্রশ্ন করেছেন, 'মা, ঠাকুরকে সবাই ভগবান বলে, তবে আপনি কে?' মা সহজ উত্তর দেন, 'কেন আমি ভগ্‌বতী!' ঘটনাটি যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত তবে আমাদের স্মরণ মননের কোনো অসুবিধা থাকত না, কিন্তু মায়ের স্বরূপ কথনের বিপরীত দিকও রয়েছে। কোনো ভক্ত তাঁকে 'জগদম্বা' বলে স্তুতি করলে তিনি বিরক্ত হন, 'দয়া করে তিনি পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন তাই বর্তে গিয়েছি। তুমি জগদম্বা তুমি হেন—বেরোও এখান থেকে।' জয়রামবাটির চৌকিদার অম্বিকাদাদা বলে, 'লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী কত কিছু বলে, কই আমরা তো কিছু বুঝতে পারছি না!' মা সহাস্যে উত্তর দেন 'তোমার বুঝে দরকার নেই। তুমি আমার অম্বিকাদাদা, আমি তোমার বোন।' একদিন মা নিজেই ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, 'আমাকে তোমার কী মনে হয়!' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন, আর সম্প্রতি তিনি এই শরীরের পদসেবা করছেন, সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সদা সর্বদা সত্য সত্যই দেখতে পাই।' শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দময়ী আমাদের জননী সারদা সত্যিই কে! 'কেন উপনিষদের' মধ্যে দেখি দেবতারা দেবীর রূপ দেখে বিস্মিত—কে ইনি! ভক্তমনের কাছে ছোট্ট শব্দে ধরা দিয়েছেন 'আমি যে মা গো!' শক্তির পূজারির কাছে তিনি ভারতীয় শক্তি আরাধনার অপূর্ব সমন্বিত ফলস্বরূপ! যাঁর তুলনা কেবল তিনিই।

শক্তি ভাবনার ধারা

বঙ্গ তথা ভারতের আদি ভাবনা শক্তি আরাধনার মাধ্যমে জারিত। নানারূপে ভারতবর্ষ নারীর পূজা করে এসেছে। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার যুগেও মাতৃ আরাধনার চিহ্ন সুস্পষ্ট। সৃষ্টির রহস্য মানুষ প্রথম দেখেছিল মাটির মধ্যে। তাই পৃথিবী দেবীরূপে পূজিতা। হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে একটি মূর্তি বিশেষ ছাপ রেখে যায়। এক নারী যার গর্ভ থেকে উদ্ভূত হয়েছে পাতা সমেত বৃক্ষ। এই মূর্তিটি যে পৃথিবীরই মাতৃমূর্তি এ সম্বন্ধে সব পণ্ডিতই প্রায় একমত।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোর পরবর্তী যুগরূপে বৈদিক যুগের প্রসঙ্গই আসে। বেদে সূর্যদেব সবিতারূপে বন্দিতা, আবার প্রভাত আর রাত্রিও উষা ও রাত্রিদেবীরূপে চিত্রিতা। আমাদের আজকের জনপ্রিয় শক্তি আরাধনার মূলও আমরা বেদের মধ্যে দেখতে পাই! ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, "অধিদেবতা সবিতাকে (বেদে) বলা হইয়াছে 'হিরণ্যাক্ষ', 'হিরণ্যপাণি', 'হিরণ্যহস্ত'। সূর্যপ্রভারূপে কল্পনা করিয়া উষাকে একবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে দশভুজারূপে (৮.১০১.১৩)—ইয়ং যা নীচী অকিনী রূপা রোহিণ্যা কৃতা। চিত্রেব প্রত্যাদর্শ্যায়তী অন্তর্দশসু বাহুষু॥ এই যে নিম্নগামিনী কিরণময়ী, রোহিণীর দ্বারা রূপকৃত হইয়াছেন (তিনি) আসিতে আসিতে দশবাহু প্রসারিয়া প্রতিমার মতো দেখা দিলেন।

এই রূপকল্পনা যে দশভুজা দুর্গা ভগবতী প্রতিমার ভাবনার তা এই সূক্তেরই পরের একটি ঋক হইতে আরও স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় (৮.১০১.১৫)

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং
স্বসাদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়
মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট॥

"রুদ্রগণের মাতা, বসুদের কন্যা, আদিত্যদের ভগিনী, অমৃতের উৎস। যাহার বোধ আছে এমন লোককে বলিতেছি অপাপ গাভী অদিতিকে বধ করিও না।" [ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৭-৮।]

এইরকমভাবে ঋক্‌বেদের মধ্যে দেবীভাবনাকে অনুস্যুত হতে দেখি। যে শক্তি মানুষকে পোষণ করে, যা ধারণ করে সেগুলিই দেবী ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে বারংবার। মানুষের আবেগের সঙ্গে প্রকৃতি ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে ছিল। তাই দেখি নদী অথবা জলধারার সঙ্গে দেবী ভাবনা সংপৃক্ত হয়েছে। এইরকমই দুই দেবী 'বাক্' ও 'সরস্বতী'। সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "সরস্বতীকে বৈদিক কবির ধাত্রী বলিতে পারি, যেমন সংস্কৃত কবির ধাত্রী গঙ্গা। সরস্বতীর কাছে বৈদিক কবির প্রার্থনা ছিল এই (৬.১১.১৪)—মা ত্বৎ ক্ষেত্রাণি অরণ্যানি গন্ম॥ আমরা যেন তোমা হইতে দূরে মরুস্থানে না যাই॥"

বেদের প্রসঙ্গে অম্ভৃন ঋষির কন্যা বাকের সূক্ত উল্লেখ করতেই হয়। 'বৃহদ্দেবতা' নামক ঋকবেদ সংহিতার সূচি গ্রন্থে বাক্ যে ঋক্‌গুলি উচ্চারণ করেছেন সে সূক্ত থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে শক্তিপূজার আরম্ভ বলে ধরা হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'সপ্তশতী' অধ্যায়গুলিতে যে চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে তার খানিকটা এই সূক্তের থেকে নেওয়া। সূক্তগুলি বর্ণনা করলে তাই বোঝা যায় শক্তি আরাধনার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চণ্ডী'র ভাবনা বীজাকারে ঋক্‌বেদের মধ্যে বর্ণিত হয়েছিল। বেদে উচ্চারিত বাকের সূক্তগুলি হল—

আমি রুদ্রপুত্রের সহিত, বসুদের সহিত বিচরণ করি, আমি আদিত্যের সহিত এবং সব দেবতার সহিত (বিচরণ করি)। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কেই ভরণ করি, আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে, আমি উভয় অশ্বীকে (ভরণ করি)॥১

আমি সবনযোগ্য সোমকে ভরণ করি, আমি ত্বষ্টাকে এবং পুষাকে ও বগকে (ভরণ করি)। আমি নিষ্ঠাবান হবিষ্মান্ সোমযাজী যজমানকে ধন দান করি॥২

আমি বসুদের সমিতি। যাঁহারা যজনীয় তাঁহাদের মধ্যে (আমি) প্রথম জ্ঞানবতী। এমন আমাকে দেবতারা বহুধা বিধান করিয়াছেন,—(আমি) বহু স্থানবাসিনী, বহু স্থানচারিণী॥৩

যে চিন্তা করে, যে প্রাণ ধারণ করে, যে কানে শুনিতে পায়, সে আমার দ্বারা পুষ্টি গ্রহণ করে। আমাকে না জানিয়াই তাহারা বাঁচিয়া আছে। শোন, বিশ্বাস করিবার মতো কথা তোমাকে বলিতেছি॥৪

আমিই নিজে এ (কথা) বলিতেছি যাহা দেবতাদের এবং মানুষদের প্রিয়। যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকেই বড় করিয়া দিই,—তাহাকে দক্ষ পুরোহিত (ব্রহ্মা), তাহাকে মন্ত্রকার (ঋষি), তাহাকে সুবুদ্ধি (করিয়া দিই)॥৫

রুদ্রের হইয়া আমিই তাঁহার ধনু টানিয়া দিই—ব্রহ্মদ্বেষী শক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে। আমিই লোকের মধ্যে বিবাদ বাধাই। আমিই দ্যুলোকে ও ভূলোকে প্রবেশ করিয়াছি॥৬

ইহার শিখরে আমি পিতাকে প্রসব করিয়াছি। আমার গর্ভস্থান সমুদ্রের ভিতরে। সেখান হইতে আমি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া আছি। সেই দ্যুলোক আমি দীর্ঘতায় স্পর্শ করি॥৭

আমি বায়ুর মতো ধাই, বিশ্বভুবন ধরিয়া রাখিতে রাখিতে। দ্যুলোকের পারে এই পৃথিবীরও পারে, এমন মহিমায় আমি সম্ভূত হইয়াছি॥৮

বৈদিক সাহিত্যের শেষ অংশে উপনিষদের মধ্যে 'কেন উপনিষদ' বর্ণিত 'উমা হৈমবতী'র কাহিনী ভারতের চিরন্তন শক্তি সাধনার এক উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। অতি পরিচিত কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলে এইরকম দাঁড়ায়—দেবতারা অসুরদের যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয় উৎসবে মত্ত হয়েছেন। তাঁদের মনে সুপ্ত অহংবোধ আমরা নিজেদের বাহুবলে পরাজিত করেছি অসুরকুল! তাঁদের অহংবোধে রুষ্ট হলেন মহাশক্তি। যাঁর শক্তিতে বলীয়ান সমগ্র বিশ্ব। বিজয় উৎসবে মত্ত দেবতাদের কাছে এক বিচিত্র অজানা মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন তিনি। দেবরাজ ইন্দ্র 'কে ইনি'—এই প্রশ্ন নিয়ে প্রেরণ করলেন দেবতাদের। গেলেন অগ্নিদেব, বরুণদেব, কিন্তু তাঁরা নিজেদের শক্তি দিয়ে এক টুকরো তৃণকে স্থানচ্যুত বা দগ্ধ করতে পারলেন না। আবারক ইন্দ্রের মনের কোণে তখন মহাশক্তির স্বরূপ ধরা পড়ছে ধীরে ধীরে। সর্বশেষে গেলেন তিনি, বিনম্র হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন অদ্ভুত মূর্তির, জানলেন তিনিই জগৎ সৃষ্টির আদি শক্তি উমা হৈমবতী। আমাদের পরবর্তীকালের দেবী দুর্গার ধারণা এই শক্তি ভাবনারই ফসল।

বেদে দেবীরূপে পৃথিবী এক উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেন। পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতা তাঁকে মাতারূপে নির্দিষ্ট করেছে চিরকাল। এই পৃথ্বীদেবী পরবর্তীকালে লক্ষ্মীরূপে বন্দিতা হয়েছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫/৩/৫) পৃথিবীকে শ্রী বলা হইয়াছে। কতকগুলি পরবর্তীকালের উপনিষদের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীকে শস্য ও সম্পদের দেবী শ্রী বা লক্ষ্মীর সহিত এক করিয়া দেখা হইয়াছে। 'নারায়ণোপনিষদে' দেখিতে পাই, এই মৃত্তিকার পৃথিবীকেই দেবী বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রী—শ্রী বা লক্ষ্মীরূপে তিনিই স্তুতা এবং অর্চিতা। এখানে পৃথিবীর স্তবে দেখিতে পাই—

'অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥
ভূমিধেনু ধরণী লোকধারিণী।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা।
মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্বং তন্মে নির্নুদ মৃত্তিকে।
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্॥'

'নারায়ণোপনিষৎ' প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করি না; কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, পৃথিবীর দেবীমূর্তি ক্রমান্বয়ে কী শ্রদ্ধাভক্তির আস্পদ হইয়া উঠিতেছিল।" [ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ.২২-২৩]

বেদের দেবীভাবনা পুরাণে একটি পৃথক চেহারা ও পৃথক অস্তিত্ব লাভ করেছিল। পুরাণে দেবী পৃথিবী বা ধরা দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী একীভূত হয়ে গিয়েছেন। আবার গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় দেখি বিষ্ণুর পাশে সর্বদাই রয়েছেন দুই দেবী—একজন 'শ্রী' অপরজন 'ভূ'। অর্থাৎ তখন একই দেবী দুইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'ভূ' দেবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে লক্ষ্মী হয়েছেন 'শ্রী'। আবার যুগের বিবর্তনে 'শ্রী' দেবী একাধারে সরস্বতী, অন্যদিকে লক্ষ্মীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। একই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। কালিকাপুরাণে পৃথিবী দেবীকে জগদ্ধাত্রীরূপে চিহ্নিত হতে দেখি। পৃথ্বীদেবী জনক রাজার কাছে জগদ্ধাত্রীরূপে দেখা দিচ্ছেন (৩৭/২৫-২৮)। আবার নিজ পুত্রকে পৃথিবী বলছেন, 'পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়স্ত্বিদম্' (৩৮/৬৩)। কেবল লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী নন, দেবী দুর্গা ও চণ্ডী বর্ণিত দেবী কালিকার উৎপত্তিস্থলও বেদের পৃথিবী দেবীর মধ্যে বীজাকারে রয়ে গিয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "বহু পুরাণেই পৃথিবী দেবীকে আমাদের পৌরাণিক মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সহিতই এক করিয়া দেখা হইয়াছে। আমরা আমাদের মহাদেবী বা মহাশক্তিকে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর সহিত অভিন্ন করিয়া তাঁহার উৎপত্তি বা বিকাশের নানারূপ উপাখ্যানিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছি; কিন্তু তথাপি দেবীর পূজাবিধি লক্ষ্য করিলে আমরা তাঁহার পৃথিবী রূপের অনেক পরিচয় লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের মনে হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর মধ্যেও ছোট ছোট উপাখ্যানের ভিতর দিয়া চণ্ডীর পৃথিবীরূপত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডীতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মহীস্বরূপেও দেবী নিজেই স্থিতা।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।

'....পৃথিবী দেবী এবং তাঁহার পূজা হইতেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপূজার উদ্ভব হইয়াছে।...আমাদের দেবীপূজার ভিতরে এই শস্যপূজা নানাভাবে মিশিয়া আছে।" (ঐ, পৃ. ২৩-২৪)

বৈদিক সাহিত্যে যে দেবীভাবনা সূত্রাকারে ছিল, সেই দেবীভাবনা ক্রমে ক্রমে, পুরাণে নানা দেবীরূপে নানা কাহিনী নিয়ে উপস্থিত হল। আমরা ভারতের এই পৌরাণিক দেবী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ছেচল্লিশ

পৌরাণিক দেবী শ্রীশ্রীমা

বেদের দেবীভাবনা পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনীতে নানারূপে বিস্তার লাভ করেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী 'চণ্ডী'র ধারণা। দেবী এখানে রুদ্রা, ভয়ানক ভীষণ তিনি। চণ্ডীতে দেবী নিজ মুখে স্বরূপ বর্ণনা করছেন দানব শুম্ভের কাছে, 'সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ যোঽসৌ সাঽহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ।' (দেবী ভাগবত, ৩/৬/২)

'আমি এবং সে সর্বদাই এক, ভেদ নাই; যদি কেউ ভেদ করে তবে তা মতিভ্রম বলে জানবে।'—অর্থাৎ অগ্নি ও তাঁর দাহিকা শক্তি এক। যে পৃথক ভাববে সে ভুল পথে চালিত হবে। স্বয়ং ভাগনে হৃদয়, ছোট মামি সারদাকে মোটেই গুরুত্ব দিতে চান না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাবধান করে দেন, 'দেখ, আমাকে যা বলার বলিস, কিন্তু ওকে কিছু বলিস না! ও যদি একবার রুষ্ট হয় তবে কারোর সাধ্য নেই তোকে রক্ষা করে।' মতিভ্রম হৃদয়ের! অগ্নির দাহিকাশক্তিকে স্বীকার করে না সে! তাই বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মীয়, তাঁর সেবক হওয়া সত্ত্বেও সরে যেতে হয় তাঁকে! শক্তির অবমাননা করেছেন যে!

জন্ম এবং মৃত্যু—সৃষ্টির দুই খেলা। রুদ্রারূপে দেবী সন্তানের মুণ্ড ছেদন করেন। এক চোখে তাঁর করুণা, অপর চোখে সমরনিষ্ঠুরতা! ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। বহু লোক মারা যাচ্ছে। সংবাদে পরিবেশিত হচ্ছে লোকক্ষয়ের দুঃসংবাদ। সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত! এই প্রলয়ের তাণ্ডব বর্ণনা করা হচ্ছে মায়ের কাছে। জয়রামবাটিতে আছেন মা। খবর শুনে হঠাৎ ভাবস্থ হয়ে গেলেন, তারপর শুরু হল মৃদু হাসি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা তীব্র অট্টহাস্যে পরিণত হল! দারুণা দেবীর কাছে গলবস্ত্র হয়ে বসে পড়লেন গোলাপ মা, 'মা সম্বর সম্বর!' কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই শান্ত হলেন মা।

ঠিক এইরকমই ঘটনা ঘটল পাগলি মামি সুরবালাকে কেন্দ্র করে। পাগলের পক্ষে রাগের বশে সবকিছু সম্ভব, এমনকী কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দিতেও পারেন। পাগলি মামি সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তি কোনো ভক্তের কাছে শুনে মা হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তাহলে বেশ হবে, বে-শ হবে, ঠাকুর যেমন ভালোবাসতেন তেমন হবে! তিনি শ্মশান ভালোবাসেন, সব শ্মশান হয়ে যাবে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে হাসতে থাকলেন মা। উপস্থিত অনেকেই পাগলি মামির সম্বন্ধে ঠাট্টা মনে করে সেই হাসিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের ভুল ভেঙে গেল। এ যে প্রলয়রূপিণী শক্তির আধারে ধ্বংসের উন্মাদ তাণ্ডব! স্তব্ধ হয়ে যান সবাই। লজ্জাপটাবৃতার মাঝারে এ কী সংহারমূর্তি! সৃষ্টির কোলেই যেন ধ্বংসের রূপ সমাহিত।

মায়ের জীবনের পলে পলে যেন পুরাণের দেবীভাবনাকে মূর্ত হতে দেখি। এ প্রসঙ্গে কৌশিকী দেবীর কথা উল্লেখযোগ্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও পদ্মপুরাণ—এই দুই পুরাণের মধ্যে আমরা দেবী কৌশিকীর কথা পাই। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে কৌশিকী দেবী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, রাত্রিদেবী। ব্রহ্মা তাঁকে বিন্ধ্যাচলে বাস করার আজ্ঞা দিচ্ছেন। আবার অন্যদিকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে কৌশিকী দেবী গৌরবর্ণা; দেবী দুর্গার দেহ সঞ্জাত। মায়ের জীবনের মধ্যে তাঁর ছায়ারূপেই দুইভাবে কৌশিকী দেবীর প্রকাশ। প্রথম প্রকাশ ছেলেবেলায়, মা নিজে সেই স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, 'দেখ বাবা, ছেলেবেলায় দেখতুম, আমারই মতো মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত—আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত; কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ-এগারো বছর পর্যন্ত এরকম হয়েছিল।' (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ১৯)। জলে যখন দলঘাস কাটতেন মা, তখন দেখতেন সেই মেয়েটি তাঁকে সাহায্য করছে। এক আঁটি ঘাস পাড়ে রেখে, অন্য আঁটিটি আনতে গিয়ে দেখেন সেই সঙ্গিনী অন্য আরেক আঁটি কেটে রেখে গেছে!

মায়ের সঙ্গে তাঁরই ছায়ার দ্বিতীয় মিলনটি ভিন্নরূপে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে। দক্ষিণেশ্বরের পথে চলেছেন শ্রীশ্রীমা। সঙ্গে পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পথের ক্লান্তিতে জ্বর এসে গেল সারদার। সেই জ্বরের ঘোরে তিনি দেখলেন এক কালো মেয়ে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরই শয্যার পাশে। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ তিনি আগে কখনো দেখেননি। মায়ের গায়ে তাঁর নরম ঠান্ডা হাতটি বুলিয়ে দিলেন, সেই স্পর্শে মায়ের সমস্ত গা জুড়িয়ে গেল! 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' মা শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐসব আর হল না।' মেয়েটি বললে, 'সে কী! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি, ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটি বললেন, 'আমি তোমার বোন হই।' মা বললেন 'বটে! তাই তুমি এসেছ!' এই কথাবার্তার পর মা ঘুমিয়ে পড়লেন। (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ, ৩৫)

অন্য এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা ভিন্নভাবে ঘটনাটি ব্যক্ত করেছেন। মা বলছেন, "একবার ছোটবেলায় দক্ষিণেশ্বরে যেতে আমার খুব জ্বর। কোনো জ্ঞান নেই, এমন অবস্থায় দেখি যে, একটি কালো কুচকুচে মেয়ে এক-পা ধুলো নিয়ে আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছে। এক-পা ধুলো দেখে বললুম, 'মা, কেউ কী পা ধুতে জল দেয়নি?' সে বলল, 'না, মা, আমি এক্ষুনি চলে যাব। তোমাকে দেখতে এসেছি। ভয় কী? ভালো হয়ে যাবে।' তা পরদিন থেকে আমি ক্রমে সেরে উঠি।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ, ৩৬)

মায়ের এই সঙ্গী যিনি নিজেকে তাঁরই বোন বলে পরিচয় দিচ্ছেন তিনি যেন দেবী দুর্গারই দেহ সঞ্জাত দেবী কৌশিকী। কখনো তিনি গৌরী মায়েরই অনুরূপা, মা বলছেন 'আমারই মতো মেয়ে', আবার কখনো তিনি কৃষ্ণা। মায়ের ভাষায় 'কুচকুচে কালো মেয়ে। কালো হলে কী হবে, এমন রূপ আগে কখনো দেখিনি!' এই কুচকুচে কালো মেয়ের প্রসঙ্গেই পুরাণের দেবী কালিকার কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

'কলৌ জাগর্তি কালী'। কালকে ধারণ করে যিনি জাগ্রতা তিনিই কালী। বৈদিক যুগে কালী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে তিনি অগ্নিস্বরূপিণী। অগ্নির সাতটি জিহ্বা বা শিখার মধ্যে একটি শিখার নাম কালী। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে,

'কালী করালী ও মনোজবা চ
সুলোহিতা যা সুধূম্রবর্ণা চ।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।
মুণ্ডক উপনিষদ ১/২/৪

আবার ঋক্‌বেদে অগ্নিকে শত্রুবিনাশকারী শক্তিরূপে বন্দনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

'বিপাজসা পৃঞ্জনা শোশুচানো
বাধস্ব দ্বিযো রক্ষসো অমীবাঃ
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণি
স্যামগ্নেরহং সুহবস্যা প্রণীতৌ।। ৩/১৫/১

হে অগ্নি, তুমি বিস্তীর্ণ তেজে অত্যন্ত দীপ্তিমান। তুমি শত্রুদের এবং রোগরহিত রাক্ষসদের বিনাশ করো। অগ্নি উৎকৃষ্ট সুখপ্রদ, মহান এবং উত্তর আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁহারই রক্ষণে থাকব।

দেবী কালিকা তাই শক্তি ভাবনার প্রথম থেকেই একাধারে অগ্নিস্বরূপিণী, অন্যাধারে দেবী শত্রুবিনাশকারী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা যায়, দেবী ভীষণা। অসুরেরা তাঁর নিকটবর্তী হলে দেবীর ভ্রুকুটিকুটিল ললাট থেকে পাশহস্তা করালবদনী দেবী নির্গত হলেন। ইনিই দেবী কালী। বাংলার লোক ভাবনায় দেবী রক্ষাকর্ত্রী তাই তিনি কখনো শ্যামাকালী, কখনো দক্ষিণাকালীরূপে পুজিতা। তিনি সাধুরও আশ্রয়, অসুরেরও আশ্রয়। বঙ্গভূমির আরেক বৈশিষ্ট্য হল 'ডাকাত কালী'। ইনি ডাকাতদের দ্বারা পুজিতা। পুঁটে কালী, রঘু ডাকাতের কালী আজও ডাকাতে কালীরূপে কলকাতা মহানগরীর বুকে বিরাজ করছেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে এঁর প্রকাশ অভিনব। হ্যাঁ, আমরা সেই ডাকাত বাবার প্রসঙ্গেই আসছি!

কামারপুকুর কিংবা জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে শ্রীশ্রীমা সাধারণভাবে পদব্রজেই আসতেন। একবার কোনো এক পর্ব উপলক্ষে শিবুদা, লক্ষ্মীদি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাত্রা করলেন। কামারপুকুর থেকে চারক্রোশ পথ আরামবাগ। সেদিন আরামবাগেই রাত কাটানোর কথা ছিল। কিন্তু সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি হাঁটলে তারকেশ্বরে পৌঁছানো যাবে, এই আশায় দ্রুত হেঁটে কুখ্যাত তেলোভেলোর মাঠ অতিক্রমের চেষ্টা করলেন, কিন্তু মা কিছুক্ষণ পর থেকেই সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। ডাকাতের ভয়ে সঙ্গিদের কাতর দেখে মা তাঁদের এগিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা দ্রুত মা'র চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। মা ধীর পদে চলতে লাগলেন, দিন শেষ হয়ে আসতে লাগল। গাছের দীর্ঘ ছায়া পথের উপর পড়ে বিকেলের আলোয় মিলিয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে মা বুঝলেন তিনি পথ হারিয়েছেন। পথে একাকী চলতে চলতে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। এমন সময়

দেখলেন প্রান্তরের ধারে এক বিরাট মূর্তি, তাঁরই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঘোরকৃষ্ণবর্ণ লোকটির হাতে লাঠি, দুই হাতে রুপোর বালা, কুঞ্চিত কালো কেশ। মা'র বুঝতে অসুবিধা হল না। এ হল ডাকাত, তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দস্যু কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, 'কে গা, এসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? কোথা যাবে?' শ্রীশ্রীমা বললেন, 'পুবে।' দস্যু বলল, 'এ পথ সে পথ নয়, ঐ পথে যেতে হবে।' মা কিন্তু তখনো স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন, দস্যু তাঁর কাছে এসে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর নরম সুরে বলল, 'ভয় নেই, আমার সঙ্গে মেয়েলোক আছে, সে পিছিয়ে পড়েছে।' মা দেখলেন দস্যুর পাশে তাঁর স্ত্রী। মা এবার সহজ হয়ে বললেন, 'বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধহয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাদের কাছে পৌঁছে দাও! তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও তাহলে তিনি তোমায় খুব আদর-যত্ন করবেন।' দস্যুপত্নী ইতিমধ্যে এসে পড়েছে, মা তাঁকে বললেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কী করতুম বলতে পারিনে!'

মায়ের সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারেই হোক আর অন্য কোনো কারণেই হোক এই বাগদি দম্পতি একমুহূর্তে মায়ের আপনজন হয়ে উঠলেন। সেদিন রাত্রে তাঁরা মেয়েকে যত্নে রাখলেন। পরদিন তারকেশ্বরে পৌঁছে এক চটিতে আশ্রয় নিয়ে বাগদি রমণী স্বামীকে বললেন, 'আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায়নি; বাবা তারকনাথের পুজো শিগগির সেরে বাজার থেকে মাছ, তরকারি নিয়ে এসো, আজ তাকে ভালো করে খাওয়াতে হবে!'

একরাত্রের মধ্যেই এই দম্পতি এতটাই আপন হয়ে গিয়েছিলেন যে বিদায়ের ক্ষণে অশ্রু -সংবরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠল, বাগদি রমণী এগিয়ে দেওয়ার সময় পথের ধারের খেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলে কন্যার আঁচলে বেঁধে দিয়ে বললেন, 'মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলি দিয়ে খাস।' আর বাবা বললেন, 'মা, যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না থাকত, তোমাকে বাবার (ঠাকুরের) কাছে নিয়ে যেতুম।' ডাকাত-দম্পতির সঙ্গে বিদায়ের ক্ষণটি শ্রীশ্রীমা আবেগ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। মা বলছেন, '(বৈদ্যবাটি আসবার সময়ে) ডানদিকের রাস্তায় বাবা চলে গেল, আর আমি বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সোজা চললুম। যতদূর দেখা যায় ফিরে ফিরে দেখে আর কাঁদে।' [মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী, পৃ: ৩৪]

এই ডাকাতবাবা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা পরবর্তীকালে কোনো ভক্তকে বলেছিলেন, "আমি তাদের বললুম, 'তোমরা আমাকে এত স্নেহ করো কেন গো?' তারা উত্তর দিলে, 'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখলুম।' আমি বললুম, 'সে কী গো, তোমরা এটা কী দেখলে?' তারা বললে, 'না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম। আমরা পাপী বলে তুমি রূপ গোপন করছ!' আমি বললুম, 'কী জানি, আমি তো কিছু জানিনি!'

এই একই প্রসঙ্গে আশুতোষ মিত্রের গ্রন্থে একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একদিন আশুতোষ মিত্র মাকে প্রশ্ন করেন, 'ডাকাত আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখলে?' মা উত্তর দিলেন, 'পরে বলেছিল, কালীরূপে নাকি দেখেছিল।'

'তাহলে আপনি তাকে কালীরূপে দেখা দিয়েছিলেন? লুকোবেন না মা, বলুন।'

'আমি কেন দেখাতে যাব? সে বললে, সে দেখেছে।' [ঐ, পৃ: ৩৫]

শ্রীশ্রীমায়ের কালীরূপে প্রকাশ কেবল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়। এক্ষেত্রে আরও ঘটনা উদাহরণরূপে ব্যবহার করা যায়। প্রথমটি শিবুদার ও দ্বিতীয়টি গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবীর। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গীরূপে শিবুদা চলছেন। মা চলেছেন পালকিতে, শিবুদা হেঁটে। কামারপুকুর থেকে বাপের বাড়ি জয়রামবাটির উদ্দেশে। জয়রামবাটি গ্রামের প্রান্তে এসে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন শিবুদা। তারপর তিনি মাকে একাকী চলে যেতে বললেন। গ্রাম্য প্রথা অনুযায়ী একা একা বাড়ির বউ গ্রামে ঢুকবে না। শিবুদার কথায় মা মুশকিলে পড়লেন, এমন কেন করছে সে? শিবুদার এক প্রশ্ন, যেতে পারি আগে তুমি বলো তুমি কে?' মা বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'কে আবার, তোর খুড়ি!' উত্তর শুনে শিবুদা বলেন, 'বেশ তবে তুমি একাই যাও।' নিরুপায় মা অবশেষে উত্তর দিলেন, 'লোকে বলে কালী'। শিবুদার আবার প্রশ্ন, 'লোকে যা বলে তা ঠিক?' মা বললেন, 'হ্যাঁ।' (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃ: ৩২৮)

এ প্রসঙ্গে আমরা শিবুদার আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি, "১৩২৬ সালের ফাল্গুনে শ্রীশ্রীমায়ের জয়রামবাটি হইতে কলিকাতা যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছে জানিয়া শিবুদাদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেলা প্রায় এগারোটার সময় জয়রামবাটিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামান্তে জানাইলেন যে, তিনি সেদিন আর কামারপুকুরে যাইবেন না; কারণ রঘুবীরের পূজা, ভোগ, শীতল, সন্ধ্যারতি ও শয়নাদি সেদিনকার মতো সারিয়া আসিয়াছেন। মা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সেদিনই তাঁহাকে কামারপুকুরে ফিরিয়া গিয়া বৈকালিক ক্রিয়াদি যথাবিধি করিতে বলিলেন এবং কামারপুকুরে লইয়া যাইবার জন্য ব্রহ্মচারী বরদাকে একটি পুঁটুলিতে কিছু ফল ও শাকসবজি বাঁধিয়া নিতে বলিলেন। বেলা তিনটার সময় আবার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি যেন পুঁটুলি লইয়া আমোদর নদ পর্যন্ত শিবুদাদাকে আগাইয়া দিয়া আসেন। বরদা তাহাই করিলেন; কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল, শিবুদাদা পুনরায় মায়ের বাড়িতে উপস্থিত। তিনি মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'মা, আমার কী হবে বল, তোমার কাছে শুনতে চাই।' মা বলিতেছেন, 'শিবু, ওঠ, তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেবা করলি। তিনি তোকে কত ভালোবেসেছেন, তোর আবার চিন্তা কি? তুই তো জীবন্মুক্ত হয়ে আছিস!' শিবুদাদা তখন বলিতেছেন, 'না, তুমি আমার ভার নাও, আর তুমি যা বলেছিলে, তুমি তাই কিনা বল।' মা তাঁহার মাথায় ও চিবুকে হাত দিয়া যতই আদর করেন, সান্ত্বনা দেন, শিবুদাদা ততই অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলেন, 'বল, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ, আর সাক্ষাৎ মা কালী কিনা।' শ্রীশ্রীমা এতক্ষণ এই ব্যাপারে একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এখন শিবুদাদার এই প্রগাঢ় ব্যাকুলতা দর্শনে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পার্শ্বস্থ বরদা মহারাজের স্পষ্টই মনে হইল, শ্রীশ্রীমা তখন আর সামান্য মানবী নহেন। তিনি শিবুদাদার মাথায় হাত দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাই।' শিবুদাদা তখন উঠিয়া হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিলেন, 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমা তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন। শিবুদাদাও চক্ষু মুছিয়া ও গাঁটরি বগলে লইয়া সানন্দে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মায়ের আদেশে বরদা আবার পুঁটুলিটি

তাঁহার হাত হইতে লইয়া সঙ্গে চলিলেন। গ্রামের বাহিরে আসিয়া শিবুদাদা প্রফুল্লবদনে বরদাকে বলিলেন, 'ভাই, মা সাক্ষাৎ কালী। উনিই সাক্ষাৎ কপালমোচন; ওঁর কৃপাতেই মুক্তি। বুঝলে?" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃ: ৩২৯-৩৩০)

শ্রীশ্রীমায়ের কালীরূপ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবীর। গিরিবালা আজন্ম দেবীভক্ত। তাঁর রচিত গান স্বয়ং ঠাকুর পছন্দ করতেন। সেই গিরিবালা ঠাকুরকে অবতার বলে স্বীকার করলেও শ্রীশ্রীমায়ের দেবীত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না। গৌরীমা তাঁকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি উৎসাহবোধ করেননি। সম্ভবত ১৮৮৩ বা ১৮৮৪ সনে দক্ষিণেশ্বরের নহবতে গিরিবালা প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দেখেন। দেখামাত্রই অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, 'অ্যাঁ, মা, তুমি!' সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মায়ের পদধূলি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মা তাঁর হঠাৎ উচ্ছ্বাস দেখে হেসে বলেন, 'কী হয়েছে গো, অমন করছ কেন?' মায়ের এই প্রশ্নের জবাব দেন গৌরীমা, তিনি বলেন, 'হবে আবার কী? যা হবার তাই হয়েছে।' শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে নিজ ইষ্টদেবীকে দেখেছিলেন গিরিবালা।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে আরেক দেবীরূপের সারূপ্য সকলের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ইনি হলেন দেবী জগদ্ধাত্রী। মায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবী ১৮৭৭ সালে গ্রামের বারোয়ারি কালীপূজার সময় মা কালীর ভোগের জন্য কিছু চাল কুটিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু গ্রাম্য দলাদলির ফলে গ্রামের নব মুখুজ্যে সেই চাল নিতে অস্বীকার করল। শ্যামাসুন্দরী দেবী দুঃখিতা হলেন, সবাইকে বলতে লাগলেন, 'কালীর জন্য চাল করেছি, আমার চাল নিলে না! এ চাল আমার কে খাবে? কালীর চাল তো কেউ খেতে পারবে না!' সেই রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, এক দেবী এসে তাঁকে বলছেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব! তোমার ভাবনা কী?' শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?' জগদ্ধাত্রী উত্তর দিলেন, 'আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করব।' পরদিন তিনি শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ মা সারু, পায়ের উপর পা দিয়ে লালরঙের, এ কোন দেবী?' মা বললেন, 'সে তো জগদ্ধাত্রী!' ব্যস, শ্যামাসুন্দরী দেবী জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করতে লাগলেন।

বিশ্বাসদের বাড়ি থেকে পাঁচ মন আন্দাজ ধান আনালেন, আগুনের তাপে প্রতিমা শুকানো হল। দিদিমা বলতে লাগলেন, 'মা, কী করে তোমার পূজা হবে? ধানই শুকাতে পারলুম না।' কিন্তু মা জগদ্ধাত্রীর কৃপায় এমন হল যে, চারদিকে বৃষ্টি হচ্ছে অথচ দিদিমার চাটাইতে রোদ্দুর। ধুমধাম করে পূজো সম্পন্ন হল। শ্রীশ্রীমায়ের ভাই প্রসন্নমামা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করতে গেলেন, ঠাকুর শুনে বললেন, 'এই আমার যাওয়া হল; যা, বেশ পূজা কর গে। বেশ বেশ, তোদের ভালো হবে।' পরের বছর শ্যামাসুন্দরী দেবী শ্রীশ্রীমাকে বললেন, 'দেখো, তুমি কিছু দিয়ো, আমার জগাইয়ের পূজা হবে।' শ্রীশ্রীমা বললেন, 'অত ল্যাঠা আমি পারব না। একবার পূজা হল, আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নেই, ও পারব না।' এর পরের রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, 'আমরা তবে যাব?' শ্রীশ্রীমা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তোমরা?' দেবী বললেন, 'আমি জগদ্ধাত্রী।' মা বললেন, 'না, তোমরা কোথা যাবে? তোমরা থাকো, তোমাদের যেতে বলিনি।'

বহু ভক্ত মাকে স্বয়ং জগদ্ধাত্রীরূপে দর্শনলাভে সমর্থ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে, মায়ের সন্তান হরিপ্রেমানন্দের কথা উল্লেখ করা যায়। রাধুর অসুখ। মা তাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে বাঁকুড়া গিয়েছেন। উদ্বিগ্ন শ্রীশ্রীমাকে দেখে যুবক হরিপ্রেম ভাবলেন, এই বৃদ্ধা নারী, পায়ে জীর্ণ-শীর্ণ শিরা বের করা! ইনিই কি দেবী! এ তো আমাদের বাড়ির সাধারণ মায়েদের মতোই! পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে এইসব ভাবতে লাগলেন হরিপ্রেম। হঠাৎ দেখলেন সেই শিরা বের করা পা যেন যুবতীর পায়ে পরিণত হয়েছে! অবাক হরিপ্রেম পায়ের থেকে দ্রুত মুখের দিকে তাকান অবাক বিস্ময়ে, ইনি তো মা নন, দেবী জগদ্ধাত্রী তাঁর অপূর্ব রূপ নিয়ে বিরাজ করছেন! সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারান হরিপ্রেমানন্দ। যখন চেতনা ফিরে এল, তখন দেখলেন তাঁর মুখের সামনে সেই মা, উদ্বিগ্ন মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। আর মুখে বলছেন, 'ও হরিপ্রেম, হল কী তোর!'

এই দর্শন হয়তো মায়ের চকিতে নিজের রূপের প্রকাশ! কিন্তু শ্রীশ্রীমা সচেতনভাবে নিজের এই স্বরূপকে উন্মোচিতও করেছেন কিছু ভাগ্যবান ভক্তের কাছে। উদ্বোধনের কর্মী চন্দ্র, মায়ের স্নেহের চন্দু। একদিন তিনি মাকে ধরে বসলেন, 'মা, সবাই তোমাকে জগদ্ধাত্রীরূপে পূজা করেন। জগদ্ধাত্রীর পাশে সর্বদা দুই সখী জয়া-বিজয়া থাকেন। আপনার জয়া-বিজয়া কে?' মা বললেন, 'বাবা, গোলাপ আর যোগীন আমার জয়া-বিজয়া।' কেবল বলা নয়, সবাইকে সরিয়ে দিয়ে মা সগৌরবে তাঁর কাছে জগদ্ধাত্রীরূপে প্রকাশিত হলেন। তারপর প্রিয় সন্তানকে বললেন, 'বাবা, আমি থাকতে এ কথা কাউকে বোলো না।'

শ্রীশ্রীমায়ের জগদ্ধাত্রীরূপের প্রকাশের কাহিনী বিস্তৃত। স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন, সম্ভবত শ্রীশ্রীমায়ের ইষ্টদেবীও ছিলেন জগদ্ধাত্রী। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে মা একাকী কামারপুকুরে রয়েছেন। এই সময় মায়ের সঙ্গী ছিলেন বাসনাবালা দেবী। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, তিনি একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় ঠাকুর দেখতে না যেতে পেরে দুঃখিতা হলে, ঘরের মধ্যে টিমটিমে আলোয় স্বয়ং মা জগদ্ধাত্রীরূপে বিরাজিতা হয়েছিলেন।

পৌরাণিক কাহিনীর দিক দিয়ে দেবী দশমহাবিদ্যা রূপ অতি প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের এই দশমহাবিদ্যার মধ্যে 'ষোড়শী' রূপ এবং 'বগলা' রূপ অতি সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং মাকে ষোড়শীরূপে পূজা করেছিলেন। দশমহাবিদ্যার দশটি রূপের মধ্যে, ষোড়শীরূপ অতি প্রসিদ্ধ। এই রূপে দেবী অতি সুন্দরী! কেবল তাই নয়, এই রূপে দেবী শিবের মনোলোভা। তাঁর রূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দেবীর আলুলায়িত ঘন কেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন শ্রীশ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পূজা করলেন, অষ্টাদশী সারদাকে এই পূজার মধ্য দিয়ে ঠাকুর তাঁর সঙ্গে অসাধারণ বৈবাহিক সম্পর্ককে নজিররূপে স্থাপন করলেন। অপরদিকে মায়ের বুকের একপাশে কেশের গুচ্ছ মায়ের ষোড়শী রূপের নিদর্শন রেখে গেল। ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন দেবীরূপে পূজা করে মায়ের পায়ে সমস্ত সাধনার ফল সমর্পণ করলেন ঠাকুর। মন্ত্র উচ্চারণ করলেন,—'হে বালে! হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত করো। এঁর শরীর-মনকে পবিত্র করে এঁতে আবির্ভূত হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন করো।' বিশ্বের সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করলেন বিশ্বমানব, সমগ্র বিশ্বের জন্য। এ এক আশ্চর্য আবির্ভাব!

ষোড়শী রূপের পরে আমরা দশমহাবিদ্যার 'বগলা' রূপটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। মায়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বয়ং ঠাকুর বলেছিলেন, 'উপরে মহাশান্ত কিন্তু ভিতরে রুদ্রা।' দেবীরূপে বগলা তাই, তিনি সদা সর্বদা শত্রুনিধনে তৎপরা। দশমহাবিদ্যার অষ্টম রূপ বগলা। এই রূপে দেবী চম্পকবর্ণা, চাঁদের মতো মুখ, তিনি পদ্মাসনা, পীতবর্ণ দেবী এক হাতে অসুরের জিব টেনে ধরেছেন আর এক হাতে শত্রু নিধন করছেন। শ্রীশ্রীমা নিজেই এই রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "শ্রীশ্রীমা আলোচ্য স্থলে 'নিজমূর্তি' শব্দটি কী অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন, তাহা এখন নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীশ্রীমা যখন জগদম্বারই অবতার, তখন তাঁহার পক্ষে দেবীর সর্বপ্রকার রূপ ধারণই সম্ভব ছিল এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি অসুরদমনী বগলা মূর্তিতে হরিশের কুপ্রবৃত্তিকে কঠিন হস্তে দমন করিয়াছিলেন।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১২৪) বগলাস্তোত্রে তাই পাই,

'দেবি ত্বচ্চরহণাম্বুজার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।।'

ভক্তের কাছে দেবী পীতপুষ্পের আশা করেন। শ্রীশ্রীমা নিজ মুখে বলেছেন, আমার জন্য হলুদ ফুল, ঠাকুরের জন্য সাদা। হলুদ ফুল দেবী বগলার প্রিয় পুষ্প।

কামারপুকুরের লাহা পরিবারের সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রসন্নময়ী শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'গদাই, গদাই-এর বউ—এঁরা দেবাংশী।' দেবীরূপে সত্যিই মা ছিলেন সর্বদেবীর সমন্বিত রূপ। কামারপুকুরের 'সাগরের মা' বলেছিলেন, 'তাঁর (মায়ের) ছিল যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কোনো জিনিস কম পড়ত না। যা বাঁচত তা যত্ন করে রেখে দিতেন। পরদিন আমাদের ডেকে আদর করে খাওয়াতেন।' (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১২৬) মায়ের জীবনে সূচনাতেই তিনি যেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী। এক্ষেত্রে মায়ের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করতে হবে। শ্রীশ্রীমা নিজমুখে এই বৃত্তান্ত স্মরণ করেছেন। মা বলছেন, "আমার মা শিওড়ে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছা হওয়ায় দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হল না। কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদরমধ্যে ঢোকায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন যে, লাল চেলিপরা একটি পাঁচ-ছবছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।' তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে, তা থেকেই আমার জন্ম।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১৫, পাদটীকা)।

শ্রীশ্রীমায়ের বর্ণিত 'সেই মেয়ে' কে ছিলেন? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর পেতে গেলে আমাদের মায়ের পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা জানতে হবে। শ্যামাসুন্দরী দেবীর যখন অভিনব অভিজ্ঞতা হল, ঠিক সেইসময় রামচন্দ্র একদিন স্বপ্নে দেখলেন, একটি হেমাঙ্গী বালিকা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বরে বলছে, 'এই আমি তোমার ঘরে এলুম।' জাগ্রত হয়ে রামচন্দ্র ভাবলেন তিনি নিশ্চয়ই দেবী লক্ষ্মীর দর্শন লাভ করেছেন। এই চিন্তা তাঁর মধ্যে

এত দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হল যে তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই মা লক্ষ্মী কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন, এবার নিশ্চয়ই সাংসারিক উন্নতি হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি জয়রামবাটি থেকে উপার্জনের জন্য কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলেন। কন্যা সারদা যে অন্যান্যদের থেকে পৃথক তা পিতা রামচন্দ্র ও মাতা শ্যামাসুন্দরী সর্বদাই স্মরণে রাখতেন, তাঁদের দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারে অসামান্য আদর ও ভালোবাসায় বড় হয়ে উঠেছিলেন শ্রীশ্রীমা। ১৮৬৪/৬৫ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় রামচন্দ্র অন্নসত্র খুলেছিলেন, হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রান্না হত, যে আসত সেই খেতে পেত। বাড়ির লোকেরাও সেই সকলের জন্য রাঁধা খিচুড়ি খেতেন। কেবল রামচন্দ্রের আদেশ ছিল, তাঁর কন্যা সারুর জন্য দুটি ভালো চালের ভাত রান্না হবে। ছোট্ট কন্যা সারদা মায়ের সমস্ত ঘরের কাজে সাহায্য করতেন, মাঝে মাঝে কন্যাকে বলতেন শ্যামাসুন্দরী দেবী, 'মা গো, তুই যে আমার কে মা! আমি কী তোকে চিনতে পারছি মা?' শ্রীশ্রীমা নিজেকে গোপন করে বলতেন 'কে আবার, কে আবার? আমার কী চারটে হাত হয়েছে? তাহলে তোমার কাছে আসব কেন?' (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ২০-২১)

লক্ষ্মীর পরেই পৌরাণিক দেবীরূপে সরস্বতীর কথা মনে আসে। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গী গোলাপ মাকে স্বয়ং ঠাকুর বলেছিলেন, "ও (শ্রীশ্রীমা) সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" অন্য কোনো সময়ে শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, 'জ্ঞানদায়িনী মহাবুদ্ধিমতী। ও কী যে সে! ও আমার শক্তি!" হৃদয়কে বলেছিলেন, 'ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী; তাই সাজতে ভালোবাসে।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৯২)

সারদা প্রসঙ্গে আমরা বৌদ্ধদেবীর কথা উল্লেখ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে সারদা তত্ত্ব গ্রন্থে বলা হয়েছে, "দশমহাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত না হলেও, শক্তিতত্ত্বের আর একটি প্রকাশ সরস্বতী-তত্ত্ব। চণ্ডীতে দেবীর নামাবলিতে সরস্বতী নামের উল্লেখ আমরা পাই। যদিও একমতে সরস্বতী তত্ত্বটি এসেছে বৈদিক যুগের সরস্বতী নদী থেকে, যে নদী সৈকতে ভারত সভ্যতার প্রকাশভূমি। জ্ঞানের উৎসমুখ সেই সরস্বতীকেই ঋষিকুল জ্ঞানদাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করে তাঁর উপাসনা করেছেন। তিনি অন্নবতী, তিনিই জ্ঞানবতী। জৈনধর্মে ও বৌদ্ধধর্মেও শক্তিতত্ত্বের মধ্যে সরস্বতীরূপের ব্যাখ্যা আছে; যেমন, মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য সরস্বতী। বজ্রসারদা রূপের বর্ণনা যা পাওয়া যায় তা এই, শ্বেতপদ্মাসনা, ললাটে অর্ধচন্দ্র, এই ত্রিনয়না, দ্বিভুজা, এঁর-দক্ষিণহস্তে পদ্ম ও বামহস্তে পুস্তক। যদিও ইনি জ্ঞানেরই দেবী—কারণ, নালন্দায় বজ্রসারদার মূর্তির চারপাশে দেখা যায় চারটি মূর্তি—প্রজ্ঞা, ধৃতি, মেধা, মতি। তবু এঁর নামের সঙ্গে বজ্র শব্দটিতে যেন একটি বিশেষ দ্যোতনা আছে, ললাট নেত্রটিও যেন তাঁর প্রমাণ। অর্থাৎ সরস্বতীর শান্তরূপের মাঝে একটি রুদ্ররূপের আভাসও রয়ে গেছে। জননী সারদেশ্বরীর স্বরূপ ব্যাখায় একস্থানে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ওপরে শান্তভাব ভেতরে সংহারমূর্তি, সরস্বতী মহাশান্ত কিনা!' মনে হয় এটি যেন মায়ের বজ্রসারদা রূপেরই আভাস।" (সারদাতত্ত্ব, পৃঃ ২৬)

বৈদিক দেবীর বিবর্তনের ধারা আলোচনাকালে আমরা দেখেছি পৃথিবীদেবী থেকে কীভাবে লক্ষ্মীদেবীতে পরিণত হলেন। গুপ্তযুগে সেই দেবীই নারায়ণের পাশে 'শ্রী' ও 'ভূ' রূপে পৃথক

অস্তিত্বের অধিকারিণী হলেন। মূলত গবেষকদের মতে লক্ষ্মী-সরস্বতী একই দেবীর ভিন্ন প্রকাশ। উভয়েরই পঞ্চমী তিথিতে পূজা, অনেকগুলি প্রমাণের মধ্যে একটি বলে চিহ্নিত করেন গবেষকগণ। শ্রীশ্রীমায়ের দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখব, মায়ের মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী—দুই রূপই সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। পৌষ মাসে গ্রামের মানুষ নতুন ফসলের গন্ধে তাদের ঘরের আঙিনা আমোদিত করে তোলে। এইসময় যেন পৌষলক্ষ্মীরূপে মায়ের আবির্ভাব। আর জ্ঞানদায়িনী তিনি, গুরুরূপে ভক্তদের মধ্যে, সঙ্ঘজননীরূপে সন্ন্যাসীদের মধ্যে এবং মা রূপে মুমুক্ষু সন্তানের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করেছেন অনায়াস ছন্দে।

স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে গুরুভাইদের লিখেছেন, "দাদা, জ্যান্ত দুর্গাপূজা দেখাব, তবে আমার নাম।...মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ' দাদা, ওই যে বলছি, ওখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন—যা হয় বল দাদা; কিন্তু মায়ের উপর যাঁর ভক্তি নেই তাঁকে ধিক্কার দিও।' স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা' হলেন 'শ্রীশ্রীমা'। স্বামী প্রেমানন্দের মা দুর্গাপুজার আয়োজন করলে স্বামীজি মন্তব্য করেছিলেন, 'বাবুরামের মা'র মতিভ্রম হয়েছে, জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির প্রতিমায় পূজা করছে।' জ্যান্ত দুর্গারূপে মাকে বারংবার চিহ্নিত করেছেন স্বামীজি। কীরকম ছিলেন মা দেবী দুর্গারূপে?

অধ্যাপক গোকুল দাস দে তখন বি. এ পড়তে পড়তে অসুস্থ হয়ে বাড়িতে আছেন। পূজনীয় মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তিনি। শ্রীমা তাঁকে শিখিয়েছেন কীভাবে চণ্ডীপাঠ করতে হয়। একদিন সকালে বাগবাজার গঙ্গাঘাটে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন, ঘাটের সবথেকে নীচের সিঁড়িতে বসে মা জপ করছেন। গোকুলবাবু ধীরে ধীরে মাস্টারমশাইয়ের কাছে শেখা শ্রীশ্রীচণ্ডীর অংশবিশেষ পাঠ করতে লাগলেন। এত নিম্নস্বরে পাঠ করছেন যে অন্য কারোর শোনার কথা নয়। যখন তিনি পাঠ করছেন, 'সৌম্যা সৌম্যতরা শেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী' (১/৮১) তখন হঠাৎ নীচের সিঁড়ি থেকে শ্রীশ্রীমা উপর দিকে ফিরে তাকালেন, এবং স্তবকারীকে দেখে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে আবার জপে মগ্ন হয়ে গেলেন। (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃ: ৩৩৬)

শ্রীশ্রীমায়ের এই দেবীভাবের প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে স্বামী গম্ভীরানন্দ 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে লিখেছেন, "শ্রীশ্রীমায়ের মানবলীলার মধ্যে চকিতে দেবীভাবে স্ফূর্তি অনেক ভক্তকেই চমৎকৃত করিয়াছে। উহা বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় এতই দ্রুত আসিত এবং শ্রীশ্রীমা এতই শীঘ্র আত্মসংবরণ করিতেন যে, ভক্তগণ ধরিয়াও ধরিতে পারিতেন না। তবু তাঁহাদের চিত্তে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া যাইত যে, এই দেবীত্বই তাঁহার মৌলিক ভাব। গগন মহারাজ (স্বামী ঋতানন্দ) বহুবার লক্ষ করিয়াছিলেন যে, যখনই দেবীভাবের প্রাধান্য ঘটিত তখনই তাঁহার গলার স্বর ও ব্যবহার একটা অতিপ্রাকৃতিক আবহাওয়া সৃজন করিয়া ভক্তের মন ক্ষণিকের জন্য অন্য রাজ্যে লইয়া যাইত। তিনি একদিন জয়রামবাটিতে মায়ের ঘরের বারান্দায় বসিয়া সকালে আন্দাজ নয়টার সময় মুড়ি খাইতেছিলেন, আর মা ঝাড়ু লইয়া বারান্দা ঝাঁট দিতেছিলেন। এমন সময় বাহিরের দরজা হইতে ভিখারির ডাক শোনা গেল, 'মা, ভিক্ষে পাই গো!' শ্রীশ্রীমা আপনমনে বলিয়া উঠিলেন, 'আমি আর অনন্ত হাতেও কাজ শেষ করতে

পারছি না।' এক অতি কোমল সুমিষ্ট স্বরে আকৃষ্ট হইয়া গগন মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকাইবামাত্র তিনি কাজ বন্ধ করিয়া এক হাত হাঁটুতে রাখিয়া ন্যুব্জভাবে দাঁড়াইয়া সহাস্যে বলিলেন, 'দেখ, আমার দুটো হাত, আমি কিনা আবার বলছি, আমার অনন্ত হাত।' (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৩২৭)

ঠিক এইরকমই অভিজ্ঞতা হয়েছিল সুমতি নামে এক ভক্ত মহিলার। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীমাকে লালপেড়ে শাড়ি পরিয়ে চণ্ডীরূপে পূজা করছেন। তিনি স্বপ্ন দেখে লালপাড় শাড়ি নিয়ে মায়ের বাড়ি উপস্থিত হলেন। মাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনালে মা সহাস্যে বললেন 'জগদম্বাই স্বপ্ন দিয়েছেন, কী বল মা? তা দাও, শাড়িখানি তো পরতে হবে।' তিনি উহা পরিলেন। ঐ দিন (২রা কার্তিক, ১৩২৫) রাত্রে লক্ষ্মীপূজা। বিকালে একজন স্ত্রীলোক লক্ষ্মীপূজার তাবৎ উপকরণ লইয়া আসিয়া মায়ের শ্রীচরণ পূজা করিলেন। পরে চারিটি পয়সা পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। মা উপস্থিত অপর সকলকে বলিলেন, 'আহা! ওর বড় দুঃখ মা, বড় গরিব।' (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৩২৮)

'ও কাত্যায়নী বিদ্মহে কন্যাকুমারী বি মহি
তন্ন দুর্গি প্রচোদয়া॥'
তৈত্তিরীয় আরণ্যক।—

দেবী দুর্গা কাত্যায়নীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে। দেবতারা প্রথম তাঁর দর্শন পান এই সময়ই। কাত্যায়নী রূপধারী দেবী দুর্গা, দুর্গম অসুরকে বধ করেছিলেন বলে, দুর্গা নামে পরিচিতা। কলির মহাযজ্ঞ এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। মঠ প্রতিষ্ঠার পর নানা সমালোচনার ঝড় সামলেছেন স্বামীজি। এরমধ্যে নবগঠিত বেলুড় মঠের উদ্দেশে চারিদিকের বহু মানুষের একটি বিশেষ অভিযোগ ছিল, এই সন্ন্যাসীরা হিন্দু নন। কারণ হিন্দুদের রীতিবিরুদ্ধ আচার এঁরা পালন করেন, বিশেষ করে বিদেশিনীদের আনাগোনা, ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বসে আহার গ্রহণ! এই সমস্ত রক্ষণশীলদের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজি এই ধারণা পরিবর্তনের জন্য দুর্গাপূজা করবেন বলে ঠিক করলেন।

মঠের দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে শ্রীশ্রীমা কয়েকবার মঠে পদার্পণ করেছিলেন। প্রতিবারই আমরা দেখি প্রতিমায় দুর্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গে 'জ্যান্ত দুর্গা' মায়ের পূজায় মেতেছেন সন্ন্যাসীরা। ১৯১২ সালের দুর্গাপূজা। বোধনের দিন মা মঠে আসবেন। স্বামী প্রেমানন্দ চারিদিকে ব্যবস্থা করছেন, শ্রীশ্রীমায়ের পৌঁছোতে একটু দেরি হচ্ছে, হঠাৎ স্বামী প্রেমানন্দের চোখ গেল গেটের সামনে মঙ্গল ঘট বসানো হয়নি। এসব দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'এসব হয়নি, মা আসবেন কী!' দেবীর বোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা এসে পৌঁছালেন, স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সাধুরা নিজের হাতে গাড়ি টেনে মঠের ভিতর আনলেন। গাড়ি প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালে মাকে গাড়ি থেকে নামালেন গোলাপ মা। মা সব দেখেশুনে সহাস্যে বললেন, 'সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।' (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ২০৭)

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের পূজার পর স্বামী শিবানন্দজির লেখা একটি চিঠি মায়ের জীবনীতে ব্যবহার করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ। চিঠিতে বলা হচ্ছে, "শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষরূপে হইল।...যদিও তিনদিন অনবরত বৃষ্টি, ঝড়, তথাপি মা'র কৃপায়

কোনো কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমনকি ভক্তরা যে সময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে, ঠিক সেইসময় বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্য ধরিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য। পরে যোগীন-মার কাছে শোনা গেল যে, যখনই ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল, অমনি শ্রীশ্রীমা দুর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন, 'তাইতো, এত লোক কী করে এই বৃষ্টিতে বসে খাবে? পাতা-টাতা সব ভেসে যাবে। মা, রক্ষা করো!' মাও সত্য রক্ষা করিতেন; তিনদিনই এইরকম।

"অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার পরে পুজনীয় শরৎ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, 'এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়।' ব্রহ্মচারী বুঝিলেন উল্টা, তিনি মনে করিলেন, দুর্গা প্রতিমার সামনে প্রণামী দিতে হইবে; তাই নিঃসন্দেহ হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'ও বাগানে মা আছেন; তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তাঁরই পূজা হল'।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃ: ২০৯) বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের কাছে শ্রীশ্রীমাই ছিলেন সাক্ষাৎ শ্রীদুর্গা।

পৌরাণিক দেবী, যাঁরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, তাঁদের সঙ্গে মায়ের এক নিবিড় সম্পর্ক আমরা দেখি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে সারদা-লক্ষ্মী, সারদা-সরস্বতী, সারদা-দুর্গারূপে পূজিতা। ১৯১৬ সালে দুর্গাপূজায় অষ্টমীর দিন মা প্রতিমা দর্শনে এসে ব্রহ্মচারীদের কুটনো কুটতে দেখলেন এবং বললেন, 'ছেলেরা তো বেশ কুটনো কোটে।' উপস্থিত কার্যরত জগদানন্দ স্বামী বললেন, 'ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা লাভই হল উদ্দেশ্য—তা সাধনভজন করেই হোক আর কুটনো কুটেই হোক।' ব্রহ্মময়ীরূপে শ্রীশ্রীমা কেবল নিজের স্বরূপের মধ্যে পৌরাণিক দেবী ও শক্তি ভাবনাকে অনুস্যূত করেননি, তিনি যুগধর্ম পাত্রীরূপে যুগে যুগে অবতারের সঙ্গী হয়ে আবির্ভূতা হয়েছেন।

যুগধর্ম পাত্রী

'যে রাম সেই কৃষ্ণ, ইদানীং এই শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ।' অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপে শ্রীশ্রীমা সীতা ও রাধারূপে বন্দিতা। তাঁর মধ্যে এই দুই ভাবের প্রকাশ ঘটেছে বারংবার। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন একদিন ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের সামনে গৌরী মাকে রহস্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল তো গৌর দাসী, তুই কাকে বেশি ভালোবাসিস?' রঙ্গময়ী গৌরী মা গানের ভাষায় উত্তর দিলেন,

'রাই হতে বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী।
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশিতে বলো,
"রাইকিশোরী"।'

গানের কথা শুনে শ্রীশ্রীমা লজ্জায় গৌরী মার হাত চেপে ধরলেন, ঠাকুর কিন্তু গৌরী মার উত্তরে খুশি হয়ে হাসতে হাসতে স্থান ত্যাগ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর বৃন্দাবনে গিয়েছেন শ্রীশ্রীমা। ঠাকুরের বিরহজনিত কষ্টের সঙ্গে যুক্ত হল পূর্বজন্মের রাধা বিরহ। একা একা ঘুরে বেড়ান বৃন্দাবনের পথে পথে। কখনো যান একাকী যমুনার ধারে, কখনো বা ধীর সমীরে। জীবনীকার লিখেছেন, "তখন ভাদ্রমাস সমাপ্ত প্রায়। বর্ষাশেষে বৃন্দাবনের বনরাজি অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে শ্যামল শোভা, সমস্ত ভূমি নবোদগত তৃণাদিতে আচ্ছাদিত, বাতাসে বিবিধ কুসুমের মনোহর সুবাস, দিকে দিকে ময়ূরের কেকা ও গাভীর হাম্বারব, নিঃশঙ্ক মৃগসমূহ পথপার্শ্বে শষ্পাহার করিতে করিতে অকস্মাৎ মনুষ্য পদশব্দে উৎকর্ণ হইয়া দ্রুত পলাইতেছে, আর পুণ্যসলিলা কালিন্দী কলকল নিনাদে চঞ্চল গতিতে আপনমনে চলিয়াছে। সেই বৃন্দাবনের শোভা, সেই শ্রীরাধিকার বিরহাশ্রুসিক্ত ধূলিকণা, সেই ব্রজগোপীর সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিষ্পাত ব্রজভূমি সবই রহিয়াছে, সর্বত্রই ব্রজরাজের স্মৃতি জাজ্বল্যমান থাকিয়া প্রাণে তাঁহার দর্শনলালসা জাগাইতেছে; কিন্তু নাই তিনি। বৃন্দাবনে আসিয়া বিরহবিধুরা শ্রীশ্রীমায়ের মনে হাহাকার উঠিল।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১১১-১১২)

শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণকে কৃষ্ণজ্ঞানে ও নিজেকে রাধাজ্ঞানে বিরহকাতরা হতেন, পরবর্তীকালে কোনো ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলেছিলেন 'আমিই রাধা'। (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১১২) রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও বিরহ বিষয়ক সংগীত মা খুবই পছন্দ করতেন। কোনো সময় ঠাকুরের কাছে একটি কৃষ্ণ-বিষয়ক সংগীত শিখেছিলেন মা, সেই গানটিই যেন তাঁর প্রাণে বাজে।

'যদি কিশোরী তোমার কালাচাঁদের—
গোকুলচাঁদের উদয় ঘুচল হৃদে।
দুঃখ কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে এখন থাকবি রাধে।।
যাই আমাদের যথা আছেন মধুসূদন,
শুনব না তোর বারণ, মানব না তোর রোদন,
প্যারী গো, আমরা থাকব না তোর সদন,
কৃষ্ণত্যাগীর বদন দেখতে নিষেধ আছে পুরাণে বেদে।'

(গানটি রাধুদির কাছ থেকে পাওয়া যায়। মা'র সঙ্গে গেয়ে গেয়ে তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীশ্রী সারদাদেবী, পৃঃ ৬০)

বৃন্দাবনে গিয়ে ধীরে ধীরে মা'র বিরহের উপশম হল। তিনি যেন বালিকা মূর্তিতে, আনন্দময়ীরূপে প্রকাশিত হলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ মায়ের এই রাধাভাব সম্বন্ধে একটি মূল্যবান স্মৃতিচারণ তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেন, "শ্রীশ ঘটক বলেন : ১৩২৫ সালের চৈত্রমাসে দোল পূর্ণিমার পরদিন আমি মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি, বেলা প্রায় দশটা হইবে। মা তখন কোয়ালপাড়া মঠে ঠাকুরঘরের পাশের ঘরটিতে ছিলেন। দুইটি অল্পবয়স্ক বালক ও একটি যুবক ঠিক সেই সময়ে মাকে প্রণাম করতে আসিয়াছে। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে মা আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ছেলে দুইটি প্রণাম করিয়া মা তাহাদের মাথায় হাত দিবার পূর্বেই, তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছে! আমি ছেলে দুইটির মাথা আগাইয়া ধরিতেই

মা তাঁহাদেরও মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহারা আবীর সঙ্গে আনিয়াছিল, 'আমরা আবীর দেব'—এই কথা শুনিবামাত্র মার ভাবান্তর হইল। 'আবীর দেবে'—বলিয়াই তিনি চটুলা বালিকার মতো হইয়া গেলেন, আর ছেলেরা তাঁহার পাদপদ্মে আবীর দিতে না দিতে তাহাদেরই আবীর লইয়া চপল ভঙ্গিতে তাহাদের গায়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিয়াই আমি নিজের কথা বলিয়া যাইতেছিলাম। আমার মাতৃভাব, আমার দিকে চাহিয়া যখন উত্তর দিতেছেন তখন প্রশান্ত মাতৃমূর্তি; আবার সঙ্গে সঙ্গেই চঞ্চলা হইয়া ছেলেদের গায়ে আবীর ছুঁড়িতেছেন। মার অমন মূর্তি আমি আর কোনোদিন দেখি নাই—মনে মুদ্রিত হইয়া আছে, ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।" (শ্রীশ্রী সারদাদেবী, পৃ: ৬১)

কেবল ঠাকুরের কাছে শুনে নয়, পরবর্তীকালেও মা'র শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সংগীত সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। স্বামী তপানন্দর কাছে একটি গান শুনে মা সেটি লিখিয়ে নিয়েছিলেন সাগ্রহে। গানটি হল,

"হৃদি বৃন্দাবনে আমারি কারণে সর্বনাশা বাঁশি বেজেছে এবার।
(তাঁরে) জানি না তবু যে, ভুলি লোকলাজে পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর॥
প্রমত্ত উজান মন যমুনায় লুকাইয়া বাঁশি ডাকে 'সখি আয়';
প্রাণের কালিয়া বলে দে কোথায়, বড় যে সুখেরি কলঙ্ক রাধায়।।
প্রতি অঙ্গ মোর কানু—ক্ষুধাতুর, সে কানু কেন লো দুর এতদূর!
প্রেমের রাজা সে যে ছিল না নিঠুর, কোটি কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।
যত ছিল রাস, যত বৃন্দাবন, যত লো কদম্ব নিকুঞ্জ কানন,
(সেথা) জনমে জনমে মোর কানুধন, প্রেম ভিখারিনি আমি রাধা তাঁর।।"

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ সাহিত্যে ও দর্শনে' গ্রন্থে বলেছেন শ্রীরাধা চরিত্র একটি পদ্মফুলের মতো। যাঁর সহস্রদল, ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে। অনন্ত রাধার মায়া, তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপিণী। মহাভাবময়ী। এই মহাভাবময়ী রাধার প্রেমঘন রূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন উচ্ছ্বসিত ছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এক যুবক ভক্তকে পাঠিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং উচ্চারণ করেছিলেন এক সূত্র কাব্য,

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়
কোটি রাম কোটি কৃষ্ণ হয় যায় রয়।।

রাধা কেবল ভাবময়ী নন। পরিচালিকা শক্তিও তাঁরই হাতে রয়েছে। রাম ও কৃষ্ণের জীবনে সীতা এবং রাধা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, ঠিক তেমনিই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে সারদার অস্তিত্ব। কখনো তিনি পরিচালিকা শক্তি, কখনো তিনি সর্বদা রামকৃষ্ণ বিরহে কাতর! শ্রীশ্রীমা কীর্তন গান শুনতে ভালোবাসতেন, বাগবাজারের ভক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত নিজ গৃহে কীর্তনের বন্দোবস্ত করে মাকে নিয়ে গিয়েছেন। পদাবলী গায়ক যতীন্দ্র মিত্র পেশাদার কীর্তনীয়া, তিনি কৃষ্ণের মাথুর পালা ধরলেন। মাথুর বিরহের পালা, কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপী ও রাধার বিরহ! পালাকার বিরহের বর্ণনা করছেন, অল্প সময়ের মধ্যে গান খুব জমে গেল। পালাকার বিরহ দিয়েই পালা শেষ করতে চাইলেন। কিন্তু গোলাপ মা চিকের ভিতর থেকে বললেন, মিলনের গান দিয়ে পালা শেষ করতে। পালাকার কোনোরকমে রাধাকৃষ্ণের

মিলন ঘটিয়ে দিয়ে পালা শেষ করলেন। শ্রীশ্রীমা প্রথম থেকেই ভাবাবিষ্ট ছিলেন। কীর্তন শেষ হয়ে গেল, কিন্তু মায়ের ভাব ভঙ্গ হল না। ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। গোলাপ মা কোনোরকমে কীর্তনের আসর থেকে মাকে নিয়ে এলেন। ঘরে ফিরেও মায়ের ভাবের উপশম হল না। সবশেষে এক সন্তান 'মা' বলে ডাকলে মায়ের ভাবের ধারা ভিন্ন পথে বইল। গোলাপ মা এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম, আর এই আজ দেখলুম!' (শ্রীশ্রী সারদাদেবী, পৃঃ ৬২)

রাধার পর আমরা সীতার কথা আলোচনা করতে পারি। সীতারূপে শ্রীশ্রীমা নিজেকে এবং অন্যান্য সকলেও শ্রীশ্রীমাকে বারংবার চিহ্নিত করেছেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীমা রামেশ্বর দর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁর এই তীর্থ পরিক্রমার অন্যতম সঙ্গী এবং সেবক স্বামী ধীরানন্দ বলেছিলেন অনাবৃত রামেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করে শ্রীশ্রীমা বলে ফেলেছিলেন, 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।' কথাটি কানে যাওয়ামাত্র তাঁর কাছে যে ভক্তরা ছিলেন তাঁরা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, ও কী বললে?' মা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন, 'ও কী একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।' শ্রীশ্রীমায়ের অপর সঙ্গিনী কেদারের মা-ও বলেছেন রামেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীমা শিবলিঙ্গ দেখেই বলেছিলেন, 'আহা, যেমনকার তেমনটি আছে গো!' কী বললে মা, কী বললে?—গোলাপ মা'র এই প্রশ্নের উত্তরে মা সেকথা সঙ্গে সঙ্গে চেপে যান। রামেশ্বর থেকে শ্রীশ্রীমা ফিরে এলে কোয়ালপাড়ার কেদারবাবু উদ্বোধনের বাড়িতে মাকে জিজ্ঞাসা করেন 'রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন?' উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন 'বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছেন।' 'সদা উৎকর্ণা গোলাপ মা তখন পাশের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কথাটি শোনামাত্র তিনি বলে উঠলেন 'কী বললে, মা?' একটু চমকে উঠে শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন 'কই কী বলব? বলছি এই তোমাদের কাছে যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনটিই দেখে বড় আনন্দ হল।' গোলাপ মাও ছাড়ার পাত্রী না। তিনি বললেন 'না মা, আমি সব শুনেছি, এখন আর কথা ফেরালে কী হবে? কেমন গো, কেদার?' গোলাপ মা'-র তখন আবিষ্কারের উল্লাসের ছটা। সেখান থেকে গিয়ে তিনি যোগীন মা ও অন্যান্যদের ঐ সংবাদ সোৎসাহে জানিয়ে দিলেন।

রামেশ্বর গমন ও সেখানে গিয়ে শিবলিঙ্গ দেখে মায়ের এই মন্তব্যের উৎস সন্ধান করতে আমাদের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। স্কন্দপুরাণে রামেশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ক কাহিনি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা সমুদ্রের তীরে শীবরাধনার আয়োজন করেন। হনুমান শিবলিঙ্গ আনতে গেলেন, এদিকে সীতা খেলার ছলে সমুদ্রতীরে বালুকা দিয়েই শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করেছেন, হনুমানের আসতে বিলম্ব হওয়ায় রাম সীতানির্মিত শিবলিঙ্গটিই পূজা করেন। বালু দিয়ে প্রস্তুত এই লিঙ্গ ভঙ্গুর হওয়ার ফলে এই লিঙ্গের উপর সর্বদা একটি সোনার আবরণ দেওয়া থাকে। শ্রীশ্রীমার পূজার জন্য সেই আবরণ খুলে দেওয়া হয়, এই অনাবৃত লিঙ্গমূর্তি দেখে মা উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

সীতার জীবনের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সর্বোপরি পতিপ্রাণতার সঙ্গে মায়ের জীবনের সাদৃশ্য দেখেছেন অনেকে। শ্রীশ্রীমার উদ্দেশে তাঁর শতবর্ষের প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন

'শ্রীরামচন্দ্রের সীতা—
পাবক—পরিশুদ্ধা জনকনন্দিনী বৈদেহী
সমাধিস্থ হয়ে আছেন
তোমারি অন্তর পাতালের স্তব্ধলোকে।'

সীতা যেমন স্বামীর সত্যব্রতকে গ্রহণ করে বনবাসের অশেষ দুঃখকষ্টকে বরণ করেছিলেন, সারদাও তেমনি স্বামীর ইষ্টপথে সাহায্যের অঙ্গীকার করে নহবতে আক্ষরিকভাবেই 'বনবাসে'র জীবনই যাপন করেছেন দীর্ঘ বারো বছর। গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্বেচ্ছা নির্বাসিতার জীবন সারদার! মায়ের নিজের কথায় সেই জীবনের একটা চিত্র পাওয়া যায় : 'নবতে যে কী করে কাটিয়েছি, তা কে বুঝবে! নটীর মা (শ্রীমা অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী), মেয়ে যোগেন, গোলাপ, যে যে দেখেছে, সব্বাই বলত, মা, এইটুকু ঘরে কী করে থাকে। ঘর তো দেখেছ? ঐটুকু ঘরে মাথার ওপরে সব শিকে ঝুলছে, গেরস্ত ঘরে মানুষের যা যা দরকার, মশলা-টশলা সব। এমনকি ঠাকুরের জন্য মাছ পর্যন্ত জিয়ানো আছে। সিধে হয়ে দাঁড়াবার যো ছিল না, দাঁড়াতে গেলেই মাথায় লাগত—মাথাটা আমার লেগে লেগে ফুলে গিয়েছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্বল্পপরিসর আলোবাতাসহীন কক্ষটিকে নাম দিয়েছিলেন 'খাঁচা'। যেসব মহিলারা সেই ঘরে মাকে দেখতে আসতেন তাঁরা আক্ষেপ করে বলতেন, 'আহা, কী ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!'

শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য বিভূতিভূষণ ঘোষ জয়রামবাটিতে সিংহবাহিনীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত রামায়ণ গান প্রসঙ্গে একদিন বলেন : 'আহা, কেমন সুন্দর রামায়ণ শুনলুম!' ঐকথা শোনামাত্রই শ্রীশ্রীমা বললেন 'এবার [রামায়ণ] অনেক বড়!' শ্রীশ্রীমার এই উক্তিটির তাৎপর্য হল : 'সর্বাধুনিক' অবতার রামকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। বাস্তবিকই 'রামময়জীবিতার' মতোই শ্রীশ্রীমা ছিলেন, 'রামকৃষ্ণময় জীবিতা'।

লোককথায় শক্তি আরাধনা ও শ্রীশ্রীমা

বাংলার মঙ্গলকাব্যে, আগমনী গানের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে শক্তি আরাধনার এক ঘরোয়া রূপ। এই লোককথার মধ্য দিয়ে অসুরদলনী দেবী হয়ে উঠেছেন আমাদেরই ঘরের মেয়ে! পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাহিত্য জগতে মঙ্গলকাব্যের সূচনা হয়েছিল। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বিভিন্নরূপে দেবীকে নিয়ে লোককাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানে দুর্গা হয়েছেন শুভদুর্গা, নবদুর্গা, বলদুর্গা, শুভচণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, অবাকচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অন্যতম হল চণ্ডীমঙ্গল। কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মাধ্যমে এই মঙ্গলচণ্ডী কাব্য প্রচারিত হয়েছে। এই দুই উপাখ্যানের মর্মবস্তু হল—দেবী পার্বতী এখানে সাধারণ বাংলার গৃহবধূর মতোই উদাসীন স্বামী শঙ্করকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। শ্মশানবাসী শিব গৃহকর্মের কিছুই দেখেন না। অভাবের সংসার দেখে মা মেনকার দুঃখের শেষ নেই। সকলেই পার্বতীর দিকে চেয়ে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে! বহু কষ্টে শিব ভোলানাথকে ভিক্ষায় পাঠান পার্বতী। শিব একদিন ভিক্ষা করে এসে পার্বতীকে জানান, কাল আর ভিক্ষায় যাব না, আজ তুমি

দশপদ রান্না করো, আমি খাব! দশপদ কী কী তাও বলে দেন মহাদেব, কচুশাকে বড়ি দিয়ে, ডাল শুক্তো ফোড়ন দিয়ে, রান্নার বিবরণ শুনে পার্বতী হায় হায় করে ওঠেন।

ছোট্ট সারদাকে দেখে মা শ্যামাসুন্দরী দেবীর দুঃখের শেষ নেই! সকলেই বলে জামাই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উন্মাদ অবস্থায় রয়েছেন। রাতদিন কেবল মা মা করেন। পাড়া প্রতিবেশী সারদার দিকে চেয়ে সমবেদনা জানায়, 'পাগলের বউ'। স্বামীনিন্দা সতীর বুকে শেল হানে, তাই প্রতিবেশী ভানুপিসির বারান্দায় অবসর সময় কাটান সারদা। শ্যামাসুন্দরী আক্ষেপ করে বলেন, 'এমন বিয়ে দিলুম যে মেয়েটা একটা মা ডাক শুনতে পেলুনি!' জামাই রসের সাগর রহস্য করে উত্তর দেয়, 'জীবনে এত মা ডাক শুনবে যে বিরক্ত হয়ে যাবে!' পাগলের কথায় বিশ্বাস হয় না শ্যামাসুন্দরী দেবীর। সংসারের মাঝে পাগলরূপী এই মানুষটি কিন্তু সব ব্যাপারে নিখুঁত! কামারপুকুরে এসে তাঁর নানা খাওয়ার আবদার, শুধু রান্না হলেই হবে না। তার সঙ্গে চাই নিষ্ঠা। জীবনরসিক মানুষটি তাই ফরমাশ করেন, 'এমন সম্বর দেবে যাতে শুয়োর গোঁগায়!' যে রান্নায় যেমন উপকরণের প্রয়োজন তেমনটিই চাই তাঁর! রসিক মানুষের রসমাধুরী কেবল বুঝি সারদারই বোধগম্যের মধ্যে ছিল তাই তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "তাঁকে কখনো নিরানন্দ দেখিনি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি, সকলের সঙ্গেই মিশে আছেন। কখনো বাপু নিরানন্দ দেখিনি। আহা! কামারপুকুরে সকালে উঠেই বলতেন, 'আজ এই শাক খাব, এইটি রেঁধো।' শুনতে পেয়ে আমরা (মা ও লক্ষ্মীদিদির মা) সব যোগাড় করে রাঁধতুম।

"...কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে বসেছেন ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভালো রাঁধতে পারত। সে যেটা রেঁধেছে, খেয়ে বললেন, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে, এ রামদাস বদ্যি।' আর আমি যেটা রেঁধেছি, খেয়ে বললেন, 'আর এই ছিনাথ সেন।' শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলছে, 'তা বটে। তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্যি তুমি সবসময় পাবে—গা টিপতে পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হয়। রামদাস বদ্যি তার অনেক টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সবসময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে—সে তোমার সব সময়ের বান্ধব।' ঠাকুর বললেন, 'তা বটে তা বটে। এ সব সময় আছে।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৩০)

শক্তিসাধনার ধারায় লোককথা যেন সারদা-রামকৃষ্ণ জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁরা কিছু বর্জন করতে আসেননি, এঁদের আগমন শক্তি ভাবনার ধারাকে পুষ্ট করার জন্য। যা ছিল বইয়ের পাতায় তাই টেনে আনলেন নিজের জীবন-প্রাঙ্গণে। সমন্বয়ের এ এক বিচিত্র পদ্ধতি! শক্তি সাধনার ধারার প্রাক্-আধুনিক পর্যায় হল 'আগমনী গান'। আগমনী গানের মাধ্যমে দেবীর লীলাকে বিবৃত করা হয়েছে। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী যাঁর 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা' গ্রন্থে বলেছেন, 'লীলা শব্দটির অর্থ খেলা। মানুষের পক্ষে যা খেলা দেবতার দিক থেকে তাই লীলা।' (পৃঃ ৭৯) আগমনী অর্থাৎ মা মেনকার কন্যাকে আনবার আকুতি। এছাড়াও আছে দেবীর বাল্যলীলা ও বিজয়া পর্ব। কন্যাকে ভোলানাথের কাছে পাঠিয়ে দুঃখিতা মা মেনকা। আগমনী গান রচনা করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাধকদের পাশাপাশি হরিশচন্দ্র মিত্র, রাম বসু, কালীনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষকালের রয়েছেন, ঈশ্বর গুপ্ত। প্রাচীন আগমনী গীতে অন্ধচণ্ডী ছদ্মনামে কিছু রচনার দেখা পাওয়া যায়। দেবীকে নিয়ে আগমনী গানের বিষয়গুলি ছিল এমনই :

'শিবের নাহিক পিতামাতা, কে বুঝিবে
মায়ের ব্যথা
কারে কব দুঃখের কথা আমার
স্বর্ণলতা বিধুমুখী।।

অন্ধচণ্ডী

আবার কখনো পিতা হিমালয় বলছেন গৌরীকে,

'চল মা, চল মা গৌরী, গিরিপুরী শূন্যাগার।
মা হলে জানিতে উমা, মমতা পিতামাতার।
তব মুখামৃত চিনে, আছে রানি ধরাসনে।
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহে না আর।'

কালীনাথ রায়

আগমনীকার হরিশচন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন শিবের সঙ্গে থেকে দেবীর কী হাল হয়েছে। রাজনন্দিনী হয়েছেন শ্মশানবাসী! তাঁর রচিত আগমনী গানের পদগুলি এমন, মা মেনকা বলছেন :

'বাছার নাই যে বরণ, নাই আভরণ
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;
হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার
সে উমা আমার উমা নাই হে আর।'

সাধক কমলাকান্তও মা মেনকার কন্যার প্রতি উদ্বেগ-আকুতিকে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন,

'শুনেছি নারদের ঠাঁই গায়ে মাখে চিতা ছাই
ভূষণ ভীষণ তার গলে ফণীহার।
একথা কহিব কায় সুধা ত্যজি বিষ খায়
কহ দেখি এ কোন বিচার!'

রামপ্রসাদ লিখেছেন,

'কাঁদায়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ওমুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কী পারে!'

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় মা মেনকা যেন আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন,

'ও হে গিরি, কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ।'

আগমনী গীতের মধ্যে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব পড়েছিল। তাই দেখি কোনো কোনো গানে ভিখারি শিবের পাশে থেকেও মেয়ের অন্নপূর্ণা হয়ে ওঠার সুসংবাদ পেয়েছেন মা মেনকা। মা মেনকা বলছেন,

'মঙ্গলার মুখে কী মঙ্গলবাণী শুনতে পাই,
উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে
রাজরাজেশ্বর হয়েছেন জামাই।'

রাম বসু লিখিত এই আগমনী সংগীতের সঙ্গে মায়ের জীবনের একটি ঘটনা অনায়াসে উল্লেখ করা যায়। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী বেহালা বাজিয়ে গান ধরল,

"কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)।
(ওমা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কী তোর কাশীধামে?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
আজ কী সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী—
বিশ্বেশ্বরী তুই কী বিশ্বেশ্বরের বামে?
ক্ষেপা ক্ষেপা আমার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে;
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে,
দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে!
হিমালয় বাস হর করিয়াছে, ভিক্ষায় দিন রক্ষা
এমন দিন গেছে,
এখন কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে।
ফিরেছে কী কপাল তোর কপালক্রমে?
বিষয় বৃদ্ধি বটে, বিশ্বাস হইল মনে;
তা না হলে গৌরীর এতেক গৌরব কেনে?
নয়নে না দেখে আপন সন্তানে,
মুখ বাঁকায়ে রয় শ্রীরাধিকার নামে।।"

গানটি যেন অবিকল শ্রীশ্রীমায়েরই জীবনের ছবি। বৈরাগী গান গেয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে, যোগীন মা, গোলাপ মা'র অনুরোধে আবার বৈরাগী গানটি গাইল। গান শুনিয়ে হরিদাস বৈরাগী চলে যেতে শ্যামাসুন্দরী দেবী বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ গো, তখন সকলেই জামাইকে ক্ষেপা বলত, সারদার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, আমায় কত কথা শোনাত, মনের দুঃখে মরে যেতুম। আর আজ দেখ কত বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবীজ্ঞানে সারদার পা পূজা করছে।" (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১৩৩)

শক্তি সাধনার সমন্বিত রূপ ও শ্রীশ্রীমা

স্বামী সারদানন্দ তাঁর সুবিখ্যাত 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে শুরুতেই বলছেন, 'শক্তিপূজা, বিশেষত মাতৃভাবে শক্তিপূজা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। মাতৃ ভিন্ন অন্য ভাবের শক্তি পূজার কিছু কিছু মাত্রই অন্যান্য দেশে লক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক জগৎ কারণকে "মা" বলিয়া, জগদম্বা বলিয়া ডাকা একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়।' (পৃ: নিবেদন, ১) শক্তিরূপে মাকে দেখা এবং মায়ের মধ্যে শক্তিরূপিণী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকাশক্তিকে খুঁজে দেখার প্রয়াস ভারতীয় সমাজেই পরিলক্ষিত হয়। জগতের আদিম অবস্থায় যখন মানুষ প্রথম নিরাপদ স্থান খুঁজে পেল, সেই নিরাপদ কোলটি হল মায়ের। সৃষ্টিকে তাই মাতৃরূপে বন্দনা করল। পাশ্চাত্যে এই শক্তি পূজার ধরন হল পৃথক। স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 'ইওরোপের মাতৃপূজা ঐ মেরীমূর্তি পর্যন্ত যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বহু প্রাচীন উদক্ষেবের পূজাকাল হইতে নারীতে জায়াভাব বা শক্তিভাবের যে পূজা ও সম্মাননা করিতে ইওরোপ ক্রমে শিখিতেছিল, খ্রিস্টধর্মের নবীন প্রবর্তনায় সে তাহা ছাড়িতে পারিল না। তবে কালে কথঞ্চিৎ শুদ্ধভাবে নারীর ওইভাবের পূজা করিতে শিখিল মাত্র।' (ভারতে শক্তিপূজা, পৃ: ৮২-৮৩)।

শক্তি সাধনার ধারায় মাতৃভাবের চরম বিকাশ দেখিয়ে গিয়েছেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। আদিম ভাবনা কর্কশতার উপর মায়ের জীবন এমন এক ধারাপথ বহন করেছে, যা জগৎকে দেখিয়েছে এক সুন্দর নিটোল মসৃণ মাতৃভাব। স্বামীজি তাই বললেন, "মা ঠাকরুন কী বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা ঠাকুরানি ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কী ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা ঠাকুরানি গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হলে কী ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইওরোপে কী দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন বুঝতে পারছি। সেইজন্য মায়ের মঠ আগে করতে হবে।" (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৬)

বৈদিক সাহিত্যে আমরা দেখি অগ্নিরূপা দেবীকে। সেই দেবীই চণ্ডীতে ঘোষণা করলেন তাঁর আত্মপরিচয়,

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা
পশ্যৈতা দুষ্টময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।"

জগতে আমিই একমাত্র, আমার পরে আর দ্বিতীয় কে আছে? এই সকল দেবীগণ আমারই বিভূতি। দুষ্ট, দেখো আমার সেই বিভূতিসকল আমার মধ্যেই প্রবেশ করছে। দেবীর বহুরূপের প্রকাশ দেখে ঠাট্টা করেছিল দানব শুম্ভ। দেবী তার বিদ্রূপের উত্তর দিয়েছিলেন এই ভাষায়। বহু তুমি দেখছ, কিন্তু বহুর মধ্যে আমি, একসত্তারই অস্তিত্ব। মূঢ় তুমি, তাই দেখতে পাও না!

ভারতের শক্তি সাধনার ধারাপথও যেন সারদা সঙ্গমে মিলিত হয়েছে! যে ভিন্ন দেখে, তার কাছে সারদারূপ ভাব পরিপূর্ণ প্রকাশিত হয় না। উদ্বোধনের পাশে শীতলাদেবীর পূজায় ঢাকের তীব্র আওয়াজ শুনে পূজারী সন্ন্যাসী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'থাম না রে বাপু।' সঙ্গে সঙ্গে মা উত্তর দিলেন, 'সে কী বাবা, শীতলা, মনসা সবাই যে আমিই!' বহুর মধ্যে এক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করলেন! এ কি শুধু আবেগের কথা! না, মায়ের জীবনের ধারাপথ অসচেতন ভাবেই ভারতীয় শক্তি সাধনার বিবর্তনের ধারাকে মূর্ত করে তুলেছে। শ্রীশ্রীমা তাই যুগ পরিক্রমায় অনন্য অপরিহার্য!